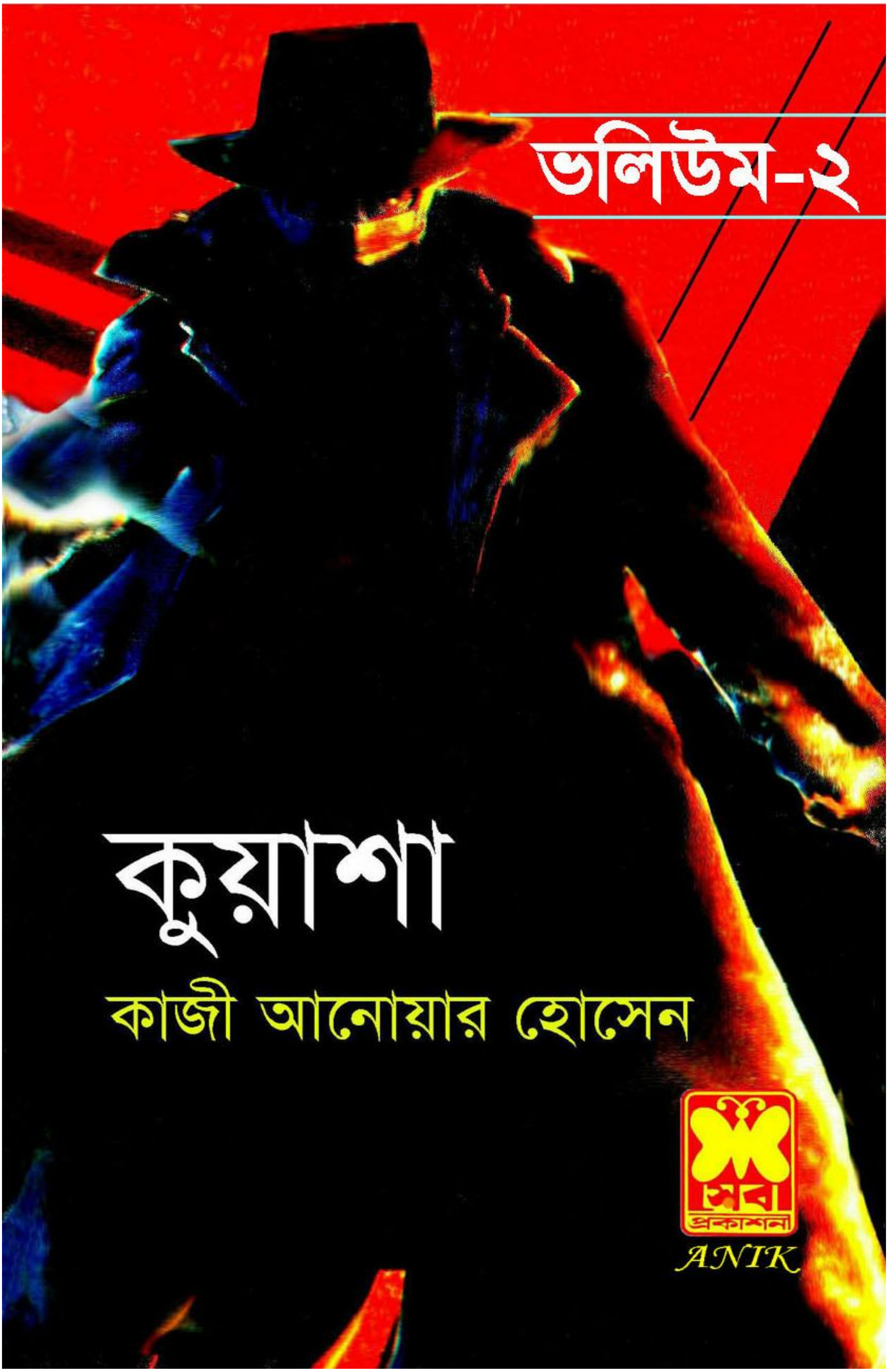
ভলিউম-২
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
ANIK

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED & EDITED BY,
MAHMUDUL HASAN SHAMIM
RETOUCHED BY,
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

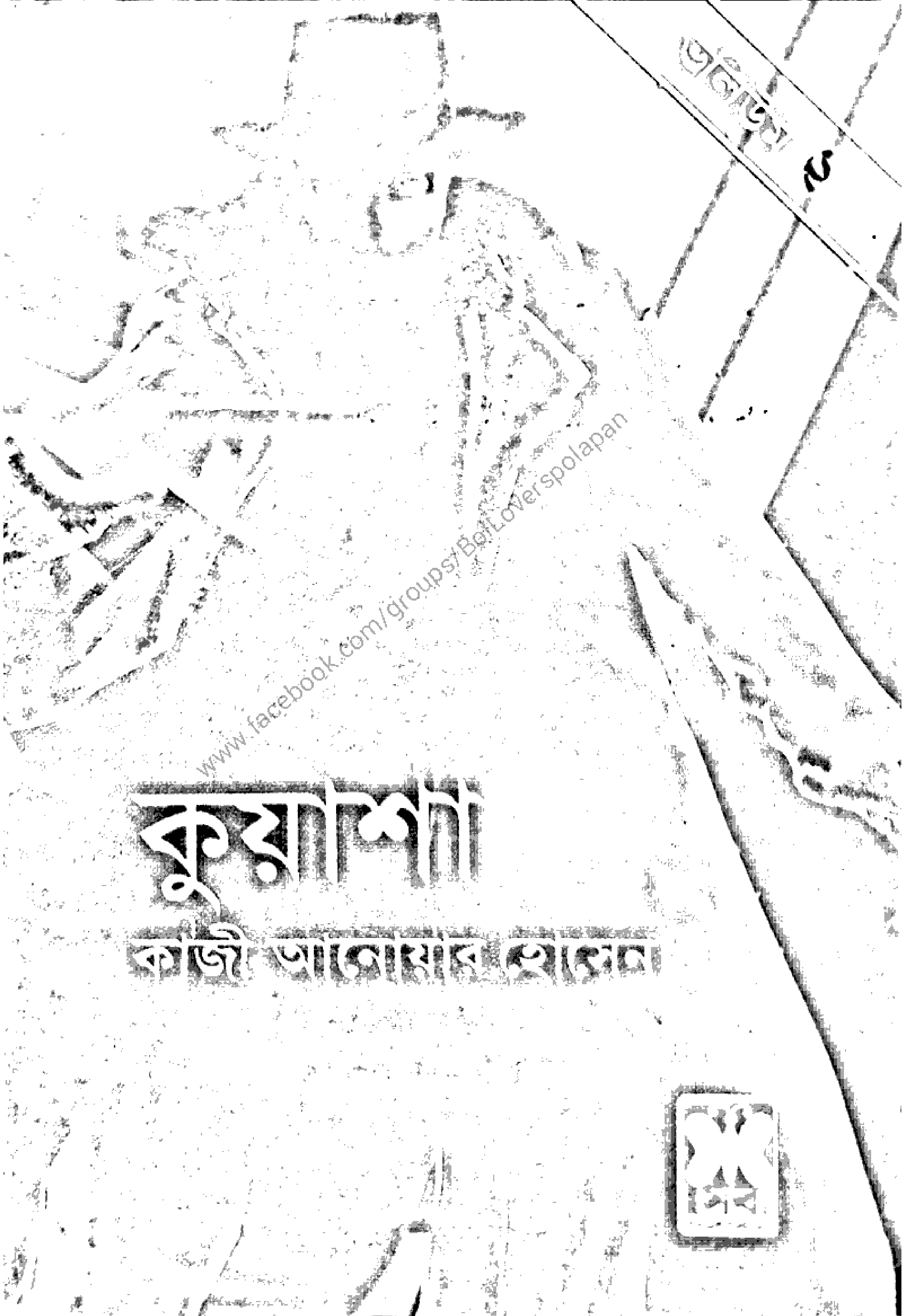
ভলিউম
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন

ভলিউম ২

কুয়াশা

৪, ৫, ৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

কুয়াশা-৪

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

মৃদু গর্জন করে শহীদের ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটা কামালের গাড়ি বারান্দায় এসে থামলো। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো শহীদ একতলার ড্রইংরুমের সামনে, তারপর প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লো, 'কামাল।'

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'ঘেউ!'

অবাক হয়ে যায় শহীদ। ব্যাপার কি? কামালের ঘরে কুকুর! ও আবার কবে থেকে কুকুর পুষতে আরম্ভ করলো? দামী ভেলভেটের পর্দা একটু ফাঁক করে দেখলো একটা সোফায় বসে টেবিলের ওপর দুই পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছে কামাল। ঘরের মেঝেতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোটা কতক সস্তা দরের ইংরেজি রহস্যোপন্যাস, 'মিকি স্পিলেন, লেসলি চার্টেরিস, আগাথা ক্রিষ্টী, আয়ান ফ্লেমিং, স্টেনাল গার্ডনার, কনান ডয়েল; আর বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা, রিডার্স ডাইজেস্ট, গানস এণ্ড গেম, আউট ডোর লাইফ, পপুলার সায়ান্স, ফিল্ড এণ্ড স্ট্রীম, লাইফ, টাইম, নিউজ উইক—সব একসাথে মিলেমিশে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরে ঢুকে এক নজর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শহীদ বললো, 'ব্যাপার কি কামাল? ঘরের এই অবস্থা কেন? তোর বাড়িতে কুকুর এলো কোত্থেকে?'

'ঘেউ।' কামালের মুখে সেই একই উত্তর।

হেসে ফেলে শহীদ বললো, 'তোর আবার এই রূপান্তর ঘটলো কবে? আর কিছু হতে পারলি না, শেষ পর্যন্ত কুকুর হয়ে গেলি!'

'শুধু কুকুর নয়, একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুর। ঘেউ ঘেউ ঘেউ!!'

'ওরে বাপরে, তবেই সেরেছে! একটু দূরেই বসি!' ধপাস করে কামালের পাশে বসে পড়লো শহীদ।

'আর কতদিন, শহীদ? এভাবে শুয়ে বসে শরীরে যে ঘুণ ধরে গেল। তুই তো পণ করেছিস গোয়েন্দাগিরি করবি না—কিন্তু আমার দিন কাটে কি করে বল তো?'

'তুই কীরে!' স্নেহের সুরে বললো শহীদ, 'এখনো পাগলাই রয়ে গেলি। চিরকাল কি আর ঐ চোর-পুলিস খেলা ভালো লাগে? চলে আয় আমার সাথে, নেমে পড়

ব্যবসায়। এটাও একটা অ্যাডভেঞ্চার, কামাল।'

'কদিন ধরে দিনরাত কেবল ভাবছি। সেই যে দু'মাস আগে কুয়াশা ওর গরিলাটা নিয়ে প্লেনে করে চলে গেল মিশরের পথে—তারপর মি. সিম্পসন কিছুদিন ঘুর ঘুর করেছেন আশেপাশে। ছোটোখাট এক আধটা কেসে একসাথে কাজও করেছি। কিন্তু কিছু ভাল্লাগলো না। তোকে পাশে না পেলে কোনও কাজেই আমার আনন্দ লাগে না। সেই ছোটকাল থেকে উপ-গ্রহের মতো কেবল তোর চারপাশে অনবরত ঘুরে মরছি—তোর মধ্যে কি যে যাদু আছে বুঝি না। তোকে ছাড়া কিছু করতে গেলে অসম্পূর্ণ লাগে সব কাজ, মনে হয় শরীরের অর্ধেকটা যেন অবশ হয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বুঝে নিয়েছি এ বাঁধন থেকে আমার মুক্তি নেই।'

অন্যমনস্ক ভাবে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো কামাল। কেন জানি বড় করুণ শোনালো ওর কথাগুলো। শীতকালের রাত আটটাকে অনেক রাত মনে হচ্ছিলো। বাইরের প্রশস্ত রাস্তাটা হেড-লাইটের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়ে এক একটা গাড়ি চলে যাচ্ছিলো মৃদু গুঞ্জন তুলে। তারপর আবার ল্যাম্প পোস্টের হলদে মলিন আলোয় চওড়া পীচ ঢালা রাস্তাটাতে নেমে আসছিল যেন শূন্য মঞ্চের রোমাঞ্চ।

হঠাৎ একটু হেসে কামাল গুনগুন করে ওর একটা প্রিয় গানের কলি ধরলোঃ

আটক রইয়াছি বন্ধু তোমার
পাগলা ফাটকে।

'ভাবছি, তোর সাথে ব্যবসাতেই নেমে পড়বো। তুই আমাকে যাদু করেছিস, শহীদ। কেন আমাকে খোদা এমন দুর্বল আর স্পর্শকাতর করে তৈরি করেছেন বলতে পারিস?'

কিন্তু কোথায় শহীদ? জবাব না পেয়ে কামাল ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো কখন অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে সে ঘর থেকে। নিশ্চয়ই টিকিয়ার গন্ধে রান্নাঘরের দিকে ছুটেছে ব্যাটা। কামালের মায়ের হাতের টিকিয়া সেই ছেলেবেলা থেকেই অর্ধেক শহীদের জন্য রিজার্ভ করা থাকে। সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো কামাল। এবং ঠিক সেই সময় ঘটলো ঘটনাটা। শূন্য মঞ্চে কখন যে নাটক শুরু হয়ে গিয়েছে টের পায়নি কামাল।

কামাল শুধু জানালা দিয়ে এক ঝলক দেখতে পেলো একজন লোক প্রাণপণে ছুটে আসছে এ বাড়ির দিকে, আর তার দশ গজ পেছনে ছুটছে ছুরি হাতে দুজন মুখোশধারী লোক।

এক তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার কানে এলো।. বাইরের দরজার দিকে ছুটলো কামাল। কিন্তু বাড়ির ভেতর দিকের একটা দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো শহীদ।

'খবরদার কামাল! বাইরে বেরোবি না। দরজার সামনে থেকে জলদি সরে যা।' কথাটা বলতে বলতে একহাতের ধাক্কায় হতভম্ব কামালকে সরিয়ে দিলো শহীদ দরজার সামনে থেকে। এতক্ষণে কামাল লক্ষ্য করলো শহীদের ডানহাতে ওর প্রিয় কোল্ট-পুলিস-স্পেশাল রিভলভারটা ধরা। দুর-দুর করে উঠলো কামালের বুকের ভেতরটা অজানা এক আশঙ্কায়!

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরই হুড়মুড় করে চৌকাঠের সামনে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো। সেই সাথে অদ্ভুত একটা বিজাতীয় গোঙানির শব্দ।

এক ঝটকায় পর্দাটা সরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো শহীদ। দেখলো উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর একজন লোক। এক মাথা ঘন কালো কোঁকড়া চুল ছাড়া চেহারার আর কোনো কিছু দেখা গেল না। পিঠের ওপর আমুল বিঁধে আছে একটা ছ'ইঞ্চি ব্লেডের ছোরা। সাদা শার্টটা লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে।

মাত্র কয়েক গজ দূরে রিভলভার হাতে হঠাৎ শহীদকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল লোক দুজন, কিন্তু এক মুহূর্তে সামলে নিয়ে দুই লাফে শহীদের ফোক্সওয়াগেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। তারপর এক ঝটকায় দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলো।

'খবরদার! একটু নড়াচড়া করলেই গুলি করবো।' গর্জে উঠলো শহীদ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। গাড়ির এঞ্জিন ততক্ষণে স্টার্ট হয়ে গেছে। নিজের গাড়ির ওপর গুলি ছুঁড়তে এক সেকেণ্ডের জন্যে একটু দ্বিধা হলো শহীদের। আর সেই সুযোগে চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়লো শহীদের গাড়িটা এবং পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। পাঁচ সেকেণ্ডে চল্লিশ মাইল স্পীড উঠে গেল।

ঘটনাটা এতো দ্রুত ঘটে গেল যে মনে মনে এদের অনায়াস দক্ষতা এবং পেশাদারী ক্ষিপ্রতার প্রশংসা না করে পারলো না শহীদ।

এবার ফিরে চাইলো শহীদ আহত লোকটার দিকে। কামালও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ছুরিটা পিঠের ওপর থেকে টেনে বের করতেই কল কল করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো। সাদা শার্টটা রক্তে ভিজে সেঁটে গেল গায়ের সঙ্গে। শহীদ বুঝলো, এ লোক বাঁচবার নয়।

দেহটা ঘুরিয়ে লোকটার চেহারা দেখে একসাথে চমকে উঠলো শহীদ আর কামাল। অস্ফুট উত্তেজিত কণ্ঠে শহীদ বললো, 'আরে এ যে কাফ্রী খোদাবক্স?'

'সেই মিশরীয় নর্তকী জেবা ফারাহ্-র দেহ-রক্ষী না?'

'হ্যাঁ! ধরো তো আমার সঙ্গে, ঘরের ভেতরে নিয়ে যাই।'

খোদাবক্সের দুই কশা বেয়ে তখন ফেনা বেরোচ্ছে। একটা অস্বাভাবিক ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে ওর গলা দিয়ে। ঘরের মধ্যে আনা হলে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এলো ওর। সমস্ত

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

মুখটা বিকৃত হয়ে গেল কিসের এক আতঙ্কে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে মার্বেলের মতো চোখ দুটো। দুই হাত শূন্যে তুলে কি যেন ঠেকাবার চেষ্টা করছে সে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে শিরা বের করা দু'হাত। পালিয়ে বাঁচবার জন্যে একবার হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করে আবার পড়ে গেল সে মেঝেতে। এক হাতে পুরু কার্পেটের একটা অংশ খামচে ধরলো খোদাবক্স। মিশরীয় ভাষায় অস্পষ্ট ভাবে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে। তারপরই একবার হিক্কা তুলে স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দুই

'হ্যালো। কে, শহীদ বলছো?' মি. সিম্পসনের বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'হ্যাঁ। কামালের বাসা থেকে আপনাকে রিং করছি। এক্ষুণি একটু আসতে পারবেন এখানে?'

'ব্যাপার কি?'

'এসেই না হয় শুনবেন!'

'কি জানো, প্রেসিডেন্টের দেশ সফর নিয়ে সারা অফিসে মহা হট্টগোল চলছে। আমি এই মুহূর্তে বেরোতে পারবো না কিছুতেই। তোমার প্রয়োজনের একটু আভাস যদি দিতে পারো তবে উপযুক্ত লোক পাঠাবার...'

'বুঝতে পেরেছি। তবে প্রয়োজনটা আমার নয়, আপনাদেরই। সেটা হচ্ছে এই যে, জেবা ফারাহ্-র কাফ্রী দেহরক্ষী খোদাবক্সের মৃতদেহ আমরা আগলে বসে আছি এখন কামালের ড্রইংরুমে। আর আধ ঘন্টা রাখতে পারবো। উপযুক্ত লোক পাঠালে এর মধ্যেই পাঠান।'

'বলো কি শহীদ! খোদাবক্সকে খুন করলো কে? আর তার কারণই বা কি?'

'কে করেছে তা আমি জানি না, জানতে চাই-ও না। তবে কারণটা হচ্ছে, আমার যতদূর বিশ্বাস, ওর কোমরে বাঁধা একটা রূপোর কবচ।'

'হেঁয়ালি রেখে একটু পরিষ্কার করে বলবে?'

'অতো সময় নেই। আর টেলিফোনে সব কথা জানানো সম্ভবও নয়। খুব তাড়াতাড়ি লোক পাঠান, আমাদেরও প্রাণ সংশয় আছে।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছি। আর আজ রাত সাড়ে এগারোটার দিকে এদিকের কাজ সামলে আমি তোমার বাসায় গিয়ে সব শুনবো। কেমন? সি ইয়ু!'

শহীদ উত্তরে 'সি ইয়ু' বলবার আগেই রিসিভার ছেড়ে দিলেন সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী মি. সিম্পসন। দু'একটা কথাতেই সবটা বুঝে নিয়েছেন

তিনি। শহীদও নিশ্চিন্ত মনে এবার একটা টেবিল ল্যাম্পের নিচে মেলে ধরলো খোদাবক্সের কোমরে বাঁধা কবচের মধ্যে থেকে বের করা এক টুকরো ট্রেসিং পেপার। বিচিত্র আঁক-ঝোঁক দেয়া আছে কাগজটার উপর। চট্ করে শহীদের মাথায় খেলে গেল, এটা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের নক্সা। আসল নক্সা থেকে এই ট্রেসিং পেপারের ওপর নকল তুলে নিয়ে আসলটা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। তবে কি কুয়াশা নেসার আহমেদের কাছ থেকে যে নক্সাটা ছিনিয়ে নিয়ে মিশরের পথে উধাও হয়ে গেল সেটা সেই ভুল আঁক দেয়া নক্সা? ব্যাপার কি? খোদাবক্সই বা আজ সন্ধ্যার পর এদিকে আসছিল কি করতে? পেছনে লোক লেগেছে টের পেয়েই কি খোদাবক্স আসছিল শহীদ বা কামালের সাহায্য গ্রহণ করতে? -যারা একে খুন করলো তারা কি নেসারের লোক?

থাক, এতো মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে জীবন থেকে সরে এসেছে সে আর সেপথে পা বাড়াবার কোনও দরকার নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নক্সাটা আবার ভাঁজ করে রূপোর চৌকোণা মাদুলির ভিতরে ভরে রাখলো শহীদ।

কামাল গিয়েছিল বাড়ির ভিতরটা সামলাতে। ফিরে এসে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে রাখলো অন্দর মহলের-তারপর সোফার ওপর বসলো, সন্তর্পণে যেন গম্ভীর চিন্তামগ্ন শহীদের ধ্যান ভঙ্গ না হয়।

খট্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে ফিরে কামাল দেখলো শহীদের রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটারের ক্ষুদ্র চোয়ালটা হাঁ হয়ে গেছে-আর তার থেকে অগ্নি পান করছে কিং সাইজের একখানা পলমল সিগারেট। খোদাবক্সের নিষ্প্রাণ মুখটা পালিশ করা আবলুশ কাঠের মূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

আপন মনে গজর গজর করতে করতে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় দাঁড়ানো উইলিজ জীপের কাছে এসে দাঁড়ালো ইন্সপেক্টর আলম। উঃ, মাতবুরি মারার জায়গা আর পায় না! শালা অ্যাংলো কুত্তার বাচ্চা! যাও, কোনও কথা শুনতে চাই না-এক্ষুণি রওনা হও! উ···উ···হ্। তুই আমাকে হুকুম করবার কেরে শালা? তোর কেনা গোলাম আমি? তোকে কে পরোয়া করে? দাঁড়াও এমন ফাঁশান ফাঁশাবো যে বাপের নাম ভুলে যাবে। নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁশ ফোঁশ করতে করতে বিপুল বপু মনিরুল আলম জীপের ফুট বোর্ডে এক পা রাখলো। সাথে সাথেই গাড়িটা বাঁ দিকে খানিকটা হেলে পড়লো।

'নাও, চালাও, ড্রাইভার!' হুঙ্কার ছাড়ে মনিরুল আলম।

ড্রাইভার কথা না বলে হুকুম তামিল করলো। কাঁচা পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে গাড়ি ছুটে চললো। স্টিয়ারিং হুইল ধরে নিঃশব্দে বসে রইলো ড্রাইভার এজিদ শেখ। তার পাকানো গোঁফের প্রান্তদেশে সূক্ষ্ম একটু হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল।

'লাথি মারো অমন চাকরির মুখে…'

মনিরুল আলম গজর গজর করতে লাগলো, 'সময় নেই, অসময় নেই…ইয়ে আর কি…' গাড়ি তখন জনাকীর্ণ জিন্না এ্যাভিনিউ ধরে ছুটে চলেছে। চারপাশে ব্যস্ত লোকের চলাচল। গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। ভিড় বাঁচিয়ে নিপুণ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে এজিদ শেখ। মোড়ে এসে বললো, 'কোনদিকে যাবো, স্যার…'

'সোজা ধানমণ্ডি।'

'রাইট, স্যার।'

এজিদ শেখ পাকা লোক। সে নরম গলায় উত্তর দিলো।

গাড়ি ষ্টেডিয়াম ছাড়ালো। মনিরুল আলম লক্ষ্য করলো না যে রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছ থেকে একটি লাল রঙের ফোক্সওয়াগেন ওদের পিছু পিছু সতর্ক ভাবে এগিয়ে আসছে। একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারতো গাড়িতে বসা লোক তিনটির তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি সোজা তাদের গাড়িটার দিকে থমকে আছে। এসব কিছু লক্ষ্য করার উপায়ও অবশ্য তেমন ছিলো না। একে তো বিপুলকায় ভুঁড়ি, ও ভারি রকমের রাত্রিকালীন ভোজনের আলস্যে মনিরুল আলম নির্জীব, তার উপর তার মেজাজ বড় সাহেব সিম্পসনের উপর দারুণ খাপ্পা। গাড়িতে বসে সে বরং চোখ বুজে ঢুলুনির আরাম খাওয়াটাই লাভজনক মনে করলো। নতুন চাকরিতে বহাল হওয়া এজিদ শেখের পাকানো গোঁফের প্রান্তে সূক্ষ্ম হাসির অর্থ সে একবারও সন্দেহ করলো না। গাড়ি নিউ মার্কেট পার হয়ে কিছুদূর গিয়েই জনবিরল গ্রীন রোডে প্রবেশ করলো পেট্রোল পাম্পের পাশ দিয়ে। ইন্সপেক্টর মনিরুল আলম চোখ বুজে ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ একবার সজোরে হ্যাচ্চো দিলো। গাড়ির দরজা জানালা কেঁপে উঠলো। একবার হাসলো এজিদ শেখ। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ঢুকে গেল লাল ইটের দেয়াল ঘেরা একটি বাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ একটি লোক। এজিদ শেখ ততক্ষণে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দরজা খুলেছে।

'কি হলো, এসে গেছি নাকি?' মনিরুল আলম বিরক্ত হয়ে চোখ খোলে। আড়-মোড়া ভেঙে গোটা দুই হাই তোলে। তারপর কোমরে হাত দিয়ে রিভলবারটা মনের অজান্তেই আছে কিনা একবার পরীক্ষা করে। দেখে যথাস্থানে জিনিসটা নেই। ঘুমের ঘোরটা দ্রুত কেটে আসতে থাকে তার।

'ওটা পরীক্ষা করতে হবে না…দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকটি প্রচণ্ড থাবায় মনিরুল আলমের কব্জি চেপে ধরে। বলে, 'যদি গোলমাল করো তাহলে ঐ দেখো পেছনে পিস্তল নিয়ে তোমার আজরাইল দাঁড়িয়ে আছে, একদম খুন হয়ে যাবে।'

প্রবলভাবে চমকে ওঠে মনিরুল আলম। চোখ দুটি ভয়ে ও বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে

বেরিয়ে আসার উপক্রম। সে নিঃশব্দে আদেশ পালন করলো অর্থাৎ বসে রইলো। তার চোখের সামনে এজিদ শেখকেও বাঁধা হলো। হাত পা বেঁধে মনিরুল আলমকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা পাঁচ বাই তিন হাত কুঠুরীতে। ঘরে ভ্যাপসা গরম। চারদিকে বড় বড় মশা ভন্ ভন্ করছে। প্রথম সে নিঃসাড় হয়ে হাত বাঁধা অবস্থার কথা একবার ভাবলো। চুলকান যাচ্ছে না। একবার একটু ফুঁপিয়ে উঠেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো সে।

বলিষ্ঠ লোকটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো। সে হুকুমের সুরে বললো, 'এই তাজা গর্দভটা এখানে থাক। বেশি গোলমাল করে তো ওষুধ দিয়ে গেলাম, টাইট করে রাখিস। নে, চল্,' একজনকে সে হুকুম করলো।

শহীদ ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। ক্রমাগত ঘড়ি দেখছিল। সিম্পসন সাহেবকে অন্ততঃ পৌনে এক ঘন্টা আগে সে টেলিফোন করেছে। এখনও কোনও সাড়া নেই। সে অস্থির ভাবে টেলিফোনের কাছে গেল।

কামাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল। তারও মুখ গম্ভীর। ঘরের মাঝখানে পড়ে রয়েছে হতভাগ্য খোদাবক্সের লাশ। সেদিকে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সে মনে মনে তলিয়ে দেখছিল। শহীদকে টেলিফোনের কাছে যেতে দেখে সে বললো, 'এই নিয়ে বোধহয় তিনবার হলো না?'

শহীদ কোনো জবাব দিলো না। নম্বর ঘোরাতে লাগলো। কামাল বিড়বিড় করে কি বললো।

এই সময় বারান্দায় বুটের শব্দ হলো। তিনজন ইউনিফর্ম পরা গোয়েন্দা পুলিসের লোক ঘরের পর্দা পার হয়ে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকেই আদাব দিলো।

সিম্পসন সাহেব তখন টেলিফোন ধরেছেন। শহীদ ততক্ষণে একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছে। সিম্পসন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ! আমি তো অনেকক্ষণ আগে ওদের পাঠিয়েছি। ওরা এখনো পৌঁছোয়নি…'

শহীদ বললো, 'এইমাত্র ঘরে ঢুকলো। অনেক ধন্যবাদ, সিম্পসন সাহেব। আমি মৃতদেহ এদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

'ও কে…'

সিম্পসন সাহেবের নির্লিপ্ত গলার স্বর শোনা গেল।

ইন্সপেক্টরের পোশাক পরা লোকটি সামনে এগিয়ে এলো। বিনীত কণ্ঠে বললো, 'সিম্পসন সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন স্যার। আমার নাম আলী আহমেদ।'

কামাল বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বললো, 'আপনারা কি পায়ে হেঁটে এখানে

এসেছেন, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

আই. বি. ইন্সপেক্টর মৃদু হাসলো। বললো, 'আর বলবেন না স্যার। অর্ডার পেয়েই যখন তখন আমরা রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু রেল গেটে এসে পাক্কা পনেরো মিনিট দেরি করতে হয়েছে।'

'আপনি মৃতদেহ গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করুন।' শহীদ গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঘটনাটা আমি খুলে বলছি।'

এক মুহূর্ত ভাবতে হলো শহীদকে। কামালের বাড়িতে সে এসেছিল সন্ধ্যা কাটাবার জন্যে। কিন্তু সময়ের রঙ্গমঞ্চে কখন যে কি ঘটে বলা মুস্কিল।

সে ঘটনাটি খুলে বললো। বিস্ময়ে, উত্তেজনায় ইন্সপেক্টর আলী জ্বল জ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো। শহীদ বলা শেষ করলে সে রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'বীভৎস কাণ্ড, স্যার।'

সে মৃতদেহটি উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করলো। ডায়রীতে কয়টা কথা তুলে নিলো। এক সময় শহীদকে বললো, 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

'স্বচ্ছন্দে…'

'এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা স্যার?'

শহীদ এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'এ সম্পর্কে আমার যা ধারণা তা যথাসময় সিম্পসন সাহেবকে আমি জানিয়ে দেবো ইন্সপেক্টর। আমি এখন মনের দিক দিয়ে স্থির নই। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না বলে কিছু মনে করেন নি আপনি…'

'না, না…স্যার…'

পুলিস ইন্সপেক্টর বিনীতভাবে হাসে। একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেই পরক্ষণে মিলিয়ে যায়। বললো, 'আপনি কিনা গোয়েন্দা বিভাগের আদর্শ পুরুষ…আপনার তো স্যার চোখের নজরই আলাদা। তাই বলছিলাম আর কি…'

কামালের মনে হলো ইন্সপেক্টর যেন শহীদকে ঠাট্টা করলো। একটু অবাক না হয়ে সে পারলো না। ততক্ষণে মৃতদেহ গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে। পুলিস দু'জন আবার ফিরে এলো ঘরে।

'স্যার…'

ইন্সপেক্টর আলী বিনীত হেসে বললো, 'স্যার, সিম্পসন সাহেব বলেছিলেন খোদাবক্সের কোমরে একটা রূপোর তাবিজ আছে। তাবিজটা দেখছি না।'

শহীদ চোখ তুলে তাকালো। সূক্ষ্ম হাসির একটা ক্ষীণ রেখা ওর ওষ্ঠ প্রান্তে উঠেই মিলিয়ে গেল। হাসিটা কেমন যেন বেদনা রাঙানো আর নিস্পৃহ। শহীদ দেখলো

দু'দরজার গোড়ায় দুজন গোয়েন্দা পুলিস রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর আলীর ডান হাতটা রিভলবারের একান্ত কাছে। ইন্সপেক্টর আলীর দিকে চেয়ে দেখে লোকটাকে শহীদ নির্ভুল ভাবে চিনলো। লোকটা খুনী। স্তিমিত, আধ ভেজা দৃষ্টিতে জান্তব নিষ্ঠুরতা স্থির হয়ে জ্বলছে।

ইন্সপেক্টর আলী আগের মতোই হাসতে হাসতে বললো, 'তাবিজটা কোথায়, স্যার?'

শহীদ মৃদু হেসে বলে, 'ড্রয়ারে।'

ইন্সপেক্টর আলী স্থির নেত্রে চারদিকে তাকায়। শহীদ বলে, 'সিম্পসন সাহেবকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

নম্র গলায় বলার চেষ্টা করে ইন্সপেক্টর। এগিয়ে ড্রয়ার খোলে। হঠাৎ সাত রাজার ধন পেয়ে গেলে যেমন আনন্দে ফেটে পড়ে মানুষ, তাবিজটা পেয়ে ঠিক তেমনি উল্লাসে চঞ্চল হয়ে পড়ে ইন্সপেক্টর আলী। এক মুহূর্ত তাবিজটা খাঁটি কিনা তা তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করলো, তারপর দ্রুত হাতে সেটা রেখে দিলো পকেটে।

'কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্যার। সারা গোয়েন্দা বিভাগ আপনার কাছে আর একবার ঋণী হয়ে রইলো।'

ইন্সপেক্টর আলী দ্রুত কথা সারে। দুজন সঙ্গী গোয়েন্দা পুলিস চকিতে ঘর পেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। কামালের দৃষ্টি এতক্ষণে ভরে যায় বিস্ময়ে। সে দেখলো শহীদ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইন্সপেক্টর আলী তার সঙ্গীদের মতোই প্রায় লাফিয়ে ঘর থেকে নামলো। তড়িৎ পায়ে গাড়িতে উঠলো। মুহূর্তে গর্জে উঠলো এঞ্জিন। একরাশ কাঁচা পেট্রোলের গন্ধ জায়গাটা ভরিয়ে দিয়ে গাড়িটা তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'শহীদ।' কামাল বন্ধুকে ডাকলো। তার চোখে-মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন।

'কি রে?' শহীদ সাড়া দেয়।

'আমার সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে। এরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক নয়। এরা খোদাবক্সের হত্যাকারী নেসার আহমেদের লোক!'

'সে আমি জানি...'

শহীদ ম্লান হাসলো। বললো, 'সিম্পসন সাহেবের ফোন ছেড়ে দিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন কিছু করার উপায় ছিলো না।'

কামাল উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলো। শহীদ একটু হাসলো। আস্তে আস্তে বললো, 'যে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছি সেই জীবনে ফিরে যাবার আর একটুকু ইচ্ছে

নেই, তুই তো জানিস কামাল। এতক্ষণে যা ঘটলো তার ভেতর আমার নিজের কোনো ভূমিকা ছিলো না। আমি, তুই দুজনেই নির্বাক দর্শক। শুধু দুঃখ লাগছে হতভাগ্য খোদাবক্সের জন্যে। যাহোক, চল ওঘরে। না, দাঁড়া…'

শহীদ ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'শেষ কর্তব্যটা সেরে নিই।'

সে টেলিফোনের কাছে যায়। সিম্পসন সাহেবকে সব কথা খুলে বলে।

সিম্পসন সাহেব সব শুনে আঁতকে ওঠেন, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ।'

শহীদ কেবল হাসলো।

তিন

তখন রাত ভোর হয়নি। উন্মুক্ত নীল আকাশে ফুলকির মতো অজস্র তারা জ্বলছে। আবছা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। বিস্তীর্ণ মরুভূমির এখানে ওখানে প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে আছে পিরামিডগুলো। কোথাও অনুচ্চ পাহাড় বা টিলার স্তূপ। উত্তর সীমানা থেকে জোরে হাওয়া বইলো। সেই হাওয়ায় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল সামনের কুয়াশা। হাওয়ায় কেঁপে উঠলো অদূরবর্তী খেজুর গাছের পাতা। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ।

'খুট' করে একটা শব্দ উঠলো নিকটবর্তী পিরামিডের পাদদেশে। ভারি পাথরের দরজা ঠেলে কেউ যেন বেরিয়ে এলো মৃত্যু শীতল গহ্বর থেকে। একটা দীর্ঘকায় মানুষের ছায়া। আপাদমস্তক ভারি কাপড়ে আবৃত। হাতের আঙুলে সিগারেট জ্বলছে। চোখে-মুখে পরিশ্রমজনিত স্বেদ-বিন্দু। বাইরে এসে লোকটি বুক ভরে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করলো। ভারি ওভার-কোটটা খুলে ভাঁজ করে হাতে রাখলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলো রাত ভোর হতে বেশি বাকি নেই। দূরের পুব-আকাশ একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। উপরের আকাশ থেকে একটা একটা তারা নিভে যাচ্ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই মরুভূমির বেদুইনের কণ্ঠে শোনা যাবে আজান।

লোকটি পিছন ফিরে তাকালো। গোগী আসছে না কেন? সে হাতের তালুতে বার তিনেক সাঙ্কেতিক শব্দ বাজালো। দেখতে দেখতে গুহার মুখ হতে উপরে উঠলো একটা বিপুলকায় ছায়া। লোকটা ফিসফিস করে কি যেন বললো। মুহূর্তেই গোগী হেলেদুলে কাছে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল। হাতের সিগারেট ততক্ষণে নিঃশেষিত। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা ধীর পদক্ষেপে সামনে এগোলো।

মরুভূমির পথ। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে অজস্র খেজুর গাছ। খেজুর গাছের সারি ঘন হয়েছে নদীর বাঁকের কাছে। চারপাশে চোখ তুলে তাকালে বালির পাহাড়, পিরামিড আর শীর্ণকায় খেজুর গাছ ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না সেখানে। বিধাতার

আশির্বাদের মতো কুলুকুলু বেগে বয়ে চলেছে নীল নদ।

নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো লোকটা। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। চারপাশে আবছা অন্ধকার। ফিকে কুয়াশা। হাওয়ার শব্দ। লোকটি সিগারেট টানছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ। তীক্ষ্ণ, খাড়া নাক। চোখ–জোড়া উজ্জ্বল তারার বিন্দুতে জ্বলছে। অপূর্ব সুন্দর একটি পুরুষ··· দেখে মনে হয় যেন গ্রীক–স্থপতির তৈরি একটা জীবন্ত ভাস্কর মূর্তি। বড় ক্লান্ত সে। লোকটি চুপচাপ বালির ওপর বসলো। গত তেরো রাত ধরে তার ঘুম নেই। সকাল বেলা আবশ্যকীয় কাজ–কর্ম সেরে নির্দিষ্ট গুহায় ঢোকে। সারাদিন সারারাত কাজ করে। যখন কিছুতেই পারা যায় না তখন সে গুহার পাথরেই মাথা রেখে চোখ বোজে। জিরিয়ে নেয়। এভাবে কতদিন যাবে কে জানে? ধরতে গেলে আসল কাজের কিছুই হয়নি। এখনো যেন গুহার গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে। মনে হচ্ছে মৃত্যুর হাতছানি যেন তাকে ক্রমেই জটিলতার গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যুর হাতছানিই হোক আর মৃত্যুই হোক, যে কাজে একবার সে হাত দিয়েছে কাজ শেষ না করে তো সে কিছুতেই সরে যেতে পারে না। এ তার স্বভাব বিরুদ্ধ। এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। অতীতের দিকে চাইলো সে ফিরে। মনে পড়লো আফ্রিকার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। শহীদ, কামালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। কই, বিপদ, মৃত্যু ভয় কিছুই তো তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এবারেই কি সে ব্যর্থ হবে? না অসম্ভব। মউত কবুল কিন্তু পরাজয় নয়।

সে উঠে দাঁড়াতে গেল। ঠিক এই সময় মোটরের হেড লাইটের তীব্র আলোর ঝলকানি এসে লাগলো তার গায়ে। মুহূর্তে সে আত্মগোপন করলো একটা ঢিবির পাশে।

গাড়িটা নদীর ঠিক বাঁকটার পাশে গিয়ে থামলো! এঞ্জিনের শব্দটা স্তব্ধ হলো। কৌতূহলী চোখ মেলে লোকটা দেখলো সেই গাড়ির আরোহী এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা! ধীর পায়ে সে গাড়ি থেকে নামলো। নিকটবর্তী হলো নদীর। কি ভেবে দাঁড়িয়ে রইলো। দাঁড়িয়ে উপরে চোখ তুলে আকাশ দেখতে লাগলো। বাতাসে তার ওড়না উড়ছে, মাথায় এলোমেলো কুন্তল উড়ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

আশ্চর্য তো! ঢিবির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো লোকটি। এই শেষ রাতের ভয়াবহ নির্জনতায় এই পুরবাসী মহিলা এখানে কেন? দয়িতের সন্ধানে? হবে হয়তো। কারো কারো মনে প্রেম এনে দেয় অস্থিরতা। এনে দেয় ঘর ছাড়ার বার্তা। হয়তো প্রেমের অস্থিরতাই এই যুবতী মহিলাকে ভোর রাতের বিভীষিকাময় নীল নদের তীরে ডেকে এনেছে। কিংবা কে জানে কি রহস্য জড়িয়ে আছে এই যুবতীটির জীবনে। লোকটি সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। কৌতূহল তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে দেখলো মহিলার দুই চোখ উদভ্রান্ত। শেষ রাতের ফিকে আলোয় অদ্ভুত রহস্যময়ী

বলে মনে হচ্ছে যুবতীকে। বুকের ওড়না উড়ে গিয়ে আটকে গেছে দুই বাহুতে। শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। শরীর বেয়ে যৌবন যেন উপচে পড়ছে।

মানুষ আলোর রহস্য দেখে যে চোখ দিয়ে, মুক্তির রূপ দেখে যে চোখ দিয়ে, সেই চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো লোকটি। কিন্তু ওকি। সহসা সেই নারী দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো। বাহুর বাঁধন ছেড়ে বাতাসে উড়ে গেল ওড়না। সাপের ফণার মতো উথলে উঠলো চুলের স্তবক। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই যুবতীর। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে কোঁপাতে লাগলো। বেদনা সজল শুকতারাটি তখন মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে। বহু দূরবর্তী ডোঙার মাঝি ভোরের আজান দিচ্ছে উচ্চকণ্ঠে।

যুবতীটি কান পেতে সেই ভোরের আজান শুনলো। কি ভেবে যেন শিউরে উঠলো। মাথা ঝাঁকালো বার কয়েক। তারপর উন্মত্তের মতো ছুটে গেল নদীর দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটি বুঝলো, আর কিছু নয় যুবতী আত্মহত্যা করতে চলেছে। একটুও দেরি না করে সে ছুটে এগিয়ে গেল। নদীর বিশাল বুক তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে অতল শান্তি। অসীম মুক্তি। যুবতীটি ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু পারলো না। কিসে যেন আটকা পড়েছে। সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না। ক্রমাগত কোঁপাচ্ছিল। কাঁদছিল। দূরের দিগন্ত রেখায় রক্তিম বর্ণে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠছিল, লোকটির বাহুতে হেলান দিয়ে রোরুদ্যমানা যুবতী সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। এক মুহূর্তের এদিক ওদিক হলে সে তলিয়ে যেতো নদীর অতল জলে। ভাগ্যের চক্রান্তে অপরিচিত এই লোকটি তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু একে কি রক্ষা বলে? এ যে যন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা। আবার তাকে সেই কুট চক্রের শিকার হতে হবে ভেবে যুবতী কাঁদতে লাগলো।

কিন্তু এবার সেই লোকটির বিস্মিত হবার পালা। যুবতীর দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ঢাকার অভিজাত হোটেল কক্ষে যার মৃতদেহ নিজের চোখে সে দেখেছে সেই জেবা ফারাহ্‌র জীবন্ত মূর্তি তার চোখের সামনে। না, কোনো ভুল নয়। এ সেই জেবা ফারাহ্‌। সেই আপেল–রাঙানো মুখ। মায়াবী নীল চোখ। তীক্ষ্ণ চিবুকের উপর পুরুষ্টু রঙিন ঠোঁট। জেবা ফারাহ্‌। আশ্চর্য…যাকে নেসার আহমেদ নিজের হাতে খুন করেছিল সেই জেবা ফারাহ্‌ তারই বাহুবন্ধনে! তারই নিঃশ্বাসের একান্তে নিঃশ্বাস ফেলেছে!

মেয়েটি আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। আত্মহত্যার সমস্ত প্রবণতা ও উত্তেজনা কাটিয়ে তার চোখ মুখ, শরীর এখন বিমর্ষ ক্লান্ত। লোকটি ইংরেজিতে বললো, 'তুমি জেবা ফারাহ্‌?'

'জেবা ফারাহ্‌!'

মেয়েটি মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো। পরিষ্কার ইংরেজিতে উত্তর দিলো, 'তুমি জেবা ফারাহ্কে চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি। ঢাকার এক হোটেলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তুমি কি তার বোন।'

'হ্যাঁ, আমরা দুবোন যমজ। আমার নাম দিবা ফারাহ্।' মেয়েটি আস্তে আস্তে শ্বাস টানলো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর কান্নার গলায় বললো, 'কিন্তু তুমি কে? কেন তুমি আমাকে বাঁচালে?'

লোকটি একটু হাসলো। ততক্ষণে তার মন থেকে সমস্ত অলীক ভয় আর দুর্ভাবনা কেটে গেছে। ভোরের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছিল দুজনের গায়ে। সেই আলোয় পরস্পরকে তারা দেখলো।

লোকটি বললো, 'তুমি মরতে চাইছো কেন?'

'বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই, তাই। তুমি বিদেশী। তুমি কায়রোর অভিজাত বংশের নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে জেবা ফারাহ্র বোন দীবা ফারাহ্র দুঃখ বুঝবে না।'

'তা বটে।'

লোকটি সহজ গলায় হাসলো। বললো, 'কিন্তু জানো, ইচ্ছে করলেই সহজ ও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা যায়। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো তাহলে আমাকে তোমার সব কথা খুলে বলো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

মেয়েটি বিদ্রূপ ভরে হেসে উঠলো। বললো, 'তোমার সাহস আছে বটে। যুবতী নারীর বিপদে নির্ভয়ে এগিয়ে আসার মনও আছে। কিন্তু শোনো বিদেশী, আমাকে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমার মরার একটুও ইচ্ছে ছিলো না...'

গলাটা ভেঙে এলো তার, 'বিশ্বাস করো আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু চাইলে কি হবে? মৃত্যু আমার অনিবার্য। মরতে আমাকে হবেই।'

লোকটি তার কথায় প্রতিবাদ করলো না। শুধু বললো, 'তুমি তো এমনিই মরতে যাচ্ছিলে। আমি বাধা না দিলে এতক্ষণে তুমি মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে থাকতে।'

'হ্যাঁ, থাকতাম। কিন্তু তুমি কে? কেন তুমি...'

একটু হেসে সে আবার বললো, 'বর্তমানে আমার একটা নামই প্রচলিত। আর সব নাম, পরিচয় ঢাকা পড়েছে। আমার নাম কুয়াশা। তোমাকে বাঁচান যায় কিনা একবার আমাকে চেষ্টা করতে দাও।'

কুয়াশা? দীবা ফারাহ্ স্তব্ধ হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। সে তাকিয়ে রইলো কুয়াশার বলিষ্ঠ দেহ আর সুন্দর সুঠাম মুখের দিকে। কুয়াশার নাম সে জানে। জেবা ফারাহ্, তার বোন, কুয়াশাকে নম্বর ওয়ান শত্রু বলে গণ্য করতো। জেবা দুনিয়ার কাউকে ভয়

করতো না। কিন্তু কুয়াশার নামে সে কম্পিত হতো। বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর লোকটি, সেই কুখ্যাত কুয়াশা তারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, দীবা যেন কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কুয়াশা হাসলো। বললো, 'দীবা, যে মরতে চায় তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। কিন্তু যে বাঁচতে চায় তার জন্য জীবনের কোনো না কোনো পথ খোলা থাকেই। ভোর হয়ে গেছে। আর দেরি করতে পারি না। চলো।'

'কোথায়?'

'কাছেই আমার লঞ্চ। সেখানে চলো।'

দীবা একবার তাকালো কুয়াশার দিকে। অবিশ্বাসের কিছু ছিলো না। কুয়াশার চোখের স্পষ্ট সরল চাহনী, তার হাসি দিবার মন থেকে সব দুর্ভাবনা দূর করে দিলো। তার মন বললো এই লোকটার যতো কুখ্যাতি থাক, নিষ্ঠুরতার যতো দুর্নামই থাক, এ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। নির্ভয়ে একে আশ্রয় করা যায়।

সে বললো, 'একটা কথা।'

'বলো।'

'আমাকে তুমি আশ্রয় দিচ্ছো। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো। তোমাকে এজন্যে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। হয় তো…'

সশব্দে হেসে উঠলো কুয়াশা। পথ দেখিয়ে বললো, 'চলো । আর দেরি নয়।'

তখন ভোর হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় মরুভূমি উদ্ভাসিত। খেজুর গাছের সারি দুই পাশে রেখে নীল–নদ বয়ে চলেছে কুলকুল বেগে। দিনটা ভারি সুন্দর।

চার

কায়রোর পুলিস সুপার মি. গামাল হাসানের মুখোমুখি বসেছিলেন মি. সিম্পসন। খোদাবক্স হত্যা ঘটনার তদন্তে জড়িত হয়ে তিনি সুদূর মিশরে এসেছেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই গোয়েন্দাটির কার্যকলাপ সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত ছিলো। মি. গামাল হাসানও এঁর সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। কিন্তু খোদাবক্স হত্যা ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে মি. সিম্পসনের চোখে ব্যর্থতা ও ক্লান্তির যে ছায়া ফুটে উঠলো তা দেখে গামাল হাসান একটু অবাক না হয়ে পারলেন না। মি. সিম্পসন বলেছিলেন, 'আমি জীবনে অনেক রহস্যময় ঘটনা ও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত হয়েছি মিঃ হাসান এবং শক্তি আমার যতটুকু থাক, আমি কখনো আত্মবিশ্বাস হারাইনি। কিন্তু এই ব্যাপারটা…'

মি. সিম্পসন একটু হাসলেন। তাকালেন মিঃ গামাল হাসানের দিকে। বললেন,

'বুদ্ধি, সাহস, আত্মবিশ্বাস সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে।'

মি. হাসান ড্রয়ার থেকে সুদৃশ্য সিগারেট কেস বের করলেন। কেসে পর পর কুড়িটি ফিল্টার্ড রথম্যান সিগারেট সাজানো আছে। কেসটি খুলে মি. হাসান সেটি বিনয়ের সঙ্গে বাড়িয়ে দিলেন মিঃ সিম্পসনের দিকে। ধন্যবাদ দিয়ে সিম্পসন একটি গ্রহণ করলেন। পুলিস সুপারের এয়ার কণ্ডিশনড ঘরের বাতাস চক্রাকার নীল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। দুজনই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করলেন। নীরবতা ভঙ্গ করলেন মি. হাসান। বললেন, 'আমার সরকারের পক্ষ থেকে সদাশয় বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে আগেই স্বাগতম জানিয়েছি মি. সিম্পসন। তারপর শুধু এইটুকু বলতে পারি এই ব্যাপারে আমাদের তরফ থেকে যে কোনো সাহায্য, যে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে বললে আমরা প্রস্তুত।'

সিম্পসন ধন্যবাদ জানালেন।

মি. হাসান বললেন, 'জেবা ফারাহ্ সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে ফাইলটি করা হয়েছে সেটি আপনাকে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মহামান্য সরকার। ফাইলটি এখুনি আপনাকে দেবার ব্যবস্থা করছি। আমার বিশ্বাস জেবা ফারাহ্ ও তার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী খোদাবক্সের হত্যা সম্পর্কে আপনি অনেক নতুন সূত্র ও তথ্য এতে পাবেন।'

সিম্পসন বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। আমার ও আমার সরকারের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। এই দুই বন্ধু রাষ্ট্রের ভেতর প্রীতি ও সৌহার্দ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এই কমনা করি।'

ইতিমধ্যে কফি প্রস্তুত হয়েছে। মি. সিম্পসনকে নিয়ে মি. হাসান প্রশস্ত বরান্দার অঙ্গনে গিয়ে বসলেন। বাইরে তীব্র উজ্জ্বল রোদ। কায়রো নগরের সুউচ্চ অট্টালিকারাজি চারদিকে দণ্ডায়মান। একটা বাতাস লু'র তপ্ত হল্কা ছড়াতে ছড়াতে ছুটে এলো। মি. সিম্পসন অভ্যাসবশতঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। হঠাৎ অদূরবর্তী রাজপথের একদিকে চোখ পড়াতে তাঁর দৃষ্টি থম্‌কে গেল। চমকে উঠ্‌লেন মি. সিম্পসন। লোকটিকে ঢাকায় তিনি দেখেছেন। লোকটি কৃষ্ণকায়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। মাথার কুঞ্চিত চুল ফুলে ফেঁপে ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। চ্যাপ্টা নাকের নীচে পুরু ঠোঁট। দুটি হাত পেছনে নিয়ে লোকটি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকে? হঠাৎ সিম্পসন সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে লোকটা যেন কিছু হয়নি এভাবে চট্‌ করে এক পাশে ঘুরে গেল। ঘুরে গিয়ে চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

মি. হাসান উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এনিথিং রঙ মি. সিম্পসন?'

'নাথিং সো সিরিয়াস।'

মি. সিম্পসন একটু হাসেন। তাকান মি. হাসানের দিকে। বলেন, 'যদি অসুবিধে না হয় তাহলে আমি আজই মহামান্যা রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মি. হাসান বিনীতভাবে আশ্বাস দিলেন–'মহামান্যা রাজকুমারীকে আগেই সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। তিনি সানন্দে আপনার সঙ্গে আজ বিকেল চারটায় দেখা করতে রাজি হয়েছেন।'

'আপনার কাছে আমি চির বাধিত মি. হাসান।'

মি. হাসান হেসে বললেন, 'আমাদের আতিথেয়তার ত্রুটি হয়তো থাকবে মি. সিম্পসন, কিন্তু অকপট বন্ধুত্বের হৃদয় আপনাকে উপহার দিতে পারবো।'

মহামান্যা রাজকুমারী আয়িদা বানুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে মি. সিম্পসন পথে নামলেন। কায়রোর রাজপথ অতি সুদৃশ্য। সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহের উপর মিনার শোভা পাচ্ছে। রাস্তার এখানে সেখানে উটের গলায় ঘন্টা ধ্বনি। রাস্তায় নেমে ভাড়া করা ট্যাক্সি নিলেন মি. সিম্পসন। হোটেলের নাম ঠিকানা বলতেই ট্যাক্সি চালকের চোখে-মুখে সম্মান ও বিনয়ের ভাব ফুটে উঠলো।

সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ ধূমপান করছিলেন মি. সিম্পসন আর চিন্তাকীর্ণ মনে আগাগোড়া সবটা ব্যাপার তলিয়ে দেখছিলেন। মিশর দেশীয় সুলতানদের একটা নক্সা যে এমন একটা রক্তক্ষয়ী, রহস্যময় ঘটনার জন্ম দেবে তা কে জানতো? নক্সাটি, সম্ভবতঃ ছিলো মিশরের শেষ শক্তিশালী ফারাউন প্রথম আখ্‌তানুনের। 'আমন' দেবতার পূজো বর্জন করে মিশর দেশে তিনি সূর্য্য দেবতার পূজো চালু করেছিলেন। ফলে তাকে 'আমন' দলীয় শক্তিশালী পুরোহিতদের কোপ দৃষ্টিতে পড়তে হয়েছিল। আখ্‌তানুন তাতে ভয় পাননি। তিনি রাজধানী সরিয়ে নিলেন কায়রো থেকে। কথিত আছে রাজধানী সরিয়ে নেবার সময় রাজকোষের বিপুল অর্থরাজি তিনি তাঁর পিতামহের সমাধি মন্দিরে প্রোথিত করে যান। প্রয়োজনের সময় যাতে এই অর্থ তিনি উদ্ধার করতে পারেন তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। সমাধি মন্দিরের গুপ্তকক্ষের চিহ্ন ও পথ তিনি একটি নক্সায় টুকে রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে 'আমন' দলীয় পুরোহিতদের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ঘটনাচক্রে এই নক্সা গিয়ে পড়ে দয়ালু রাজা আখ্‌তানুনের জ্ঞানী চিকিৎসকের হাতে। এই চিকিৎসকটি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ জানতেন যে তিনি এক সাধারণ মজুরের পুত্র। কিন্তু কালক্রমে বৃদ্ধ দশায় উপনীত হয়ে তিনি জানতে পারলেন তার দেহে আছে রাজ রক্ত। শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী ফেরাউনের উইল অনুযায়ী আখ্‌তানুনেরও পূর্বে সিংহাসনের উপর ছিলো তাঁর অধিকার। জ্ঞানী চিকিৎসক ঘটনার

আকস্মিকতায় বিমূঢ় হলেন। কিন্তু তিনি নির্বোধ ছিলেন না। সিংহাসনের অধিকা জানাতে গেলে তাঁকে যে বহু রক্ত ও লোক ক্ষয় করতে হবে তা তিনি জানতেন। তিনি নিঃশব্দে সিংহাসন ও রাজ দরবারের কুটিল পরিবেশ ত্যাগ করে গ্রামান্তরে চলে যান। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ আত্ম-জীবনীতে এই নক্সার উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসকের মৃত্যুর পর এই নক্সার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি দীর্ঘ তিন হাজার বছর। সেই চিকিৎসক এবং আখ্‌তানুনের নক্সাটির কথা ততদিন ইতিহাস পাতায় বিস্মৃত হয়েছে। ১৯৪২ সালে একদল ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ দু'শো ফিট মাটির নিচ থেকে আকস্মিকভাবে এই নক্সা এবং চিকিৎসকের আত্ম-জীবনীটি উদ্ধার করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই নক্সা এবং গ্রন্থটি এমনভাবে সংরক্ষিত ছিলো যাতে কালের এতটুকু অবক্ষয়ের চিহ্ন তাতে পড়েনি। এই নক্সার স্বত্ব নিয়ে ফরাসী সরকার ও মিশরের রাজ পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মিশরের রাজ পরিবার স্বাভাবিক ভাবেই এই নক্সার স্বত্ব দাবি করতে পারেন। কিন্তু গোলযোগ বাধিয়েছিল আত্ম-জীবনীতে লিখিত জ্ঞানী চিকিৎসকের কয়েকটি পংক্তি। তিনি এই নক্সা সম্পর্কে বলেছেন, 'আইনতঃ এই নক্সার মালিকানা আমার। ইচ্ছে করলে এই নক্সায় নির্দেশিত ধন সম্পত্তি উদ্ধার করে তা আমি ভোগ করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। করিনি কারণ আমি জানি ঈশ্বরের ইচ্ছে তা নয়। এই সম্পত্তি ভোগ করার মালিকানা ফিরাউন বা রাজবংশীয় লোকদের কি তাদের অধীনস্থ সাধারণ মানুষের এই প্রশ্ন আমার মনে বারবার দেখা দিয়েছে। মহাকালের হাতে এর বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম।' -

জ্ঞানী চিকিৎসকের এই উক্তি এই নক্সার প্রকৃত মালিকানা কার তা কিছুই নির্দেশিত করে না, ফলে ফরাসী সরকার ও মিশরীয় সুলতানের মধ্যে এই নক্সাটির স্বত্ব নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকাল বিবাদের পর আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে এই নক্সার উপর মিশরীয় সুলতানদের অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। সেই থেকে নক্সাটি রাজ পরিবারের গুপ্ত কক্ষে রক্ষিত ছিলো। স্বয়ং সুলতান ছাড়া এই নক্সাটির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধীকারিণী রাজকুমারী আয়িদা বানু। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মিশরীয় নর্তকী জেবা ফারাহ্ ছিলো তারই ঘনিষ্ঠতম সহচরী। রাজকুমারীর সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে রাজপ্রসাদে তার ছিলো অবাধ যাতায়াত। একটু আগের সাক্ষাৎকারে রাজকুমারী আয়িদা বানু মি. সিম্পসনকে বলছিলেন, 'অর্থের উপর জেবার ছিলো দারুণ লোভ। অনেক গুণে সে গুণান্বিত ছিলো। কিন্তু এই লোভ তার সমস্ত গুণাবলী এবং প্রতিভা নষ্ট করে দিয়েছে। জেবাই এই নক্সা রাজপ্রসাদ থেকে চুরি করেছিল মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন তা জানতেন। তিনি রাজকুমারীর দিকে সন্ধানী চোখে

তাকিয়েছিলেন। দেখেছিলেন রাজকুমারীর অনিন্দ্য সুন্দর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ক্ষোভ ও রাগের চিহ্ন। রাজকুমারী আরও বলেছিলেন, 'মিশর রাজ পরিবারের রোষবহ্নি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যেই নর্তকীর বেশে মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান ভ্রমণ করে ফিরছিল জেবা। আমরা জানতাম একদিন না একদিন তাকে মিশরে ফিরতেই হবে। সরকার থেকে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে যে কোনো ছদ্মবেশ ধরে জেবা মিশরে প্রবেশ করুক, পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেবাকে গ্রেফতার করা হতো। কিন্তু রাক্ষুসীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে নক্সা ফিরে পাওয়ার সমস্ত আশা লুপ্ত হয়েছে।'

মি. সিম্পসন সব কথাই জানতেন। তিনি দেখলেন রাজকুমারীর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে দারুণ হতাশা। আশ্বাস দিয়ে রাজকুমারীকে তিনি বলেছেন, 'হতাশ হবেন না মহামান্যা রাজকুমারী। জেবার মৃত্যু হয়েছে বটে। কিন্তু নক্সাটি এখনো সম্পূর্ণ অটুট অবস্থায় রয়েছে। এমন কি…'

তিনি একটু হাসলেন। বললেন, 'যার হাতে নক্সাটি রয়েছে সে এখন মিশরেই অবস্থান করছে।'

'কোথায়?'

রাজকুমারী দারুণ উত্তেজনায় আসন ছেড়ে প্রায় উঠে পড়েছিলেন।

মৃদু হাসলেন মি. সিম্পসন। চার হাজার বছরের পুরাতন এই নক্সা এমন রহস্যময় ও বিপজ্জনক ঘটনার সৃষ্টি করবে তা কি জ্ঞানী চিকিৎসক জানতেন?

ভাড়াটে ট্যাক্সি সজোরে ছুটে চলেছে। হাতের সিগারেটটি নিঃশেষিত প্রায়। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষে মি. সিম্পসন ফিরে চলেছেন হোটেলের দিকে বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্যে। কিন্তু বিশ্রাম কথার কথা মাত্র। মি. সিম্পসন এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। হাতের সিগারেটটি তিনি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কেন যেন খোদাবক্সের মৃত, নিশ্চল চোখ জোড়া তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়লো গুপ্তকক্ষে নেসার আহমেদ ও কুয়াশার সঙ্গে শেষ দেখার কথা। জেবা কারাহ্‌র কাছ থেকে নক্সাটি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল নেসার আহমেদ ও কুয়াশা দুজনেই। কার চেষ্টা সফল হয়েছে কে জানে? তবে সম্ভবতঃ নক্সাটি বর্তমানে নেসারের অধিকারে আছে। দুর্দান্ত প্রকৃতির দস্যু নেসার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে নক্সা নির্দেশিত গুপ্তধন উদ্ধারের কাজে। লুক্কায়িত আছে হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত সাত রাজার ধন। সেই ধনের জন্য কতো খোদাবক্সকে রক্ত দিতে হবে তা একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে।

ভাড়াটে ট্যাক্সি হোটেলের লনে এসে ঢুকলো। মি. সিম্পসন ড্রাইভারকে আশাতিরিক্ত বক্‌শিস দিলেন। ড্রাইভার মিশরীয় কায়দায় মাথা নিচু করে হাত

আন্দোলিত করে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

মি. সিম্পসন যখন নিজের ঘরে ঢুকলেন তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাছেই একটা মসজিদের দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছে কয়েকজন মুসল্লি।

পাঁচ

নীল নদের অনতিদূরে গিজেহ্ নামক এলাকায় হাজার হাজার বছরের পুরাতন পিরামিডগুলো দণ্ডায়মান। বিশালাকায় প্রস্তর নির্মিত সমাধি মন্দিরগুলো সর্বকালের মানুষের জন্যে বিস্ময়ের বস্তু। বহু ভ্রমণকারী প্রতিদিন এই পিরামিড দর্শনে যায়। আমরা যে তারিখটি উল্লেখ করছি সে তারিখটি ছিলো মিশর সরকারের নির্ধারিত ছুটির দিন। পিরামিড এলাকা সেদিন প্রায় জনশূন্য। সন্ধ্যা অনুমান সাতটায় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ মাইকে–রিনোস পিরামিডের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলো। অভ্যাস মতো চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সম্মুখস্থ এক গুহার ভেতর ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সেই দীর্ঘকায় লোকটি আর কেউ নয়, কুয়াশা। তীব্র টর্চ লাইটের আলোর পথ চিনে নিতে কষ্ট হলো না। অনতিবিলম্বে কুয়াশা পিরামিডের ভেতর প্রবেশ করলো। চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। দুই পাশে খাড়া প্রাচীর। এখানে ওখানে প্রস্তর নির্মিত নানা জীবজন্তুর মূর্তি। কুয়াশা দ্বিতীয় প্রাচীর পার হয়ে একটি স্তম্ভ ঘেরা অলিন্দে এসে ঢুকলো। ভেতরে ছোটো একটি কুঠুরী। কুঠুরীর ভেতর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। এই কুঠুরীর ভেতর বসেই কুয়াশা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে। আখতানুনের নক্সার পাঠোদ্ধার করে একটু একটু সে এগিয়ে চলেছে পিরামিডের সেই স্থানটিতে যেখানে সাত রাজার ধন হাজার হাজার বছর ধরে লুকনো আছে। গতকাল সে পিরামিডের সপ্তম প্রাচীর ভেদ করেছে। যদি নক্সার কথা সত্যি হয় তাহলে আর একটি প্রাচীর উত্তীর্ণ হলেই তার কাজ উদ্ধার হবে। আশা ও আশঙ্কায় বুক দুলছে। সে কুঠুরীতে ঢুকে দেখলো জেনারেটরের এক পাশে গোগী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির চোখে সে বিদ্যুতের তীব্র আলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কুয়াশাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পরক্ষণেই তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো বিশ্বাস ও আনন্দের হাসি।

'চিয়ার আপ গোগী।'

কুয়াশা একটু হেসে আস্তে গলায় আদর জানালো গোগীকে। ইশারা করতেই গোগী থপ্ থপ্ পায়ে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকের একটা প্রাচীর–মুখ খুলে দিলো। খুলে দিতেই এক ঝলক বিদ্যুৎ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকারে। প্রাচীর পথ অস্পষ্ট আলোয়

আলোকিত হয়ে উঠলো। অন্ধকার দেয়াল পথে ঝাঁপ দেয়ার মুখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাইলো কুয়াশা। গলা ততক্ষণে ধূমপানের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। পকেটে হাত দিতেই সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে উঠে এলো ছোটো একটি চিরকুট। চিরকুটে কায়রো নগরের জনৈক অভিজাত যুবকের নাম ও ঠিকানা লেখা। সব ঘটনা মনে পড়লো কুয়াশার। সেদিন ভোর বেলা দীবা ফারাহ্কে উদ্ধার করে সে লঞ্চে ফিরে গিয়েছিল। দুপুর পর্যন্ত দীবাকে সে কোনো কথা বলতে দেয়নি। বলেছে, 'আগে বিশ্রাম করো। পানি তৈরি আছে, স্নান সেরে নাও। লাঞ্চের পর কথাবার্তা হবে।'

দীবা কথা বলার জন্য উদগ্রীব ছিলো। কিন্তু কুয়াশার কথা নিঃশব্দে সে পালন করেছিল। দুপুরের খাওয়ার পর দুজন দুটি চেয়ারে কেবিনের বারান্দায় বসেছিল। দীবা তার সংঘাত ও বেদনাজর্জরিত জীবনের সব কাহিনী খুলে বলেছিল।

জেবা ও দীবার পরিবার কায়রো নগরের অত্যন্ত অভিজাত এক পরিবার। জেবা রাজকুমারী আয়িদার অন্তরঙ্গ সখী রূপে গণ্য হবার পর এই পরিবারের সম্মান আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সুখ, সম্মান প্রতিপত্তি সবই বুঝি নীল নদের জোয়ার ভাঁটার মতো সাময়িক। এই আছে, এই নেই। শীঘ্রই জেবা ও দীবাদের পরিবারে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। জেবা ছিলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তার উচ্চাকাঙ্খা পরিণত হলো লোভে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে সে রাজকুমারী আয়িদার নক্সা চুরি করে মিশর ত্যাগ করলো। জেবাকে অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের জন্য রাজ পরিবার থেকে বিশেষ এক শ্রেণীর গোয়েন্দা পুলিস নিয়োজিত হলো। দেশে বিদেশে চললো তৎপরতা। কেবল তাই নয়। দীবা ও তার বৃদ্ধ পিতার উপরও অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন শুরু হলো। কৌশলে বৃদ্ধ পিতার জমিদারী ও খেতাব বাজেয়াপ্ত করা হলো। বৃদ্ধ পিতা ভগ্ন মনোরথ হয়ে আত্মহত্যা করলেন। দীবাও পিতার সঙ্গেই আত্মহত্যা করতো। করেনি একটি মাত্র আশা ও বিশ্বাসে। সেই আশা ও বিশ্বাসের নাম মুজাদ্দিদ করীম, কায়রো নগরীর এক অভিজাত যুবক।

দীবা তার কাহিনী বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল। বলেছিল, 'গ্রীক দেবতা এপোলোর মূর্তি দেখেছো তুমি?'

কুয়াশা বলেছিল, 'দেখেছি।'

'তাহলে আর করীমের রূপ বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না। করীম গ্রীক দেবতা এপোলোর মতোই সুন্দর। সে আমাকে ভালবাসত আমি তাকে ভালবাসতাম। আমরা দুজন সুখের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু…'

বলতে বলতে দীবার গলার স্বর কান্নায় ভারি হয়ে এসেছিল, 'সেই নক্সা চুরির পর করীমও আমাকে ত্যাগ করলো। সে জানিয়েছে তার বাবা–মা একটি নিঃস্ব পরিবারের

মেয়েকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। শুনেছি কোটিপতি আল গাফ্‌রানের মেয়ে নাঈমা বর্তমানে তার বাগদত্তা।'

'এজন্যেই তুমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। বেঁচে থেকে আমার কি লাভ বলো? আমার অর্থ নেই, পারিবারিক সম্মান নেই···ভালবাসার মানুষটি পর্যন্ত আমাকে পরিত্যাগ করলো।'

কুয়াশা কথা বলেনি। শুধু দীবাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। তার নিটোল, লাবণ্যমাখা মুখখানি বেদনায় বিষণ্ন। যৌবন প্রাচুর্যে ভরা তন্বী দেহলতা হতাশায় ক্লান্ত।

দীবা বললো, 'আমাকে বাঁচিয়ে কোনো উপকার করোনি তুমি। আমাকে একদিন না একদিন মরতেই হবে।' কুয়াশা একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'যদি করীম তোমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়।'

'অসম্ভব।'

'ধরো সেই অসম্ভব সম্ভব হলো, তখন?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করেছিল দীবা। তারপর আবেগ তপ্ত গলায় বলেছিল, 'তুমি তো জানো আমি বাঁচতে চাই। করীম যদি আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় তাহলে আমি কি করবো তা বলার দরকার পড়ে না।'

চিরকুটটা পকেটে চালান দিলো কুয়াশা। মনে মনে একটু হাসলো, মেয়েদের হৃদয় কি কোমল আর স্নেহ মায়া মমতায় ভরা! এক অসতর্ক টোকায় সরোদের সব কটা তার যেন এক সঙ্গে বেজে উঠলো। টন্ টন্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। মনে পড়লো মহুয়ার কথা। মহুয়াই ছিলো তার একামাত্র স্নেহের বন্ধন। সেই বন্ধন বহুদিন সে ছিন্ন করতে পারেনি। বন্ধন ছিন্ন করতে গেলে হৃদয়ের কোথায় যেন বাজতো। আজ অবশ্য অন্য কথা। আজ সে বেরিয়ে এসেছে অতীত জীবনটা পেছনে ফেলে। বিজ্ঞান গবেষণায় তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন মেটাতেই হবে। যে করে হোক মেটাতে হবে। দীর্ঘ দু'মাস এই নক্সার পেছনে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করেছে। এখন উদগ্রচিত্তে সে ফল–লাভের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ফল লাভ করার আর কতো দেরি?

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো কুয়াশা। ডাকলো, 'গোগী···'

গোগী প্রভুর এই ডাকের অর্থ বোঝে। সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় ভারি একটা ব্যাগ পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। উত্তেজনায় তার গলা দিয়ে ঘড়র ঘড়র শব্দ বেরোচ্ছে।

কুয়াশা কুঠরী থেকে অন্ধকার দেয়াল পথে নামার আগে টর্চ লাইট ও ডিটেক্টর যন্ত্রটি হাতে নিলো। ঠিক এই সময় কুঠুরির বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শত্রু নয় তো? কুয়াশা একটু হাসলো।

এই যন্ত্রটির বিদ্যুৎ অগ্নি মুহূর্তে যে কোনো ইস্পাতকে গলিয়ে ভস্ম করে দিতে সক্ষম। কোনো মানুষের উপর প্রয়োগ করার জন্য এই যন্ত্রটি কুয়াশা তৈরি করেনি। কিন্তু প্রয়োজন বোধে, উপায় কি, প্রয়োগ করতেই হবে। সে সতর্ক ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। নিঃশব্দে কুঠুরী থেকে বেরিয়ে দেয়াল ঘেঁষা টানা বারান্দায় টর্চের আলো ফেললো। না, কেউ নেই। কিন্তু কেন যেন মনে হলো একটি ছায়া চকিতে দেয়ালের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃষ্টি বিভ্রম নয় তো?

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুয়াশা নিঃসন্দেহ হলো। না, কেউ নেই। এই অন্ধকার মাইকেরিনোস পিরামিডে কারো থাকার কথাও নয়। এই পিরামিডে অতীতে কার পদচিহ্ন পড়েছে কুয়াশা জানে না। হয়তো পদচিহ্ন পড়েছে ফারাওদের, তাঁদের অনুচরবর্গের ভাস্কর বা প্রত্নতত্ত্ববিদের। কিন্তু এই বিষয়ে কুয়াশা নিশ্চিত যে এই দুই মাসের ভেতর এই পিরামিডের অভ্যন্তরে গোগী ছাড়া তৃতীয় কোনো প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি। দৃষ্টি-বিভ্রম নিশ্চয়ই। কুয়াশা আর কালক্ষেপ না করে সোজা দেয়ালের অন্ধকার পথে নেমে গেল। এটি তৃতীয় প্রাচীরের শেষ সীমান্ত। আর চারটি প্রাচীর অতিক্রম করলেই ফারাওদের মূল সমাধি মন্দির পাওয়া যাবে। নক্সার নির্দেশ মতে সমাধিস্থ ফারাও'র শিয়রের দশ হাত মাটির নিচে আখতানুনের সেই ধন-রত্ন প্রোথিত।

সম্মোহিতের ন্যায় এগিয়ে চললো কুয়াশা। বিশেষ ভাবে তৈরি ইলেকট্রিক টর্চ লাইটের আলায় হাজার হাজার বছরের জমাট বাঁধা অন্ধকার এক একবার যেন চমকে উঠছে। এতক্ষণে তার হাতে রাখা ডিটেক্টর যন্ত্রটি সে চালু করেছে। এই যন্ত্রটি সে পিরামিডের রহস্য উদ্ধার করার জন্যে উদ্ভাবন করেছে। সেই সুদূর পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত প্রতিটি প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা কুয়াশার নখদর্পণে। সে জানে ১৮৩৭ সালে বৃটেনের প্রত্নতাত্ত্বিক গোষ্ঠি চিওপস পিরামিডের রহস্য ও গোপন কক্ষ-সমূহ আবিষ্কারের চেষ্টা করে কতকটা সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁরা পিরামিডের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করেন। যেখানেই তাঁরা দ্বার রুদ্ধ দেখেছেন সেখানেই তাঁরা গোলা বারুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ তৈরি করেছেন। কিন্তু এভাবে পিরামিডে প্রবেশের পথ করা যায়, পিরামিডের রহস্য উদ্ধার অসম্ভব। অনেক গবেষণার পর কুয়াশা এই ডিটেক্টর যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে তীব্র শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি পিরামিডের দেয়ালে প্রেরণ করা যায়। এই মহাজাগতিক রশ্মি রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষাও শক্তিশালী। এই রশ্মি ৩০০০ মিটারেরও বেশি ঘনত্ব ভেদ করে চলে যেতে পারে। এই রশ্মি পাঠিয়ে কুয়াশা ষষ্ঠ প্রাচীর পর্যন্ত মাইকেরেনোস পিরামিডের অভ্যন্তরস্থ সব রহস্য অবগত হয়েছে। বাকি আছে সপ্তম ও শেষ প্রাচীর। কিছুক্ষণের মধ্যে সব রহস্য কুয়াশার জ্ঞাত হবে।

অন্ধকার প্রাচীর পথের একস্থানে এসে কুয়াশাকে থামতে হলো। টর্চ লাইটের আলো ফেলে দেখলো, সামনের পথ রুদ্ধ। নতুন একটি দেয়াল উঠেছে। তবে কি এটিই সপ্তম দেয়াল? কুয়াশা উগ্র চিত্রে নক্সার নির্দেশ অনুযায়ী বাঁ' দিকে দশ পদক্ষেপ এগিয়ে গেল। একটি পাথরের স্তম্ভের উপর ভীষণকায় এক সাপের মূর্তি। মনে হয় যেন ফণা দোলাচ্ছে। কিন্তু আসলে এটি আর কিছু নয়, পাথরের গড়া মূর্তি। সাপের চোখে টিপ দিতেই একটি গুহা মুখের মতো দরজা খুলে গেল। কিন্তু ভেতরে এক পা দিতেই প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে কুয়াশাকে পিছিয়ে আসতে হলো।

ছয়

কায়রোর বিখ্যাত কস্‌মোপলিটান হোটেলের লনে এক বৃদ্ধ ইহুদী অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁর মাথার চুল সাদা। নাকে ফ্রেম হীন চশমা। তীক্ষ্ণ নাকের ওপর দুটি ঘোলাটে চোখ। ভদ্রলোক ঘড়ি দেখছিলেন আর দরজার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর আর একজন বৃদ্ধ ইহুদী কাঁধে ট্যুরিস্ট ব্যাগ ঝুলিয়ে আস্তে পায়ে লনে ঢুকলেন। প্রথমোক্ত ইহুদী সচকিত হয়ে তাকালেন।

'হ্যালো জন।'

জন এগিয়ে এসে এক গাল হাসলো। ইংরেজিতে বললো, 'ঘন্টা খানেকের ভেতর না গেলে কিন্তু…'

'আমার সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। তুমি বরং এক কাজ করো। এই ফোন নাম্বার নিয়ে সুপার সাহেবকে জানিয়ে দাও…'

'রাইট স্যার।'

'আমি রিসেপ্‌শনের দিকে যাচ্ছি। বিলটা মিটিয়ে সোজা ছুট্‌বো।'

তখন অনুমান সকাল ন'টা। আরবী পোশাকে সজ্জিত একদল সামুদ্রিক জাহাজী ড্রাম বাজিয়ে হল্লা করতে করতে যাচ্ছিলো।

রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে ওদের দেখছিল। কিন্তু সেদিকে ওদের দৃকপাত নেই। বণিক দলটি দুইদিন আগে সুমাত্রা থেকে জাহাজ বোঝাই নানাপ্রকার মসলা ও ফলমূল নিয়ে কায়রো ফিরেছে। সমুদ্রে ভেসে ভেসে ওরা জীবন কাটায়। ওদের জীবনের ভরসা কি? বাধা বিপদের মুখে যে কোনো সময় ওরা আক্রান্ত হতে পারে। মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই সুযোগ পেলেই আমোদ প্রমোদে এরা সময় কাটায়। দলটি দুইদিন হলো এসেছে। এসে নানা ভাগে ভাগ হয়ে নগরের এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আলোচ্য দলটি কসমোপলিটান হোটেল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে।

কায়রোর দক্ষিণ প্রান্তে গানের জলসা বসে রোজ দুপুরে। উন্মুক্ত ময়দানে খেজুর গাছের ছায়ার নিচে যাযাবর রমণীরা মিশরীয় বেদুইনের হাতের ম্যাণ্ডোলিনের বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। যাযাবর রমণীদের চোখের কটাক্ষ মদির। লাল ঘাগড়ার ঢেউয়ে আরব সাগরের বাতাস নাচে।

ড্রাম বাজিয়ে বাজিয়ে ওরা চলেছে। হঠাৎ এক অভিজাত অট্টালিকার কাছে এসে দলটি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না অট্টালিকার দ্বিতল জানালায় বাইনোকুলার চোখে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

লোকটি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। পরনে দামি পোশাক। চোখে গগল্‌স আটা। সে হঠাৎ হাসতে শুরু করলো। হাসি আর থামতে চায় না। দরজা দিয়ে তড়িৎ পায়ে ছুটে এলো দীর্ঘকায়, কুৎসিত একটি লোক। অস্থির গলায় বললো, 'ওস্তাদ ওরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।'

'সে তো দু'দিন ধরেই অপেক্ষা করছিলে, ভয় কেন?'

'না, ভয়ের কি আছে?'

কুৎসিত লোকটি একটু হাসলো। বললো, 'কোরবান আলী শুধু ভয় করে ওস্তাদকে। ব্যস, আর কাউকে না।'

'যা বলেছিলাম তা করেছো?'

'জরুরী।'

'তাহলে সবাইকে ওয়ার্নিং দিয়ে সরে যেতে বলো।'

'বেশক।'

'শোনো কোরবান।'

ওস্তাদ নামধারী হাসলো, 'হারামজাদাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই। ওরা সবাই যাক। তুমি যেয়ো না···আমার সঙ্গে থাকো···'

'কিন্তু।'

বলে বোধহয় ইতস্ততঃ করছিল কোরবান। আর সাহস পেলো না। নিঃশব্দে সেলাম জানিয়ে আদেশ পালন করবার জন্যে সে কক্ষান্তরে চলে গেল।

ততক্ষণে হল্লাকারী দলটা বাড়ির সর্বত্র ঢুকে পড়েছে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে ওরা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বাড়িটা ঘেরাও করে রইলো। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। এর ভেতর কখন যেন পূর্ব বর্ণিত দু'জন বৃদ্ধ ইহুদী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা কাল ব্যয় না করে দ্রুত পায়ে উপরে উঠলেন। প্রতি মুহূর্তে নেসার আহমেদের দলের লোকদের আক্রমণের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। কিন্তু আশ্চর্য এক নীরবতা বিরাজ করছে

বাড়িটিতে। তবে কি এতদিনকার অনুসন্ধান ভুল পথে চলেছিল? তাই বা কি করে হয়?

হঠাৎ জানালা পথে এক যুবকের মুখ দেখা গেল। যুবকটি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললো, 'একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এভাবে চড়াও হওয়ার কি অর্থ জানতে পারি জনাব?'

'অতি শীঘ্র তা জানতে পারবেন।' প্রথমোক্ত বৃদ্ধ ইহুদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলেন। তাঁর বুকের রক্ত উত্তেজনায় টগ্‌ বগ্‌ করে ফুটছিল। আর কোনো সন্দেহ নেই, এটি সঠিক আড্ডা। স্বয়ং নেসার আহমেদ ভদ্র যুবকের ছদ্মবেশে কথা বলছে।

'অ্যাডভান্স।' প্রথমোক্ত ইহুদী নিচের দলকে আদেশ দিলেন। হাতে উদ্যত রিভলভার। যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটুও নড়াচড়ার চেষ্টা করো না নেসার। মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'

'বলেন কি সায়েব।' নেসার যেন মাথার খুলি উড়ে যাবার ভাবনায় চম্‌কে উঠলো। তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'মি সিম্পসন, আপনি একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাধা!'

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে ইহুদীবেশী মি. সিম্পসন বললেন, 'আমি কি সেটা এক্ষুণি জানতে পারবে বাছাধন!'

মি. সিম্পসন ও তাঁর সঙ্গীর রিভলভারের রেঞ্জের ভেতর অনায়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো নেসার। তার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বললো, 'আহা, টিকটিকি সাহেব, রাগ করছো কেন? আমাকে ধরেছো, না হয় আমি তোমার বন্দী। কিন্তু দুটো রসালাপও করতে দেবে না, তুমি লোকটা কি হে?'

ইতিমধ্যে নিচের দলটি মি. সিম্পসনের আদেশে উপরে উঠে এসেছে। নেসারকে সর্বক্ষণ রিভলভারের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে মি. সিম্পসন নিজে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। না, কেউ নেই। দেয়াল ও থামের ওধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। কোথাও কেউ নেই। দু'হাত ওপরে তুলে সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর দস্যু নেসার আহমেদ।

পেছন থেকে দু'জন ও সামনে থেকে মি. সিম্পসন এগিয়ে যাচ্ছিলেন নেসার আহমেদের দিকে। নেসার আহমেদ গলা কাশি দিয়ে বললো, 'যা করার করে ফেলুন টিকটিকি সাহেব। উর্ধ বাহু হয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না।'

মুহূর্তে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন ও তাঁর দু'জন সঙ্গী। নেসার আহমেদের চোখ মুখ কঠোর হয়ে উঠলো। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় বললো, 'নিচের সব ক'টাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দে। এই হারামজাদা থাক। এর ব্যবস্থা পরে হবে।'

নেসার আহমেদের সঙ্কেতে দেয়াল দু'ফাঁক হয়ে গর্তমুখ দেখা গেল। বেরিয়ে এলো

কোরবান। হাসিমুখে বললো, 'যা হুকুম দিয়েছিলেন ওস্তাদ তাই করেছি। মাত্র তিনটে গ্যাস বোম ছুঁড়েছিলাম ওস্তাদ। তাতেই দেখছি শালারা সব হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে।'

'আর দেরি করো না।'

নেসার আহমেদ চিন্তাকীর্ণ গলায় বললো, 'এক্ষুণি এই আড্ডা পুড়িয়ে দিতে হবে। আমি মিনিট দুয়েকের মধ্যে এক নম্বর আড্ডায় ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুড়ঙ্গ পথটা ঠিক রেখে বাকি সব মিসমার করে দিয়ে এসো। সিম্পসনকে পাথর ঘরে পাঠিয়ে দাও। অলরাইট?'

'ঠিক হ্যায় ওস্তাদ!' কোরবান সালাম দিয়ে বললো।

দেয়ালের গর্তমুখ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে সোজা মাটির নিচে নেমে গেল নেসার আহমেদ। সুড়ঙ্গটি গিয়ে পৌঁছেছে গিজেহ এলাকার মরুভূমিতে। এখানে ওখানে অনুচ্চ পাহাড়, টিলা, খেজুর গাছ ও ঝোপঝাড়।

কয়েক মিনিট নীরবতা বিরাজ করলো পূর্বোক্ত হানাবাড়িতে। তারপর বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে অগ্নুৎপাত ঘটতে লাগলো। মুহূর্তে ধোঁয়া ও আর্তনাদের শব্দে আকাশ বাতাস ভরে উঠলো।

সেই আর্তনাদের সঙ্গে তাল রেখেই যেন একটি পিশাচ কণ্ঠ গিজেহ এলাকার মরুভূমির নিচে এক সুরক্ষিত গুপ্তকক্ষে দাঁড়িয়ে প্রবল ভাবে অট্টহাস্য করে উঠলো। সামনে দাঁড়িয়েছিল কোরবান ও মোতিয়া। যুবতী মোতিয়া নেসারের পানপাত্র ভরে দিচ্ছিলো নতমুখে।

নেসার আহমেদ হাসতে হাসতে বললো, 'তাহলে সব ঠিক আছে কোরবান?'

'সব ঠিক আছে ওস্তাদ। সিম্পসন কুত্তাটাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাথর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর তিন নম্বর আড্ডাটা এতক্ষণে বোধহয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'অল ক্লিয়ার। শোনো কোরবান, আমরা দিন তিনেকের ভেতর এই দেশ ত্যাগ করবো। তুমি যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে রাখো। মোতিয়া...'

মোতিয়া ভীত চোখে নিঃশব্দে পানপাত্র ভরে দিলো। গ্লাসে চুমুক দিয়ে নেসার আহমেদ বললো, 'আজ সারাদিন আমি বিশ্রাম করবো। রাত্রি বেলা শুরু করবো কাজ। আমার সঙ্গে তুমি ছাড়া থাকবে কালু আর মদন।'

'ঠিক হ্যায় ওস্তাদ!'

'পথ পেয়ে গেছি। রাস্তা বিল্‌কুল সাফ্‌। এখন শুধু মণিমুক্তা বোঝাই করে পাচার করা! হাঃ, হাঃ, হাঃ'

নেসার আহমেদ হাসলো। 'জেবাকে মেরেছিলাম বড় কায়দা করে। বিছানায়

শুয়ে, গায়ে আদর করতে করতে…কোরবান…'

'জি ওস্তাদ…'

'সিম্পসন কুত্তাটা কিন্তু ত্যাঁদোড়। সাবধান…'

'ওস্তাদ যা বলেছেন তাই হবে, আমরা সাবধানে থাকবো।'

'হুঁ, সাবধানে থেকো…'

নেসার আহমেদ স্খলিত পায়ে মোতিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। মোতিয়া ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। সে বুঝলো, পানপাত্র ভরে দেবার কাজ ফুরিয়েছে। এখন নিজেকেই পানপাত্র করে তুলে ধরতে হবে নেসার আহমেদের কাছে। কোরবান হাসলো। কানা চোখটা আরও কুৎসিত দেখালো। প্রভু ও মোতিয়ার দিকে তাকিয়ে চকিতে সে কক্ষান্তরে সরে এলো।

সাত

পেছনে দাঁড়িয়ে গোগী ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। আঘাতটা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ লাগলো কুয়াশার। গোগীর দিকে তাকিয়ে আস্তে গলায় বললো, 'কোয়ায়েট গোগী।'

গোগীর গর্জন থেমে গেল। সে বোবা দৃষ্টি মেলে প্রভুর দিকে তাকিয়ে রইলো। কুয়াশা বুঝলো, আর কিছু নয়, গোগী বিচলিত হয়েছে তার আর্তনাদ শুনে। সপ্তম প্রাচীরে পা দিতে গিয়ে ডান দিকে ঘুরেছিল কুয়াশা। অমনি প্রবল এক বিষনিঃশ্বাসের ঝাপটা এসে লাগলো তার চোখে মুখে। মুহূর্তে মনে হয়েছিল তার মৃত্যু হচ্ছে। দম টানতে পারছে না। 'আমি মরছি' এই ভাবনার ভেতর প্রবল এক প্রতিরোধকারী শক্তির প্রতিক্রিয়া থাকে। সেই শক্তির বলেই হয়তো সে ছিটকে পেছনে সরে আসতে পেরেছিল। নতুবা তার প্রাণহীন দেহ পিরামিডের পাথরে এতক্ষণ নিশ্চল পড়ে থাকতো। এক সময় প্রাণায়ামের অভ্যাস ছিলো কুয়াশার। সেই অভ্যাসের বলে সে অচিরে বিষ-কষ্ট থেকে নিঃশ্বাস মুক্ত করলো। ডিটেক্টর যন্ত্রটি বন্ধ করে সে একটি পাথরে আসন নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

মনে পড়লো দীবার কথা। সে যখন বেরিয়ে আসে তখন দীবা দাঁড়িয়েছিল কেবিনের বারান্দায়। ঢিলে কোর্তা ও পাজামা পরনে, পিঙ্গল কেশরাশি পিঠে ছড়ানো। বিষণ্ণ ও নিশ্চল দীবাকে অন্ধকারে মোমবাতির শিখার মতো সুন্দর ও আরক্তিম দেখাচ্ছিল। সে দীবাকে শুভ প্রভাত জানিয়েছিল। দীবা বলেছিল, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে?'

'বলো কি?'

কুয়াশা একটু হেসেছিল, 'আমি যাবো মাটির নিচে কবর খুঁড়তে। সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে?'

'না, আমি যাবো। আমি নানাভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।'

'না, তুমি এখানেই থাকো।'

কুয়াশা হেসে বলেছিল, 'তুমি চিন্তা করো না। তোমার মামলা প্রায় খতম করে এনেছি। মুজাদ্দিদ করীমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে।'

দীবা সাগ্রহে কথাগুলো শুনলো। হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এইবার সোজা হলো। বললো, 'সত্যি?'

কুয়াশা একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'আমি চলি...'

দীবা পুনর্বার অধীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছো, সে জায়গা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই কুয়াশা। আমার কথা রাখো, আমাকে সঙ্গে নাও।'

কুয়াশা বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এখানেই থাকবে। চলি, অনেক দেরি হয়ে গেল!'

দীবা আসতে চেয়েছিল, দীবাকে সে আনেনি।

আনা সঙ্গত হতো না তাই আনেনি। কিন্তু দীবা ঠিক কথাই বলেছিল। এই পিরামিডের সপ্তম প্রাচীর সম্পর্কে তার প্রায় কোনো ধারণাই নেই।

হঠাৎ গোগী হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালো কুয়াশা। দেখলো, গোগী পেছনের দিকে তাকিয়ে আছে আর অনবরত ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

কুয়াশা জানে ইতর জন্তুর ঘ্রাণ ও শ্রবণ শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষতঃ গোগীর এই ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না। ব্যাপার কি দেখার জন্যে সে উঠে দাঁড়ালো। মনে পড়লো পদশব্দ শোনার কথা। দেয়ালের সাথে মিশে যাওয়া ছায়ামূর্তির কথা। সে এগিয়ে গেল। সতর্ক পায়ে এদিক ওদিক খুঁজলো। অপেক্ষা করলো। না, কোথাও কেউ নেই।

সে দৃষ্টি দিয়ে আদর করলো গোগীকে। তার একমাত্র বন্ধু। আফ্রিকার লিম্পোপো নদীর সহস্র কুমীর তাকে আক্রমণ করেছিল। আত্মরক্ষা সে করতে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু গহন অরণ্যে বিপদ আপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাকে একাকী। সেইসব অসহায় দিনে গোগী তাকে বাঁচিয়েছিল। এখন পর্যন্ত তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গোগীকে বশে রাখতে হয় বটে, কিন্তু এতদিনে গোগী তার জীবনের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তার দুঃখে গোগী দুঃখ পায়। তার আনন্দে গোগীর জান্তব চোখে অবোধ বন্য খুশি ফুটে ওঠে।

সে গোগীকে আদর জানালো। গোগীর গলায় খুশির ঘড়র-ঘড় শব্দ বেরোতে লাগলো। খুব সমঝদারের মতো সে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগলো। কুয়াশা বুঝলো গোগী তার আদরটুকু গ্রহণ করেছে।

বিশ্রামের মুহূর্ত শেষ। এইবার এগিয়ে যাওয়ার পালা। কুয়াশা উঠে দাঁড়ালো। সম্ভবতঃ ভুল তারই। নক্সায় চিহ্নিত পথটির অবস্থান বাঁ'দিকে। ডানদিকে এগিয়েছিল বলেই হয়তো এই বিভ্রাট। দেখা যাক। বাঁ'দিকে পা বাড়ালো সে। তীব্র টর্চের আলো ফেলে দেখলো। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য প্রাচীর পথের মতোই স্বাভাবিক পথ। তবে অন্যগুলোর তুলনায় সঙ্কীর্ণ। সতর্ক পায়ে সে এগিয়ে চললো। এক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই সে চমকে উঠলো। একটা নরকঙ্কাল দেয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একমিনিট। তারপর দেয়ালের গা ধরে যেই এগোতে গেল সামনে অমনি পেছনে তীক্ষ্ণ সতর্কবাণী শোনা গেল 'ওয়াচ আউট!' কুয়াশা লাফিয়ে পেছনে হটে এলো। মুহূর্তে দেয়াল থেকে দুটি পাথরের হাত বেরিয়ে এসে, আবার আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দেয়ালে মিশে গেল।

কুয়াশার বিস্ময়ের সীমা নেই। দেখলো সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে আর কেউ নয়, দীবা।

সে তখনও হাঁপাচ্ছে। বললো, 'ম্যান-ট্রাপের ভেতরে পড়তে গিয়েছিলে তুমি। আমি জানতাম এমনি কিছু ঘটতে পারে।'

কুয়াশা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো দীবার দিকে। গুপ্তধনের এই নক্সার সঙ্গে জেবা ফারাহ্'র বোন দীবা ফারাহ্র সম্পর্ক থাকা অন্ততঃ অস্বাভাবিক নয়। কিংবদন্তী ও প্রবাদ সূত্রে দীবা পিরামিডের রহস্য সম্পর্কে হয়তো অনেক কথাই জেনেছে। কে জানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে অযাচিত ভাবে কুয়াশাকে রক্ষা করার পেছনে পিরামিডের রহস্যের চাইতেও বড় ও জটিল রহস্য আছে কিনা।

প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিলো না! তবু কুয়াশা বললো, 'তুমি এলে কি করে?'

'বলছি...।' দীবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। পেছন দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো, 'তোমার ঐ গোগীর হাত থেকে আপাততঃ আমাকে বাঁচাও। সর্বক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর মুখ বেজার করে ভোঁস ভোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে।'

কুয়াশা হেসে ফেললো। বুঝলো, গোগীর ঈর্ষা হয়েছে। কুয়াশাকে কেউ পছন্দ করুক, কুয়াশা কাউকে পছন্দ করুক এ বোধহয় শ্রীমান গোগী চায় না। তার কাছে এসব খুব খারাপ লাগে। প্রথম প্রথম তো দীবাকে একদম সহ্য করতে পারতো না। কুয়াশা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখলে হুঙ্কার ছাড়তো। কে জানে ছাড়া থাকলে হয়তো মেরেই বসতো দীবাকে। এখন ততটা আক্রোশ নেই। সে বুঝেছে তার প্রভু দীবাকে

পছন্দ করেন। তাদের দুজনের ভেতর ভাব রয়েছে। দীবার ক্ষতি করলে তার প্রভু ব্যথা পাবেন, রাগ করবেন এটা জানার পর গোগী আর আগের মতো দীবার প্রতি প্রকাশ্যে হিংসা প্রদর্শন করে না। তবে দীবাকে দেখলেই সে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে যায়। ভ্রূকুটির সঙ্গে দীবার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভেংচি মারতেও ছাড়ে না।

'কোয়ায়েট গোগী...'

কুয়াশা গোগীর দিকে তাকায়।

গোগী হাঁ করে তাকায়। ভাবটা, 'বাঃ, আমি আবার কি করলাম!' পরে প্রভুর আদেশ বুঝতে পেরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

কুয়াশার ডিটেক্টর যন্ত্রটি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। পাশে বসে সে ও দীবা। দীবার চোখ-মুখ উজ্জ্বল, আরক্তিম। মুজাদ্দিদ করীমের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারছে, হয়তো এই ভাবনায় সে সুখী। কুয়াশা মহুয়ার কথা মুহূর্তের জন্যে ভাবলো। মনে মনে হাসলো।

'চলো এবার।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, লঞ্চে।'

কুয়াশা প্রথমেই জবাব দিলো না। সে দীবার সুন্দর মুখখানি দেখতে লাগলো। দীবা আবার বললো, 'কি হলো...'

'তুমি যাও দীবা। আমি যাবো না।'

'কেন?'

'যে কাজের জন্য বেরিয়ে এসেছি সে কাজ উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রামের প্রশ্ন ওঠে না। তুমি বরং যাও।'

দীবা প্রতিবাদ করলো না। কিছুদিনের ভেতর এই লোকটির স্বভাব সে জেনে ফেলেছে। চারদিকে সে তাকালো। আবছা আবছা অন্ধকার। ভ্যাপসা গরম। সামনে সপ্তম প্রাচীরের ছায়া ছায়া অলিন্দ দেখা যায়। সঙ্কীর্ণ পথের এখানে ওখানে কি ভাবে মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে কে জানে?

ওরা এগোলো। কুয়াশা একটা গভীর গর্তের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। পিরামিডের নানা স্থানে এইসব গভীর গর্ত লুকিয়ে আছে। কতো অসংখ্য লোক এই ধরনের গর্তে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিছুদূর এগিয়ে সামনে পড়লো একটি ভগ্ন দেয়াল। দেয়ালের সঙ্গে মিশে আছে বিরাটকায় এক বিড়ালের মূর্তি। ফারাহ্'দের যুগে মিশরের লোকেরা বিড়াল পূজা করতো। তাদের কাছে বিড়াল ভাগ্যদেবী। সাধারণতঃ পিরামিডে এইসব বিড়ালের

মূর্তি রাখা হয় মৃত রাজা বা রাণীর শিয়রের কাছাকাছি একটা স্থানে। বিড়ালের মূর্তি দেখে কুয়াশা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললো, 'আমরা তাহলে সমাধি মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছেছি।'

দীবা জবাব দিলো না। কুয়াশার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই একটা সন্দেহ তার মনে দেখা দিয়েছিল। বলি বলি করেও সেই সন্দেহের কথা কুয়াশাকে সে খুলে বলেনি। বিড়ালের মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিলো কুয়াশা কোথাও ভুল করেছে।

ঠিক এই সময় একটা হাতুড়ি-ঠোকার ক্ষীণ শব্দ দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে ভেসে এলো। চমকে উঠলো দুজনেই। কুয়াশা কান পাতলো। তার চোখ দুটি বিস্ময়ে ঝিকিমিকিতে ভরে গেল। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট ও স্থায়ী হলো। মনে হলো কাছেই কোথাও শব্দটা বেজে চলেছে।

গোগী তখন ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছে। শব্দটা তারও কানে এসেছে। তার ভাষায় এই শব্দের অর্থ যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান। টুক টুক টুক ঠাক। শব্দটা মুহূর্তের জন্য থেমে যায়। আবার জেগে ওঠে। গোগী দুই হাতে বুক চাপড়াতে লাগলো। তার চোখ মুখ অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় কঠোর ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

কুয়াশা বললো, 'গোগী!'

গোগী বুঝলো তার প্রভু বলছেন এ তোমার শত্রু নয়, গোগী। তুমি শান্ত হও।

সে হাঁ করে প্রভুর দিকে তাকালো। তারপর দীবার দিকে। শান্ত হয়ে গেল।

নিশ্চল, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা। তাকে পেছনে রেখে হঠাৎ এগিয়ে গেল দীবা। যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলো। কুয়াশা প্রথমে বিস্মিত হলো। তারপর বুঝলো পিরামিডের গোলক ধাঁধার রহস্যে অস্থির হয়ে উঠেছে দীবা। হয়তো সে এই অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে মুক্ত আলোর দেশে যেতে চায়। হু হু হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নিতে চায়।

সে-ও ছুটতে ছুটতে দীবাকে অনুসরণ করলো। ডাকলো, 'দীবা, দীবা...'

দীবা মানা শুনলো না। উন্মাদিনীর মতো সে ছুটতে লাগলো। পিরামিডের রহস্য উদ্ধারের নেশা বড় ভয়ানক। গুপ্তধনের লোভ বড় প্রচণ্ড। সেই লোভে পড়ে প্রাণ দিয়েছে হতভাগিনী জেবা। পিরামিডের অতল রহস্যের হাতছানি হয়তো দীবাকেও টানছে।

'দীবা, শোনো।'

কুয়াশা প্রাণপণে চিৎকার করলো। অন্ধকার গুহায় সেই শব্দ প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি ঢেউ তুলে সর্বত্র গমগম করতে লাগলো।

কুয়াশা ছুটছে। আর এক মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরই দীবাকে সে ধরতে পারবে।

হঠাৎ প্রবল শব্দে ধসে পড়লো একটি প্রকাণ্ড পাথর। দীবা আর্তনাদ করে উঠলো। ততক্ষণে সে কুয়াশার বাহুবন্ধনে। এক চুল এদিক ওদিক হলে প্রকাণ্ড সেই পাথরটি তার উপরে এসে পড়তো। তারপর কি হতো ভাবতে গিয়ে চোখ বুজলো দীবা। প্রাণপণে সে আঁকড়ে ধরলো কুয়াশার গলা। তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে লাগলো।

কুয়াশা দীবার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। কিন্তু সম্মুখের দিকে তাকিয়ে তার সমগ্র সত্তা স্থির হয়ে গেল। পথটা চলে গেছে দক্ষিণে। এই পথটি সপ্তম প্রাচীর অতিক্রম করে অন্য কোথাও চলে গেছে। তবে কি নক্সা বর্ণিত সপ্তম প্রাচীর শেষ স্থান নয়? কিন্তু তাই বা কি করে হয়?

অনেকক্ষণ পর দীবা সংবিৎ ফিরে পেলো। আস্তে আস্তে সে কুয়াশার বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। সে বুঝলো তার আতঙ্কের কারণ ছিলো যা সেই শব্দটা আর কোথাও নেই। কিন্তু স্খলিত সেই পাথরের ওপাশ দিয়ে একটি গুহা মুখ বেরিয়ে পড়েছে। যেন মুখ-ব্যাদান করে প্রচণ্ড এক মৃত্যু তাদের আহ্বান জানাচ্ছে। সে দেখলো তার মতো কুয়াশাও নির্বাক দৃষ্টিতে সেই নতুন পথটির দিকে তাকিয়ে আছে।

'এই হচ্ছে সঠিক পথ…'

দীবা ফিসফিস করে বললো, 'এই পথ ধরে গেলে আখতানুনের ধন-রত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি ধনরত্ন চাই না। আমি বাঁচতে চাই। আমি জানি, যে ঐ পথে একবার ঢুকেছে, সে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে যায়নি। কখনো যায়নি…'

'স্থির হও, দীবা…'

কুয়াশা যেন তিরস্কার করলো। বললো, 'ভেবে দেখো তুমি ইচ্ছে করেই এখানে এসেছো। তুমি ভয় পাবে জেনেই তোমাকে আনতে চাইনি। কিন্তু যখন এসেই পড়েছো, দয়া করে গোলমাল করো না। আমি না আসা পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। গোগী…'

গোগী কাছে এসে দাঁড়ালো। বুঝলো তার প্রভু বলছেন এই দুর্বল মানুষটিকে তোর জিম্মায় রেখে গেলাম রে গোগী। কেউ যেন ওর অনিষ্ট না করে দেখিস বাবা!

সে ভারি খুশি হয়ে দীবার দিকে তাকালো। ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগলো। প্রভু এই মানুষটিকে বিশ্বাস করেন, পছন্দ করেন সুতরাং এ নিশ্চয়ই শত্রু নয়, বন্ধু। গোগীর ভয়াল হাসিতে যেন কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ ঝরতে লাগলো।

দীবাকে পেছনে রেখে কুয়াশা স্থির অবিচল ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। কেন যেন তার মনে হচ্ছিলো এই পথে কারো কারো যাতায়াত হয়েছে। তার এই ধারণা বদ্ধমূল হলো কিছুদূর এগোতেই। দেখলো একটি কম্পমান ছায়া পথের শেষ প্রান্তে টর্চের আলো ফেলে এদিকে আসছে।

মুহূর্তে কুয়াশা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলো। সেই কম্পমান ছায়া ক্রমে আরো কাছে এগিয়ে এলো। একেবারে কুয়াশার কাছাকাছি, তিন হাতের ভেতর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুয়াশা চিনলো লোকটিকে। নেসার আহমেদ। চিরকালের এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে চিনতে আর ভুল হবার কথা নয়। উত্তেজিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হচ্ছিলো আর দেরি না করে এই মুহূর্তে জীবনের চরম শত্রু এই নেসার আহমেদকে রিভলভারের একটি গুলিতে শেষ করে দেয়। বহু কষ্টে সে উত্তেজনা দমন করলো। এখনো নেসারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সময় আসেনি। সময় আসুক নেসার আহমেদের মুখোমুখি সে নিশ্চয় হবে। দম বন্ধ করে নেসার আহমেদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো সে।

নেসার আহমেদ থমকে দাঁড়িয়েছে। কি ভেবে সে চারপাশে তাকাতে লাগলো। সম্ভবতঃ সে ধরে নিলো কেউ কোথাও নেই। তাকে নিশ্চিন্ত মনে হলো। দেয়ালের গায়ে একটা পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেল। দেখা দিলো একটা আবছা সিঁড়ি পথ। সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল নেসার। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল দেয়ালের ফাঁকটুকু।

অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সম্মুখে। সঙ্কীর্ণ পথের বাঁক ঘুরতেই অপূর্ব এক সুরম্য মন্দির চোখে পড়লো। ক্ষুদ্রকায় এই মন্দিরটির সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় অলিন্দে অলিন্দে দামি পাথরের কারুকার্য। বড় বড় থাম। কুয়াশা বুঝলো এটিই সমাধি মন্দির। উত্তেজনায় তার সর্ব সত্তা জ্বলছিল। সে মন্দিরের ভেতর ঢুকলো।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। দেখলো শয়ন মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে, চূড়ায়, উঠোনের মর্মর মূর্তিতে বসানো রয়েছে ঝলকিত হীরা–মুক্তা–মাণিক্য। বড় বড় হীরা মুক্তা মাণিক্যের পাথর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে দ্যুতি। সেই দ্যুতির আলোয় শয়ন মন্দিরের সমগ্র প্রাঙ্গণ আলোকিত। আলোকিত হয়তো নয়। এক রকম লাল–নীল–সবুজ আলোর কোমলতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন।

কুয়াশা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো জানে না। তার হাতের কাছেই কুবেরের ঐশ্বর্য। রাজা আখতানুনের ধন–রত্নরাজি, যা নাকি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল জ্ঞানী চিকিৎসকের কাছে, যার জন্য জেবা ফারাহ্ প্রাণ দিয়েছে। না, এ সেই লুক্কায়িত ধন–রত্ন নয়। এইসব হীরা–মুক্তা–মাণিক্য শুধু সেই বিপুল ধন–রাজির একটা সামান্য আভাস মাত্র। শয়ন মন্দিরের মাটি খুঁড়তে হবে। কুড়ি ফুট মাটির নিচে রয়েছে সেই ঐশ্বর্য। আখতানুনের ঐশ্বর্য।

কুয়াশা এখনো পরিশ্রম ও সাধনার ফল পায়নি।

সে এগোলো। এক মুহূর্ত বুঝি কি ভাবলো। ডেকে আনবে নাকি দীবাকে, জেবা ফারাহ্‌র বোন দীবা ফারাহ্‌কে? দীবা দাঁড়িয়ে আছে সপ্তম দেয়ালের বাইরে। চকিতে আর একটা কথা ভাবলো কুয়াশা। তীক্ষ্ণ বাণের মতো কথাটা বিদ্ধ হয়ে আছে এতক্ষণ। না, দীবাকে সে সন্দেহ করে না। সে ভাবছে নক্সাটার কথা। যে নক্সা তার অধিকারে আছে, যে নক্সার নির্দেশানুযায়ী এতদিন কাজ করেছে, কই সে নক্সার পথ ধরে ঈপ্সিত এই শয়ন মন্দিরে আসার পথ তো সে পায়নি। দুর্ঘটনা কিংবা আকস্মিকতা তাকে এই গুপ্ত পথটির সন্ধান দিয়েছে। সে কৌতূহলী হয়েছিল বলেই এখানে আসতে পেরেছে। ভ গ্য তার প্রতি সদয় বলেই এই শয়ন মন্দিরের গুপ্ত কক্ষে সে পদার্পণ করতে পেরেছে। কিন্তু যদি আকস্মিক এই ঘটনা না ঘটতো?

দাঁতে দাঁত ঘষলো কুয়াশা। তার কপালে ঘামের চিহ্ন ফুটে উঠলো। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। নেসার আহমেদ, 'তুমি যতো বড় ধুরন্ধরই হও না কেন—আমার হাতে তোমার রক্ষা নাই।' ফিস্ ফিস্ করে কুয়াশা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বললো। তার নিজের নক্সাটা ভুল, আর তার প্রতিপক্ষ নেসার আহমেদ ঠিক নক্সা ধরে ঠিক পথে এগিয়ে এসেছে ভাবতে গিয়ে কুয়াশা ঘৃণায়, ক্রোধে আর হিংসায় ভেতরে ভেতরে আচ্ছন্ন, উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো শয়ন মন্দিরের দিকে। না দীবাকে সে ডাকবে না। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। গুরুত্বপূর্ণ। নেসার আহমেদ ও তার দলবল সন্ধান জেনেছে এই গুহার, এই ধন-রাজির। একটু ভুল করলে রক্ষা নেই। রাজা আখতানুনের পিতামহের সঙ্গে মৃত্যুর রাজত্বে কাটাতে হবে তাকে।

সে হাসলো। তার অস্তিত্বের চারদিকে হাজার হাজার বছরের স্মৃতি। আচ্ছন্ন আলো। আলো। প্রেতাত্মা ও নেসার আহমেদের জিঘাংসার ভ্রূকুটি।

এবারে আর ভুল করলো না কুয়াশা। পিরামিড-তত্ত্ব সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান। সে প্রতিটি পাথরের ইতিহাস বলতে পারে। প্রতিটি স্তম্ভের নির্মাণ রহস্য জানে। ফেরাউনদের শক্তি-মত্ত মনটির পরিচয় তার কাছে পরিস্ফুট। প্রথমে সে শয়ন মন্দিরের দিক নির্ণয় করলো দিকদর্শন যন্ত্রটি দিয়ে। চিরকাল মিশরের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য নীল-নদ। নীল-নদ এই দেশের পবিত্র মাতৃ জঠর। আবহমান কাল থেকে নীল-নদের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ দিগন্ত মিশরবাসীদের কাছে পূজ্য। শয়ন মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্ত বেছে নিলো কুয়াশা। দক্ষিণ প্রান্তের দেয়ালের বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। অনেক ক'টা বিচিত্র পাথর একত্রিত করে সেই দেয়াল নির্মিত। এক একটি পাথরের এক এক রকম রঙ। দেয়ালের মাঝখানে একটি প্রশস্ত ও মসৃণ মেজেন্টা রঙের পাথর। একটার পর

একটা পাথর পরীক্ষা করলো কুয়াশা। মেজেন্টা রঙের পাথরে হাত দিতেই পাথরটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে লাগলো। কিন্তু খুব ধীর গতিতে। একটু একটু পাথরটি সরতে লাগলো। ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি গুহা মুখ। পাথরটি স্থান-চ্যুত করার অনুরূপ ব্যবস্থা দেয়ালের ভেতর দিকেও রয়েছে। কুয়াশা পাথরটির গতির ভারসাম্য রক্ষা করে দেয়ালের ভেতর দিয়ে গুহা মুখে পৌঁছলো। গুহা ধরে নেমে গেল নিচে।

নিচে নেমেই ভয়ে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো কুয়াশা। সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে রাজা এ্যামন হোটাপ। স্থির, অবিচল, নিষ্ঠুর মূর্তি।

আট

মি. সিম্পসন বন্দী অবস্থায় নেসার আহমেদের দুই নম্বর আড্ডায় দিন কাটাচ্ছিলেন। নেসার আহমেদের দুই নম্বর আড্ডা মরুভূমির নিচে, একটা শিলাময় পাথুরে গুহার ভেতর। তাঁকে রাখা হয়েছিল ছোটো একটা ঘরে। কোরবান আলীর হুকুম ছিলো তাকে সর্বদাই হাত পা বেঁধে রাখার। তিন দিনের ভেতর এক মুহূর্তের জন্যে এই হুকুমের এদিক ওদিক হয়নি। মি. সিম্পসন বন্দী হওয়াতে যতো না বিমর্ষ হয়েছিলেন, অপমানের জ্বালায় তার চেয়ে বেশি হয়েছিলেন যন্ত্রণাহত। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বনামধন্য গোয়েন্দা সিম্পসন মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু চালের সামান্য একটা ভুলে তাকে বন্দী হতে হলো, আর বন্দী হয়ে এমন অসহায় অপমানকর জীবন যাপন করতে হচ্ছে—এই যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক আর গ্লানিকর। মি. সিম্পসনের চেহারায় এই কদিন বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটে অসংখ্য বলি রেখা ফুটে উঠেছে। চোখ দুটি উন্মাদের মতো সর্বদা জ্বলছে। হাত পা শৃঙ্খলাবদ্ধ। সিম্পসন সর্বক্ষণ একটা কোনো উপায় খুঁজছেন এই বন্দীশালা থেকে মুক্ত হবার। একটা কোনো সূত্র খুঁজছেন জেবা ফারাহ্‌র হত্যাকারী নেসার আহমেদকে সমুচিত শিক্ষা দানের। কিন্তু তার সব চেষ্টা নিস্ফল। সব চিন্তা অসহায়।

মি. সিম্পসন নিস্ফল আক্রোশে গুহার আবছা অন্ধকার ও অসহায় বন্দীত্ব সহ্য করেন। তাঁর ঘরের সামনে রাখা হয়েছে কোরবান আলীর জনৈক বিশ্বস্ত চেলাকে। সে প্রতিক্ষণ সজাগ হয়ে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একবার মি. সিম্পসন আকারে ইঙ্গিতে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রহরীটা শুধু হেসেছে আর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছে মি. সিম্পসনের দিকে। মি. সিম্পসন বলছেন, 'তুমি তাকিয়ে কি দেখছো?'

'আপনাকে দেখছি। আপনি বাঁচতে চান, না?'

'আমি নেসার আহমেদকে ধরতে চাই। সে একটা খুনে ডাকাত। তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমার সরকার তোমাকে অনেক টাকা দেবেন।'

'নেসার আহমেদ যদি খুনে ডাকাত হয় তাহলে আমি আর সাধু হলাম কিসে সাহেব?'

প্রহরীটা হাসে। বলে, 'ওসব লোভ দেখাবেন না আমাকে। লাভ হবে না কিছু।'

মি. সিম্পসন মনে মনে অশিক্ষিত, ভয়ঙ্করদর্শন প্রহরীর প্রশংসা না করে পারেন না। ন্যায়ের পথ আছে ডাকাতেরও আছে ধর্ম। এই প্রহরী তার স্বধর্ম রক্ষা করছে। নেসার আহমেদ লোকটা ভাগ্যবান।

তিনি আর কিছু বলেন না। প্রহরী নিঃশব্দে দরজার দিকে চলে যায়। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সিম্পসনের ঘুম ভাঙে, সময় কাটে। বন্দী দশায় ক'দিন গেল এই হিসাবও তার মনে নেই। একদিন দরজার গোড়ায় উচ্চকণ্ঠে হাসি শোনা গেল। সচকিত হলেন মি. সিম্পসন। ভেতরে ঢুকলো নেসার আহমেদ! মদে চুর। একটি যুবতী মেয়ের কোমরে হাত দিয়ে টলতে টলতে ঢুকলো। পেছনে কোরবান।

মি. সিম্পসনের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠলো।

'ব্রাদার সিম্পসন!'

মদে চুর নেসার আহমেদ উদারতায় বিগলিত। 'তোমার প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার আমরা করছি তার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। কি বলো কোরবান?'

কোরবান আলী সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানায়।

'সুতরাং আমরা ঠিক করেছি বেশিদিন তোমরা আমাকে, কি বলে, আমরা তোমাকে এভাবে কষ্ট দেবো না। হ্যাঁ কষ্ট দেবো না।'

নেসার আহমেদ মমতায় বিগলিত হয়ে যুবতী মেয়েটিকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আরো কাছে আকর্ষণ করলো। অত্যন্ত চটুল দেখতে মেয়েটা প্রথমে ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। পরে নেসার আহমেদের নির্দয় আলিঙ্গনের ভেতর খসখসে চাপা গলায় হেসে উঠলো।

'তুমি এখন পাশের ঘরে যাও চম্পা।' নেসার আহমেদ আলিঙ্গন থেকে মেয়েটিকে মুক্ত করে দিয়ে বিড়বিড় করলো। বললো, 'আমি এখন ব্রাদার সিম্পসনের সঙ্গে কথা বলবো।'

চম্পা নামধারী মেয়েটা চলে গেল।

'নাউ ব্রাদার সিম্পসন--

নেসার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ালো সিম্পসনের। বললো, 'আমি ঠিক করেছি তোমাকে আর দু'দিন বাদে মুক্তি দেবো।'

মি. সিম্পসন এই কথার অর্থ ভালো করেই জানেন। তিনি শুধু বললেন, 'তুমি যাই করো নেসার, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

নেসার হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'তুমি লোকটা বেশ বুদ্ধিমান সিম্পসন। তবে ঐদিন আমাকে ধরতে গিয়ে যে বোকামী করেছো তার তুলনা হয় না। তোমার গাধামি আর বুদ্ধি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। আমি ঠিক করেছি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'

মি. সিম্পসন শুধু তাকিয়ে রইলেন। নেসার আহমেদ হাসতে লাগলো। বললো, 'মর্যাদার সঙ্গে কেন বললাম জানো? সাধারণ মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে তোমারটা তফাৎ থাকবে। তোমাকে প্রথম ছেড়ে দেয়া হবে আমার শিকারী কুকুরগুলোর ভেতর। কুকুরগুলোকে ট্রেনিং দেয়া আছে। ইশারা করলেই তারা তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তোমার পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হবে। হাতের বাঁধন অবশ্য ঠিকই থাকবে। তবে তোমার কোনো অমর্যাদা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি শিকারী কুকুরগুলো তোমাকে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবার আগেই তোমাকে সরিয়ে ফেলা হবে। এরপর তোমাকে এক জালা লবণাক্ত গরম পানির ভেতর রাখা হবে। তারপর...'

নেসার আহমেদ হাসতে লাগলো। বললো, 'খুবই দুঃখের বিষয় যে, তোমার মুক্তি দু'দিন পিছিয়ে দিতে হবে। এর কারণ কি জানো? কারণ হচ্ছে আমার প্রভুভক্ত শিষ্য কোরবান আলীর প্রার্থনা। দু'দিন 'পর আমার জন্মদিন। কোরবান আলী প্রার্থনা জানিয়েছে ঐদিন যেন তোমাকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

একটা ঢেকুর উঠলো নেসার আহমেদের। পাশ ফিরে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'সিম্পসন সাহেব, আমার এখানকার কাজ প্রায় শেষ। আর সপ্তাহ খানেকের ভেতর আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। দুঃখ রইলো দেশে ফিরে গিয়ে তোমার মতো বন্ধুর দেখা পাবো না। হাঃ, হাঃ।'

সিম্পসন সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তোমারও দিন ফুরিয়েছে!'

কোরবান আলী উত্তেজিত হয়ে চাবুকে হাত দিলো। তার একটা মাত্র চোখ ধিকি ধিকি আগুনে জ্বলছে। নেসার আহমেদ তাকে বাধা দিলো। বললো, 'যেতে দাও কোরবান। সাহেব গোসা হয়েছেন। কিন্তু সাহেব, এই কথাটা বুঝলেন না যে তিনি আমাদের ধরতে পারলে আমাদেরও সোজা শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন!'

নেসার আহমেদ হাসতে লাগলো।

*

দীবা হাতের রিস্টওয়াচ দেখলো। কুয়াশা গেছে আড়াই ঘন্টারও ওপর। আর অপেক্ষা করা ঠিক না। সে গোগীর দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব জানার চেষ্টা করলো। গোগী উঁচু একটা পাথরের উপর গম্ভীর হয়ে বসেছে। ভাঁটার মতো চোখ জোড়া নিরতিশয় চিন্তিত।

দীবা ডাকলো। 'গোগী।'

গোগী অভ্যাস বশে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বসে পড়লো। ভাবখানা, তুমি ডাকাডাকি করছো কেন? আমি তোমার চাকর? এই আমি বসলাম। সাহেব না আসা পর্যন্ত উঠবো না। যা খুশি মনে করতে পারো।

দীবা আবার ডাকলো, 'গোগী।'

এইবারও প্রথমটায় গোগী চঞ্চল হয়ে উঠলো। দীবার ডাকের ভেতর আদেশের সুর ছিলো। সেই সঙ্গে ছিলো স্নেহ ও আদরের স্পর্শ। সে আদেশ প্রতিপালন করার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো সেই গম্ভীর, সম্মোহনকারী আদেশ তো এ নয়। গোগী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীবা হাত দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলো। ইঙ্গিত করলো। একটু ইতস্ততঃ করে গোগী দীবার বশ মানলো। সে দেখেছে সাহেব দীবার বন্ধু লোক। তার সঙ্গে কথা বলার সময় সাহেব কখনো গুলি ছোঁড়াছুড়ি করেন না। কখনো রাগ হয়ে হাত পা ছোঁড়েন না। বরং হাসি মুখে কথা বলেন। গোগী ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে গেল।

অন্ধকার সুড়ঙ্গে পথ চলতে গিয়ে বার বার হোঁচোট খেলো দীবা। সঙ্কীর্ণ দেয়ালের নিচে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে মাথা ঠুকে যায়। দেয়ালের কন্দরে কন্দরে লুকিয়ে আছে জিঘাংসার নানা অভিসন্ধি। কিন্তু কিছুই তাকে টেনে রাখতে পারছিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে পথ চলছিল। জেবা ফারাহর লোভের ধিকিধিকি আগুন যেন দীবার মনেও সংক্রামিত হয়েছে। অন্ধকার মৃত্যুগহ্বরে হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত ধন-রত্ন যেন দীবারও চাই। পিরামিডের নিচে এসে সব সে ভুলে গেছে। একটা মাত্র উদ্দেশ্য তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। মমি, রাজার ধন। নর্তকী জেবা ফারাহ্র রক্ত যেন দীবার শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

অবশেষে সুড়ঙ্গ পথ এসে একটা প্রাচীরে শেষ হয়ে গেল। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দীবা। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না।

কতক্ষণ এভাবে গেল সে জানে না। এক সময় দেখলো, পিছনে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোগী। দীবা সচকিত হয়। সামনে এগিয়ে যায়। হঠাৎ কান পেতে শুনলো প্রাচীরের পাথরে পাথরে একটা ক্ষীণ শব্দের তরঙ্গ বেজে উঠছে। শিউরে উঠলো

দীবা। অপেক্ষা করলো একটা ভয়ানক কিছুর জন্য। কিন্তু কিছুতেই ঘটলো না ভয়ঙ্কর কিছু। শব্দ তরঙ্গ থেমে গেল একটু পরেই। অন্ধকার পিরামিডের তলায় দীবা দাঁড়িয়ে রইলো কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে।

'গোগী...

দীবা যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য অসহায় ভাবে গোগীর সহযোগিতা কামনা করলো। কিন্তু ডাক শুনে গোগী একটু চঞ্চল হলো মাত্র। তার ভাঁটার মতো দুটি জ্বলন্ত চোখে উত্তেজনা ফুটলো। তারপর সময় তেমনি কাটতে লাগলো। পিরামিডের পাথর অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীবা পাথরে হাত রাখলো। মাথা রাখলো। যেন এই ভয়ঙ্কর, অচল প্রাচীরের কাছে সে আত্মসমর্পণ করলো। কতক্ষণ সে চোখ বুজে এইভাবে ছিলো জানে না। এক সময় ক্লান্ত চোখ নিয়ে তাকালো। পাশ ফিরলো। হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলো। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিলো নিজকে। দেখলো বাঁ পাশে একটি সোনালি রঙের সিংহ মূর্তি। সেই মূর্তির পেছন দিকে রয়েছে ভেতরে যাবার সঙ্কীর্ণ পথ। যেন মুহূর্তে হারানো জীবন ফিরে পেলো দীবা। এগিয়ে গেল সে। সঙ্কীর্ণ পথে পা দিলো। হঠাৎ কি হলো সে জানে না। প্রথমে হোঁচট খেলো, পরে গড়িয়ে পড়লো সিঁড়ি বেয়ে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় একটা অসহ্য ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পিরামিডের গভীর অন্ধকার তার চারদিকে ঘনিয়ে উঠলো। দীবা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন নিজের চোখকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না। দেখলো পরম বন্ধুর মতো তার শিয়রে বসে আছে কুয়াশা। সে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো। কুয়াশা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিলো। ইঙ্গিতে নিষেধ করলো। হাত দিয়ে পাশের একটি অলিন্দ দেখিয়ে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করলো। দীবা সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছিল। কিন্তু শারীরিক পীড়ার কথা তার এই মুহূর্তে মনে রইলো না। সে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

রকমারি রঙিন আলোর ছটা এসে পড়েছে একটু দূরে। চারদিকে পাথর, উঁচু স্তম্ভ ও দেয়াল। মাঝখানটা ফাঁকা। রঙিন আলোর ছটায় সেই স্থানটা স্বল্পালোকিত। দীবা দেখলো সেই স্বল্পালোকিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। কাঁধে একটা বিড়াল। রাজ পোশাক পরিহিত সেই লোকটার নাসিকা তীক্ষ্ণ। চোয়ালের গঠন নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় বহন করে। লোকটার অভিব্যক্তিতে একটা অতিকায় হিংস্র হাসি ফুটে আছে।

কুয়াশা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো বুঝি সুমুখের স্বল্পালোকিত স্থানে এখনই কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটবে। হলোও তাই। বিপরীত মুখের অন্ধকার প্রাচীর থেকে মশাল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এলো। লোকটা দীর্ঘ

বলিষ্ঠ। এগিয়ে এসে রাজ পোশাক পরিহিত লোকটার সামনে দাঁড়ালো। মশালটা উঁচিয়ে ধরলো মুখের সামনে। তারপর প্রচণ্ড অট্টহাস্য করে উঠলো।

বললো, 'রাজা অ্যামন হোটাপ! মরে গিয়েও তোমার স্বস্তি নেই। যক্ষ হয়ে রাজ-কোষ পাহারা দিচ্ছো। কিন্তু এবারে আমি তোমাকে মুক্তি দেবো দোস্ত। আর মাত্র তিন দিন অপেক্ষা করো।'

একটা গুমোট নির্জনতা থমথম করে উঠলো। মশালের লাল ছায়া দেয়ালে দেয়ালে সাপের জিহ্বার মতো লক লক করে উঠলো। লোকটা মশাল নামিয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবলো। তারপর পাশের আর একটা অন্ধকার প্রাচীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। দীবা তাকালো কুয়াশার দিকে। কুয়াশা দীবার মাথায় হাত রাখলো। একটু হাসলো। বললো, 'দীবা, তুমি আমি দুজনেই দৈব দুর্বিপাকে এখানে এসে পড়েছি। সামনে মন্দিরটি দেখছো? রাজা অ্যামন হোটাপের মন্দির। তোমার বোন জেবাহ ফারাহ্ যে ধন-রত্নের জন্য আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছে, সেই ধন-রত্ন পোঁতা রয়েছে ঐ মন্দিরে।'

একটু থামলো কুয়াশা। বললো, 'ঐ যে স্তব্ধ রাজমূর্তিকে দেখছো, সেই রাজমূর্তি রাজা আখতানুনের পিতামহ রাজা অ্যামন হোটাপের। মন্দির থেকে এই গুহায় ঢুকে আমি ঐ নিষ্ঠুর অবিচল মূর্তিটা দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম।'

একটু হাসলো কুয়াশা। বললো, 'অল্পের জন্য আমরা বেঁচে গেছি দীবা। আমি উন্মাদের মতো ধন-রত্ন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে একটা ভারি বস্তু ওপর থেকে নিচে এসে পড়লো। আমি চেতনা ফিরে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি তুমি। তোমাকে ধরে তুলতেই আবার বিপদ সঙ্কেত। দেখলাম গুহার প্রবেশ মুখের পাথর ধীরে ধীরে নড়ছে। বুঝলাম বিপদ আসন্ন। তাড়াতাড়ি সরে এসেছি প্রাচীরের এই প্রান্তে।'

দীবা আস্তে আস্তে বললো, 'ঐ লোকটি কে? রাজা অ্যামন হোটাপের প্রেতাত্মা?'

সশব্দে হেসে উঠলো কুয়াশা। বললো, 'না, জেবা ফারাহ্‌র হত্যাকারী নেসার আহমেদ। বর্তমানে কুয়াশার এক নম্বরের শত্রু।' দীবা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। জেবার হত্যাকারীর প্রতি তার যে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতকাল মনে চাপা ছিলো সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ তার চোখে মুখে হিংস্র হয়ে উঠলো। সে উঠে দাঁড়াতে চাইলো। কুয়াশা বুঝলো সবই। সে শুধু সস্নেহে দীবাকে ধরে রাখলো। হাঁপাতে হাঁপাতে দীবা বললো, 'ঐ খুনে শয়তানকে আমিও এতকাল খুঁজেছি কুয়াশা। আমার হাতে ওর নিস্তার নেই।'

কুয়াশা বললো, 'তুমি বিশ্রাম করো দীবা। তুমি অসুস্থ। জেবার হত্যাকারী নেসার আহমেদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য কুয়াশাই যথেষ্ট। তুমি...'

বলতে বলতে কুয়াশার চোখ-মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে

বললো, 'তুমি এ কাজের উপযুক্ত নও। তোমাকে আমি মুজাদ্দিদ করীমের জীবনে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।'

দীবা তাকিয়ে রইলো কুয়াশার দিকে। কুয়াশা আর কথা বললো না। সস্নেহে দীবার মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। ক্লান্ত কণ্ঠে দীবা বললো, 'আমরা ফিরে যেতে পারবো?'

কুয়াশা হাসলো, বললো, 'পারবো। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তুমি এখানে বিশ্রাম করো। আমি গোগীর খোঁজ করছি।'

'কিন্তু...'

কুয়াশা বললো, 'ভয় নেই দীবা। পিরামিডের রহস্য এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

সে হাসলো, বললো, 'আমি পিরামিডের অতল রহস্যের সঙ্গে আরো কিছু রহস্য যোগ করবো। নেসার আহমেদ অন্ততঃ জানবে রাজা অ্যামন হোটাপ যক্ষ হলেও প্রতিশোধ নিতে জানেন। তুমি আমাকে সাহায্য করবে না দীবা?'

দীবা চুপ করে রইলো। কুয়াশা এক মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে পা বাড়ালো। গোগীকে এই শিলা গুহার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে হবে। আপাততঃ এই তার প্রধান কর্তব্য।

তখন অনেক রাত। দেয়ালে হেলান দিয়ে মি. সিম্পসন কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শে তিনি জেগে উঠলেন। তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। দেখলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেসার আহমেদের বিলাস সঙ্গিনী চম্পা। মি. সিম্পসন চোখ খুলতেই সে ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে কথা বলতে নিষেধ করলো। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সে মি. সিম্পসনের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। একখণ্ড কাগজ তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলো। সবিস্ময়ে দেখলেন কাগজটি মিশর সরকারের রাজকীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচয় পত্র। লেখা আছে মিস নাফিসা আইভরি, গামাল হোসেনের ত্রয়োদশ সহকারী। মি. সিম্পসন সম্মান সূচক মাথা নোয়ালেন। নাফিসা আইভরি চাপা গলায় পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো, 'এই চোরা কুঠুরীর একটি মাত্র লোক বাদে সবাই মাতাল হয়ে আছে। আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি পালান।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'লোকটি কে, কোরবান আলী?'

'না।'

নাফিসা আইভরি কানের কাছে মুখ আনলো। বললো, 'আপনার ঘরের দরজায়

যাকে রাখা হয়েছে সেই প্রহরী। আমি চোরা পথে লুকিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু এই গুহা থেকে বেরোতে হলে সুমুখের পথ দিয়ে যেতে হবে। আর ঐ পথের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আপনার প্রহরী।'

নাফিসা আইভরি একটা ছোট্ট এ্যাসট্রা পয়েন্ট টু ফাইভ পিস্তল গুঁজে দিলো মি. সিম্পসনের হাতে। বললো, 'পুরো ছ'টা বুলেট ভরে রেখেছি। আর দেরি করবেন না। পালান।'

'তুমি?'

'আমি?'

নাফিসা আইভরি একটু হাসলো, 'নেসার আহমেদের কাজ শেষ হয়নি। আমার কর্তব্যও বাকি আছে যদি বেঁচে থাকি যথাসময় আমাদের দেখা হবে।'

মি. সিম্পসন কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকান আইভরির দিকে। আইভরি তার হাত বাড়িয়ে দিলো। মি. সিম্পসন করমর্দন করলেন। চাপা গলায় আইভরি বললো, 'আমাকে অনুসরণ করুন।'

মি. সিম্পসন অন্ধকার ঘর থেকে আইভরির পিছু পিছু বাইরে এলেন। দেখলেন বারান্দায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রহরী আদিল শেখ। মোড় ফেরার উপক্রম করতেই আইভরির ইঙ্গিতে মি. সিম্পসন দেয়ালের পাশে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু ততক্ষণে প্রহরী আদিল শেখ আইভরিকে দেখতে পেয়েছে।

আদিল শেখ রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। অবাক হয়ে বললো, 'তুমি এখানে কেন?'

নাফিসা বললো, 'মাঝ রাতে সবাই মাতাল। তাই আমি বেরিয়ে এসেছি।'

'বেরিয়ে এসেছো কেন?'

'তোমার কাছে। আমি জানি মদ তোমাকে মাতাল করতে পারে না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার কাছে আমি ধরা দেবার জন্য এসেছি আদিল শেখ।'

আদিল সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'তোমাকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি নাফিসা। তোমার আসল মতলব কি খুলে বলো।'

'তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমার কাছে এসেছি।' কাতর গলায় নাফিসা বলে।

হেসে ওঠে আদিল। বলে, 'কিন্তু তুমি যাই বলো, তোমাকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করি না। আমার প্রভু নেসার আহমেদ যখন উপভোগের জন্য তোমাকে কায়রোর হাটেস থেকে সংগ্রহ করেন তখনই আমার মন বলছিল প্রভু একটা ভুল করেছেন। আমার সন্দেহ যে সত্যি তাতে আর ভুল নেই। নড়াচড়া করবার চেষ্টা করো না নাফিসা। আমি তোমাকে বন্দী করলাম।'

আদিল এগিয়ে গেল নাফিসার দিকে। হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এসে আদিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিম্পসন। আদিলের কণ্ঠনালী সজোরে চেপে ধরলেন। দারুণ বিস্ময়ের ঝোঁক কাটাবার আগেই অন্ধকার হয়ে এলো আদিলের পৃথিবী। তার প্রাণহীন দেহ মেঝেয় পড়ে গেল।

মি. সিম্পসন শুধু এক মুহূর্তে নেসার আহমেদের বিশ্বাসী ভৃত্য হতভাগ্য আদিলের দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর দুঃখ লাগছিল। কিন্তু ভাবালুতায় সময় নষ্ট করবার বিপদ তিনি জানেন। আর দেরি না করে তিনি এগিয়ে যান। নাফিসাকে অনুসরণ করে তিনি গুহামুখে এলেন। নাফিসা বললো, 'তাহলে বিদায়, সিম্পসন।'

'গুডবাই কাইণ্ড লেডি!'

মি. সিম্পসন মাথা নোয়ালেন।

অতর্কিতে একটি অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়লো। কোরবান আলীর নিষ্ঠুর মূর্তি দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে। চকিতে একটা তীক্ষ্ণ একফলা ছুরি গিয়ে বিঁধলো নাফিসার বুকে। তীব্র চিৎকারে লুটিয়ে পড়লো নাফিসা। মি. সিম্পসন ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে কোরবান আলীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন।

গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ভয়ঙ্কর অট্টহাসি শোনা গেল কোরবান আলীর।

'ইতর টিকটিকি, আমার হাতে আজ তোর রক্ষা নেই।'

নাফিসা কাতর কণ্ঠে বললো, 'মি. সিম্পসন, এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান। এখনো সময় আছে মি. সিম্পসন…প্লিজ, প্লিজ…'

কিন্তু মি. সিম্পসন নাফিসার মৃতদেহ পেছনে রেখে কিছুতেই যাবেন না। তার চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। দেয়ালের এপাশে সরে এসে তিনি পর পর দুটো গুলি ছুঁড়লেন। ভেতর থেকে কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। কেউ আহত হয়েছে। সোরগোল পড়ে গেছে গুহায়। বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠলো। আর দেরি করলেন না মি. সিম্পসন। নাফিসার দেহ কাঁধে তুলে অন্ধ বেগে ছুটে গেলেন গুহামুখে। গুহামুখ বন্ধ। দুজন প্রহরী ছুটে আসছে। মি. সিম্পসন আবার গুলি ছুঁড়লেন। গুলি খেয়ে একজন প্রহরী মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো। আর একজন দেয়ালের খাঁজে আত্মগোপন করলো।

প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে আরও কয়েকজন লোক। মি. সিম্পসন বুঝলেন আর যুদ্ধ করে ফল নেই। মৃত্যু এবারে অবধারিত। তার হাতের পিস্তলে আর মাত্র একটি গুলি আছে। রুদ্ধ গুহামুখে এক মুহূর্তের জন্য তিনি দাঁড়ালেন। তার কাঁধের উপর ছুরিকাবিদ্ধ মুমূর্ষু নাফিসা। রক্তে মি. সিম্পসনের জামা-কাপড় রঞ্জিত। শেষ চেষ্টায় তিনি গুহামুখের বিশালকায় পাথরে সর্বশক্তিতে ঠেলা দেন। গুহা মুখ তেমনি অচল, অনড় হয়ে রইলো।

অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় নাফিসা বললো, 'দেয়ালের ঐ বোতামে টিপ দিন মি. সিম্পসন। প্লিজ, দেরি করবেন না।'

মি. সিম্পসন তাই করলেন। অবশেষে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো সামনে। পেছনে ছুটে আসছে নিষ্ঠুর আততায়ীরা। মি. সিম্পসন গুহামুখ থেকে বেরিয়ে মরুভূমির ভেতর ছুটতে লাগলেন। অন্ধকার থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন আলোর পৃথিবীতে, মৃত্যু পার হয়ে এসেছেন জীবনে। আর ভয় নেই।

তিনি ছুটতে লাগলেন। আবছা অন্ধকার রাত্রিতে তিনি হারিয়ে গেলেন রহস্যময় মরুভূমির বুকে।

নয়

দীবা দাঁড়িয়েছিল কেবিনের বারান্দায়। নীল নদে ভাসমান লঞ্চটি সন্ধ্যার বাতাসে একটু একটু দুলছে। বহুদূরে দেখা যায় বালিয়াড়ির দিগন্ত। আকাশের দিকে তাকায় দীবা। আকাশটা যেন কোনো খেয়ালী শিল্পীর ক্যানভাস। নানা রঙে রঞ্জিত। দীবার মন চিন্তাকীর্ণ। সারাদিন সে শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছে, তার শরীর দুর্বল, অবসন্ন। কুয়াশা সেই যে ভোরবেলা বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। গোগীকেও নিয়ে যায়নি। শুধু তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা কাগজে গোটা কতক সই করিয়ে নিয়ে গেছে দীবাকে দিয়ে। পিরামিডের গোলক ধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার পর কুয়াশা কিছুতেই আগের মতো সহজ, স্বাভাবিক হয়নি। সর্বদাই তার চোখ দুটি জ্বলন্ত। মুখে উত্তেজনার রক্তিম রঙ। ভোর সকালে বেরোবার সময় দীবা দাঁড়িয়েছিল খোলা ডেকে। সে জিজ্ঞেস করছিল, 'কোথায় যাচ্ছো?'

কুয়াশার চোখ দুটি কৌতুকে ভরে উঠেছিল। বলেছিল, 'বর খুঁজতে।'

'কার জন্যে?'

কুয়াশা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। একটু হেসে বলেছিল, 'যা তা বর নয় দীবা। দামী বর। নাম শুনবে? মুজাদ্দিদ করীম।' দীবা কি একটা বলতে চেয়েছিল। বলতে পারেনি। কুয়াশা একটা দামি সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানছিল। আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। কুয়াশার এই রূপটি ভারি সুন্দর। দীবা দেখেছে সরোদ বাজাবার সময় কুয়াশার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে শিল্পীর গভীর তন্ময়তা। একটা আলোময় দ্যুতি খেলা করে মুখমণ্ডলে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই লোকটাই হিংস্র ডাকাত, ভয়ঙ্কর নর হত্যাকারী। জেবা ফারাহ্ সুদূর মিশরে বসেই বাংলাদেশের এই লোকটিকে এক নম্বরের শত্রু জ্ঞান করতো। খুনে ডাকাত নেসার আহমেদ এরই ভয়

কম্পিত। একই মানুষের দুটো চেহারা ভাবতে অবাক লাগে।

চুপচাপ সিগারেট টানছিল কুয়াশা আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। দীবা আস্তে আস্তে বলছিল, 'মুজাদ্দিদ করীমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে। লোকটা অদ্ভুত সুন্দর। আমার লোভ হয়—আমি যদি অমনি সুন্দর হতে পারতাম!'

কুয়াশা আর কিছু বলেনি। একবার তাকিয়েছিল দীবার দিকে। তখন আফ্রিকার ভয়ঙ্কর সুন্দর সূর্য পূর্ব আকাশে রক্তিম হয়ে উঠছে। বুনো পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। ডোঙ্গার মাঝি নীল নদে নৌকা ভাসিয়ে দিন আরম্ভ করেছে।

দীবার চোখের সামনে কুয়াশার দীর্ঘ, বলিষ্ঠ মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ খোলা ডেকে বসে দীবা ফিরে গিয়েছিল নিজের কেবিনে। তার শরীর দুর্বল, মন অবসন্ন। পিরামিডের রহস্যময় গোলক ধাঁধায় সে মৃত্যুর চেহারা স্পষ্ট দেখে এসেছে। উপলব্ধি করেছে সে যেন পুনর্জীবন নিয়ে ফিরে এলো। কিন্তু এই জীবন আবার কোন্ পথে মোড় নিতে যাচ্ছে?

দীবা সারাদিন কেবিনে শুয়ে বসে কাটিয়েছে। একবার শুধু গোগীকে দেখতে গিয়েছিল। গোগী ডেকের নিচে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ছিলো। গোগীকে দেখে মনে হচ্ছিলো শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার জন্যে সে খুব অপমানিত বোধ করছে। দীবাকে দেখে তার চোখ মুখ অভিমানে রীতিমত ভারি হয়ে উঠলো। সে একবার মাত্র দীবার দিকে চোখ তুলে তাকালো। ভাবখানা, দেখলে মেম সাহেব, আমাদের সাহেবের কাণ্ডটা? লোহার শিকল দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছেন, যেন আমি ছাড়া থাকলে পালিয়ে যেতাম! আরে, পালিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলে এই গোগীকে কেউ ফেরাতে পারতো? তেমন শক্তি কারো আছে?

দীবা গোগীকে দেখলো। ভয়ঙ্কর দর্শন গরিলা। কিন্তু কুয়াশার সম্মোহনে তার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। গোগীর ঝুলানো ঠোঁটে আর ঝিমানো চোখে অভিমানের ছায়া দেখে দীবা একটু না হেসে পারলো না। গোগী অমনি সচকিত হয়ে তাকালো। দীবার মনে হলো গোগী যেন বলতে চায়, দোহাই মেম সাহেব, সাহেবকে যেন সব কথা বলো না। আমার কথা ছেড়ে দাও। মুখ্য সুখ্য জীব। কি না কি বলছি ঠিক আছে? তাহলে মেম সাহেব, বলো না কিন্তু, হ্যাঁ? সাহেব রেগে গেলে আমার সঙ্গে যা মেজাজ দেখান, ভয়ে আমি বাঁচি না। না বাপু, আমি বরং এই রকম আর করবো না।

গোগীকে আদর জানিয়ে দীবা আবার কেবিনে ফিরে এসেছে। বলতে গেলে সারাদিন সে কিছু করেনি। অবচেতন মনে কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করছে। দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যাও যায় যায়। কোথায় কুয়াশা?

কুয়াশা ফিরলো গভীর রাতে। ক্লান্ত দীবা তখন জানালার পাশে বসে নির্জন রাত দেখছে। নীল–নদের হাওয়ার শব্দ শুনছে। কুয়াশা হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো। এ সেই কুয়াশা যে সরোদ বাজায়, যে ভোর সকালের উদ্ভাস দেখে তন্ময় হয়ে যায়।

দীবা বললো, 'এতক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হলো বুঝি?'—বলেই বুঝলো কথাটা বেমানান হয়েছে।

কুয়াশা প্রথমটায় বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সপ্রতিভ হলো পরমুহূর্তে। বললো, 'আমি জানতাম না তুমি রাত জেগে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। নিশ্চয়ই কষ্ট দিয়েছি খুব।'

দীবা কথা বললো না। কিন্তু মুজাদ্দিদ করীমের সংবাদ জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

কুয়াশা বললো, 'আজ আমার আনন্দের দিন দীবা। আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সাহায্য করবো। আমার চেষ্টা সফল হয়েছে। মুজাদ্দিদ করীম কোটিপতি ধনী আল গাফরানের কন্যা নাঈমার সঙ্গে বাগদত্তা ছিলেন। সব কথা বুঝিয়ে বলার পর তিনি আবার তোমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। মুজাদ্দিদ করীম এখন জানেন তুমি আর নিঃস্ব দীবা ফারাহ্ নও। এখন তোমার অনেক অর্থ। অনেক সম্মান ও প্রতিপত্তি। তিনি আনন্দের সঙ্গেই তোমাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।'

দীবা প্রথমটায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তে একটা আশঙ্কার খোঁচায় বিমূঢ় হলো। তাকিয়ে রইলো কুয়াশার দিকে। বললো, 'কিন্তু আমার অর্থ আছে, সম্মান আর প্রতিপত্তি আছে এসব তো মিথ্যে! তুমি মুজাদ্দিদ করীমকে যা সত্য নয় তা দিয়ে ভোলাতে গেলে কেন কুয়াশা?'

'মিথ্যে আমি বলিনি দীবা। এই নাও ব্যাঙ্কের চেক ও পাসবুক। তোমার নামে ব্যাঙ্ক অফ ঈজিপ্টে তিরিশ কোটি টাকা জমা হয়েছে। তুমি যাতে পিরামিডের অর্থ অপহরণের দায়ে না পড়ো তার ব্যবস্থাও আমি করে দিয়েছি। টাকাটা আমার হয়ে তোমাকে দিয়েছেন আমার এক মিশরীয় বন্ধু শেখ বোরহান।'

দীবার চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো। বুকের ভেতর উথলে উঠলো নাম না জানা এক আবেগ। সে বলতে চাইলো, না, না এ টাকা আমি চাই না। মিথ্যে পরিচয়ে আমি সুখী হতে পারবো না। কিন্তু কিছুতেই সে কোন কথা বলতে পারলো না। অপলক নেত্রে সে তাকিয়ে রইলো কুয়াশার দিকে। এতবড় দান কেন করতে গেল কুয়াশা। এতদিনে তার মনে হয় কুয়াশা নিষ্ঠুর কুয়াশা বিপজ্জনক।

কুয়াশা দীবার মনের ভাব টের পেলো না। সে পকেট থেকে একটা খাম বের করলো। বললো, 'আমাকে তোমার পুরস্কৃত করা উচিত দীবা। আমি মজাদ্দিদ করীমের

কাছ থেকে তোমার চিঠি বয়ে নিয়ে এসেছি। এই নাও।'

দীবা চিঠি হাতে নিলো। কুয়াশা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললো। বললো, 'ভোর রাতে তোমার যাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। সকাল সাতটার ভেতর মুজাদ্দিদ করীম কায়রোর ইম্পিরিয়াল হোটেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আশা করি তুমি প্রস্তুত।'

মাথা নাড়লো দীবা। বললো, 'হ্যাঁ আমি তৈরি।'

কুয়াশা এরপর কোনো দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

খামটা নিয়ে অনেক্ষণ দীবা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। খোলা বাতাসে তার মাথার চুল কাঁপছিল। অন্ধকার ও আলোর ছায়া কাঁপছিল চোখে মুখে। তার মনে পড়ছিল মুজাদ্দিদ করীমের সুন্দর মুখচ্ছবি। প্রথম যৌবন থেকে এই সুন্দর মুখচ্ছবি দীবার জীবনের স্বপ্ন। জেবা-ফারাহ্ যদি রাজকুমারী আয়িদার নক্সা চুরি না করতো তাহলে তার বাবা আত্মহত্যা করতেন না। তাদের জমিদারী ও প্রাসাদ বাজেয়াপ্ত হতো না। হয়তো এতদিন মুজাদ্দিদ করীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক মিলনের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতো। সেই স্বপ্ন এতকাল ছিলো দুঃস্বপ্ন। এতকাল বিরহের আগুনে দীবা দগ্ধ হয়েছে। জীবনে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল। এসবই ছিলো মুজাদ্দিদ করীমের জন্য। সুন্দর স্বপ্নের মতো সেই মুজাদ্দিদ আবার ফিরে এসেছে দীবার জীবনে। দীবার চেয়ে সুখী আর ভাগ্যবতী কে আছে?

দীবা খামটা খুললো। পরিচিত সুন্দর হস্তাক্ষরে মিশরীয় ভাষায় মুজাদ্দিদ করীম লিখেছেঃ

প্রিয়তমা,

নানা কারণে তোমার কাছ থেকে আমি দূরে সরে গিয়েছিলাম। আমাকে ভুল বুঝো না লক্ষ্মী মেয়ে। বিশ্বাস করো তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে বিরহের দাবানলে দগ্ধ হয়েছি। এখন আমাদের মিলনের আর কোনো বাধা নেই। আমি সাগ্রহে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তোমার অভিভাবক শ্রেণীর বাংলাদেশী ভদ্রলোকটি আগামীকল্য আমাদের বিবাহ উৎসবের আয়োজন করেছেন। ইম্পিরিয়াল হোটেলে বাঙালী ভদ্রলোকটির হয়ে তোমাকে আমার কাছে সম্প্রদান করবেন কায়রোর বিখ্যাত ধনপতি শেখ বোরহান সাহেব। শেখ বোরহানের সঙ্গে এ ব্যাপারে সব কথা আলোচিত হয়েছে। আমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত সুখী হতে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে হাজারো শোকর। দুঃখের বিষয় বাঙালী ভদ্রলোকটি আমাদের বিয়েতে নাকি থাকবেন না। যা-ই হোক ব্যবস্থা অনুযায়ী তুমি নিশ্চয়ই আগামীকল্য সকাল সাতটার আগে ইম্পিরিয়াল হোটেলে এসে পৌঁছবে। শেখ বোরহান-এর স্ত্রী কন্যাগণ সামাজিক উৎসবে যা যা করণীয় তা

করার জন্যে এবং তোমাকে গ্রহণ করার জন্যে আমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

আমার গভীর ভালবাসা জেনো।

ইতি —

তোমারই একান্তভাবে

মুজাদ্দিদ করীম।

দীবা কেবিনের জানালার পাশে বসে রইলো। ঘটনাচক্রে সে একজন অদ্ভুত স্বভাবের লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। কাল থেকে সেই লোকটির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবলো তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে কুয়াশা নিশ্চয়ই খুশি। হ্যাঁ, খুশি হবারই কথা। দীবা কুয়াশার জীবনে এসেছিল কর্তব্যের বোঝা হয়ে। ঘটনাচক্রের দায় হয়ে। কাল থেকে কুয়াশা কর্তব্য ও দায় থেকে মুক্ত। এবারে সে নিশ্চিন্তে নেমে যাবে তার কাজে। পিরামিডের অতল রহস্যের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কুয়াশার বুকে জ্বলবে হত্যাকারীর জিঘাংসা। হাতের মুঠোয় থাকবে নিষ্ঠুর আক্রমণ। আর দুচোখ মেলে দেখবে সে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান সাধনার স্বপ্ন।

আশ্চর্য, দীবা ভাবলো। লোকটা কি অদ্ভুত। গুপ্তধনের লোভে সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছে রহস্য নগরী কায়রোতে। কিন্তু কুয়াশার লোভ কি শুধু ধন–রত্নেই? শুধু মণি–মানিক্য? একটি সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য কি তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি? প্রেম, ভালবাসার কণামাত্র অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়ে দিতে পারেনি?

সম্ভবতঃ পারেনি। দীবার চোখ ভুল করে না। কুয়াশাকে সে চিনেছে। কুয়াশা সেই প্রকৃতির পুরুষ, যার ভালবাসা গভীর সমুদ্রের মতো। যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নির্জন, শান্ত। যখন জেগে ওঠে তখন প্রলয়ের মতো ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ভয়ঙ্কর। যুগে যুগে নারীদের কাছে এই ভালবাসাই আকাঙ্ক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু দীবার দুর্ভাগ্য যে সে কুয়াশার সাগর মনে এতটুকু দোলা জাগাতে পারলো না।

টপ টপ করে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দীবার চোখ থেকে। দীবা সচকিত হলো। চোখ মুছে হাসলো। আশ্চর্য, সে কি তবে এতদিন কুয়াশার ভালবাসার জন্য উন্মুখ ছিলো? কারো জন্যে বেদনার অনুভব, কাউকে জীবন দিয়ে সুখী করার অন্তর, সুখ ও আনন্দ বিসর্জন দিয়ে কাউকে চাওয়ার নামই কি ভালবাসা? আশ্চর্য! দীবা ভাবলো। এতদিন এই বেদনা, এই সুখ, এই মর্মমথিত দীর্ঘশ্বাস কোথায় ছিলো।

দীবা নিঃশব্দে বাইরে এলো। আকাশে অসংখ্য তারা। বাতাস বইছে। ঘুমন্ত পৃথিবী।

হঠাৎ রাতের নির্জনতা ভরে উঠলো সরোদের কান্নায়। কুয়াশা সরোদ বাজাচ্ছে। দীবা সঙ্গীতের ধর্ম বোঝে না। কিন্তু সরোদের বাজনা শুনে তার মনে হলো যে কথা

বলার উপায় নেই, যে কথা কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় তা সঙ্গীতের ভাষা।

তার ইচ্ছে করলো কুয়াশার কাছে গিয়ে বসে। বসে কুয়াশার তন্ময়, সুন্দর চোখ দুটি দেখে। কিন্তু ইচ্ছে সে দমন করলো। সম্পর্কের সূত্র বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত পোহালেই দীবা চলে যাবে বহুদূরে। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে একটি নতুন জীবন।

সে ভাবলো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে। ঘুমোবার জন্য সে ঘরে গেল। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলো কিন্তু ঘুম এলো না। রাত ভরে গেছে সরোদের কান্নায়। সময় এগিয়ে আসছে বিদায় নেবার। সে আবার বাইরে এলো। দাঁড়িয়ে রইলো কেবিনের রেলিং ধরে।

একটা একটা করে আকাশের তারাগুলো নিভে আসছে! একটু একটু করে হাওয়ার বেগ বাড়ছে। দূরের মরুভূমি, পাহাড় আর কায়রো নগরীর আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত হারিয়ে যাওয়া কোনো অতীতের মতো লাগছে। দীবা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। মানুষের মন কি নির্দয় প্রতারক। এতকাল যার জন্যে দীবাস্বপ্ন দেখলো, কতক্ষণ আগেও কি দীবা জানতো সে একটা অর্থলোভী সুযোগ-সন্ধানী বই কিছু না? অর্থের লিপ্সায় দীবার সঙ্গে সে বাগদত্তা হয়েছিল অর্থই তাকে আবার তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। না, দীবা নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজে করতে ভীতা নয়। সে মুজাদ্দিদ করীমের কাছেই ফিরে যাবে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে সারা জীবন দিয়ে। এছাড়া করার তার আর কি রইলো?

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হলো। কখন যেন কুয়াশার সরোদ থেমে গেছে। দীবা কেবিনে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলো। চারদিকে আবছা, কোমল আলো। ঝির ঝির ঠাণ্ডা বাতাস। নদীর বুকে ঢেউ উঠেছে। ঢেউয়ের মাথায় চকিত শুভ্রতা। দীবা আকাশের দিকে তাকালো। একটি মাত্র তারা এখন আকাশে জ্বলছে। শুকতারা। কিছুক্ষণ বাদে এই তারাটিও দিনের প্রথম তাপে নিভে যাবে। হাতঘড়ি দেখলো সে। সাতটার দেরি কতো?

কুয়াশা বেরিয়ে এলো নিজের কেবিন থেকে। ছোট একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ সে তুলে দিলো দীবার হাতে। বললো, 'এতে প্রয়োজনীয় সব কিছু ভরে দিলাম।'

দীবা বললো, 'যাই এখন।'

কুয়াশা বললো, 'ঐ বাঁকটা ঘুরেই দেখবে তোমার জন্য আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। ড্রাইভারকে সব নির্দেশ দেয়া আছে। সে তোমাকে সোজা ইম্পিরিয়াল হোটেলে নিয়ে যাবে।'

দীবা বললো, 'চলি।'

কুয়াশা বললো, 'এসো।'

দীবার হাতে হ্যাণ্ড ব্যাগ। পরনে কুয়াশার উপহার দেয়া অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ। অল্প ঘোমটা উঠেছে মাথার ওড়নার। ফর্সা মুখে একটা ক্লান্ত অরুণাভা ফুটেছে। দীবাকে বিষণ্ণ অথচ সুন্দর দেখাচ্ছে।

দীবা আস্তে আস্তে চলে গেল। পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো কুয়াশা। যতক্ষণ দীবাকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। আশ্চর্য, দীবা একবারও পেছন ফিরলো না। নদীর তীর ধরে নতমুখে হেঁটে চলেছে। কিছুক্ষণ পর সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কুয়াশা আবার নিজের কেবিনে এলো। গতকাল থেকে কেন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করছিল সে। মহুয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যেমন লেগেছিল তেমনি। যাক, তাহলে দীবাও গেল। কুয়াশা এখন মুক্ত। কর্তব্য থেকে মুক্ত, দায় থেকে মুক্ত।

কুয়াশা সিগারেট ধরালো। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। সত্যি কি মুক্ত? বুকের ভিতর ফাঁকা শূন্যতাটুকু তবে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর কুয়াশা জানে না। জানার চেষ্টাও সে করলো না। কিন্তু কেন জানি নিজের অজান্তেই দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চোখ থেকে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে তাকিয়ে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল। বললো, 'তুমি?'

হ্যাণ্ড ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দীবা কান্নায় দুই হাতে মুখ ঢাকলো। বললো, 'আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কিছুতেই যাবো না। আমি ফিরে এসেছি।'

কুয়াশার চোখ দুটি সুন্দর এক নতুন পৃথিবী দেখলো।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দশ

তখন রাত দশটা! কায়রোর একটা নিষিদ্ধ অঞ্চলে লোক চলাচল শুরু হয়েছে! একজন দীর্ঘকায় মিশরী এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে জনৈকা রূপ জীবনীর দরজায় করাঘাত করলো। অনেকক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিলো এক বিগত যৌবনা রমণী। কর্কশ কণ্ঠে বললো। 'কি চাই?'

লোকটি হো হো করে হাসলো। বললো, 'যা সবাই চায়। তোমার ঘরে আসতে চাই।'

'এখন হবে না। ঘরে লোক আছে।' বলে রমণী লোকটি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো। দরজা বন্ধ করে সে অনেকক্ষণ এক ঠায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে না? ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে তার সহচরীকে ডেকে কানে কানে কি বললো। সহচরী মাথা নেড়ে বললো, 'আমি পারবো না বাপ। পারো

তো তুমি গিয়ে বলো।'

'আহা, না পারলে চলবে কেন? যদি তোর মানুষের বিপদ হয়, তখন?'

সহচরী কতক্ষণ কি ভাবলো। আস্তে আস্তে সে পা বাড়ালো ভেতরের দিকে। ভেতরের একটা ঘরে শুয়ে আছে আবদুল্লাহ হারুণ, তার প্রেমিক। আবদুল্লাহ হারুণ ভয়ানক মেজাজী মানুষ। মিশর সরকারের অধীনে সে কি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কাজের সূত্রেই আবদুল্লাহর সঙ্গে তার পরিচয়। সেই পরিচয় প্রেমে পৌছেছে। কিন্তু পরিচয় যতো গভীরই হোক, আবদুল্লাহ হারুণ তার কাছে প্রথম পরিচয়ের মতোই রহস্যময় থেকে গেছে। নিজের সত্যিকার পরিচয় সে কিছুতেই খুলে বলে না। প্রায়ই সে বলে তার পিছনে আততায়ী ঘুরছে! সাধারণতঃ এই রকম দুঃসময়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবার জন্য তার ঘরে সে আশ্রয় নেয়। আজও হয়তো বাইরের বিপদ থেকে গা বাঁচাবার জন্যই এখানে সে এসেছে।

সহচরী, নাম কুলসুম, আবদুল্লাহ হারুণের ঘরে ঢুকলো। তাকে সাবধান করে দেয়া দরকার। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। কোথায় আবদুল্লাহ হারুণ? পেছনের জানালা ভাঙা। বিছানা তছনছ।

কুলসুম ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।

আবদুল্লাহ হারুণও তখন চিৎকার করছিল। ভয়ে নয় উত্তেজনায়। তার হাত পা বাঁধা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেসার আহমেদ ও কোরবান আলী। কোরবান আলীর হাতে একটা চাবুক।

আবদুল্লাহ হারুণ বলছিল, 'তোমরা যাই করো, শয়তান; ভেবো না আমাদের হাত থেকে তোমাদের নিস্তার আছে।'

কোরবান আলী চাবুকটা বাগিয়ে ধরে সক্রোধে বললো, 'চুপ বেতমিজ...'

শান্ত গলায় নেসার আহমেদ বললো, 'ওকে বলতে দাও কোরবান। ও হলো বেশ্যার দালাল, আর সেই সঙ্গে মিশর সরকারের টিকটিকি। ও যা বলতে চায় বলতে দাও...'

আবদুল্লাহ হারুণ বললো, 'তোমাদের সব আড্ডার হদিশ আমরা জেনেছি নেসার। আমাকে বন্দী করেছো, কিন্তু জেনে রেখো তোমাদের দিনও ফুরিয়েছে।'

নেসার আহমেদ কোরবানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি যা যা বলেছিলাম সব তৈরি আছে কোরবান?'

'জ্বি হুজুর।'

'ক'জন লোক সাথে নিচ্ছো?'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'দশজন।'

'অস্ত্রশস্ত্র?'

'সব ঠিক আছে হুজুর।'

'প্লেন?'

'তা–ও তৈরি।'

'অলরাইট।'

নেসার খুশি হয়ে কোরবানের পিঠ চাপড়ে দিলো। বললো আমরা আবদুল্লাহ হারুণের বিচারটা শেষ করেই গুহায় নেমে যাবো। সব কাজ আজ রাতের ভেতরে সেরে পরশুর মধ্যেই দেশে ফিরে যাবো।

আবদুল্লাহ হারুণ উর্দু কথা বুঝছিল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। এবারে তার দিকে মনযোগ দিলো নেসার। শান্ত গলায় ইংরেজিতে বললো, 'আবদুল্লাহ্ হারুণ, তুমি আমার দারুণ ক্ষতি করেছো। তুমি আমার হাতে নাকিসা আইভরি ওরফে চম্পাকে বিক্রয় করেছিলে পীসার জন্য। আমি জানতাম না তোমরা দুজনেই ঘৃণ্য কুকুরের দলের। নাকিসা আইভরির রূপ যৌবন দেখে আমি উন্মাদ হয়েছিলাম। তার মাশুল আমাকে শোধ করতে হয়েছে অনেক মূল্য দিয়ে। প্রথমতঃ আমার অতি বিশ্বস্ত প্রহরী আদিল শেখকে হারিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ সেই শয়তান টিকটিকি সিম্পসনকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারলাম না। আবদুল্লাহ্, স্বীকার করি তুমি বুদ্ধিমান…আমার দুর্বলতার সুযোগ তুমি ঠিক মতোই নিয়েছিলে।'

আবদুল্লাহ্ হারুণ বললো, 'আরো কিছু মূল্য তোমাকে দিতে হবে নেসার। ঠিক জেনো, তোমাকে এবং তোমার দলবলকে আমাদের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

নেসার আহমেদ হাসলো। কোমরের খাপ থেকে তীক্ষ্ণ একফলা একটা ছোরা বের করে আবদুল্লাহ হারুণের মুখোমুখি হলো। প্রথমে ছোরার খোঁচায় আবদুল্লাহর ডান চোখটা উপড়ে ফেললো নেসার। তীব্র গগন ভেদী আর্তনাদে ঘরটা ভরে উঠলো। নেসার হাসলো শুধু। কাছে গিয়ে বাম হাতটা কেটে নামিয়ে দিলো। ছুরির রক্তটুকু আবদুল্লাহর পরনের জামায় মুছতে মুছতে নেসার বললো, 'আশা করি, এতে তোমার রাগ কিছু কমবে। চিন্তা করো না। তোমাকে অতো সহজে মারা হবে না। কোরবান।'

'জ্বি…'

'ওর কাটা চোখ আর হাতে লবণ মাখিয়ে দিতে বলো। রাত্রিবেলা এসে অন্য ব্যবস্থা করবো।'

আবুদল্লাহ হারুণ তীব্র ব্যথায় গলা কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে লাগলো।

নেসার শুধু হাসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো পিরামিডের দিকে।

রাত নিঝুম হয়ে এসেছে। কয়েকজন নিশাচর নিঃশব্দে পিরামিডের গুপ্ত গুহার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। দলের সম্মুখ ভাগে আছে নেসার আহমেদ ও কোরবান আলী। নেসার আহমেদ স্থির ও গম্ভীর। কোরবান আলীর একটা মাত্র চোখ হিংস্র নেকড়ের চোখের মতো জ্বলছে। দলের সম্মুখ ভাগে দু'জন মশালধারী প্রহরী পথ দেখিয়ে চলেছে। চারদিকে থম থম করছে ভৌতিক নির্জনতা। বহুদূরে এসে একটা প্রাচীরের সামনে নেসার আহমেদ হঠাৎ দাঁড়ালো। কোরবান আলীর ইঙ্গিতে অন্যান্যরাও দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমাদের কাছে এই পথ অচেনা নয়…'

নেসার আহমেদ গম্ভীর গলায় বলতে লাগলো, 'বহুবার তোমরা আমার সঙ্গে এই পথে আসা যাওয়া করেছো। কিন্তু সবচেয়ে দুর্গম যে পথটি আছে, সে পথে তোমরা কেউ কখনো যাওনি। সে পথে কি ভাবে যেতে হবে তার সব নির্দেশ কোরবান আলীর কাছ থেকে তোমরা পাবে। আমি এখানে তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো আমি সর্বদাই ছায়ার মতো তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো।'

নেসার আহমেদ হেসে উঠলো, 'সাবধান, কেউ আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। ঈমান নিয়ে কাজ করো। কাজ শেষ হলে তোমাদের সকলকে বহুত ইনাম দেয়া হবে।'

দলের লোকজন সসম্ভ্রমে সর্দারের সম্মুখে মাথা নোয়ালো। নেসার আহমেদ ইঙ্গিতে কোরবান আলীকে কাছে আসতে বললো।

কোরবান আলী কাছে এলে চাপা গলায় বললো, 'আমি যা যা বলেছি, সব মনে আছে?'

'আছে হুজুর।'

'শোনো, আর একবার কথাগুলো বলছি। পিরামিড থেকে মাল বোঝাই গাড়িগুলো সোজা পাঠিয়ে দেবে পাঁচ নম্বর আড্ডায়। মাল পাঠাতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণে তোমার কাজ হবে গর্দভগুলোর সাথে মোটামুটি তাল মিলিয়ে চলা। কাজ হয়ে গেলে…. বুঝেছো?'

'বেশক…'

কোরবান আলী হাসলো, 'কাজ হয়ে গেলেই সব শেষ করে দেবো।'

'হ্যাঁ। মনে রেখো মনি-মাণিকের লোভ প্রচণ্ড লোভ। বুদ্ধিমান কখনো পেছনে শত্রু রেখে যায় না।'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'বুঝেছি হুজুর…'

নেসার আহমেদ বললো, 'তুমি গুহা মুখের কাছে থাকবে। আমি ভেতরে ঢুকবো। আমি নিজের হাতে মাল খালাস করতে চাই। অল-রাইট?'

'জি হুজুর।'

কোরবান আলী মাথা নোয়ালো। নেসার আহমেদ এক মুহূর্ত স্থির তীক্ষ্ণ চোখে দশজন লোকের দলটাকে পরখ করলো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভয়ানক এক ধূর্ত হাসি। কোরবান আলীর দিকে এবারে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'আমি চললাম কোরবান। সঙ্কেতমত কাজ করো।'

মশালের রক্তিম আলোয় গুহার ভেতরটা লাল লাল ছায়ায় ভরে উঠেছে। নেসার আহমেদ সেই ছায়া পার হয়ে অন্ধকারে ডুব দিলো। তার পদধ্বনি মিলিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

'জানো, আমার হাসি পাচ্ছে,' দীবা বলছিল।

কুয়াশাও হাসলো। বললো, 'অভিনয় অভিনয়ই। এতে হাসির কিছু নেই দীবা।'

দীবা বললো, 'হাসি পাচ্ছে অন্য কারণে। আজ আমার বাসররাত ছিলো।'

কুয়াশা বললো, 'বাসর ঘর তো সঙ্গেই আছে। বলো তো শ্রীমান গোগীকে নৃত্য করতে আদেশ দিই। বাসর শয্যার আগে একটু আমোদ উৎসব হোক।'

'সবতাতেই তোমার ঠাট্টা…'

দীবাও হাসলো। বললো, 'গোগীকে বললে মন্দ হয় না। কাপড় চোপড় পরাই আছে। এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা।'

গোগী কিভাবে যেন টের পেয়েছে তার সম্পর্কে কথাবার্তা হচ্ছে। সে খুব গম্ভীর চালে সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ জোড়া পিট পিট করতে লাগলো।

কুয়াশা সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। আলোচনার প্রসঙ্গ তার মনঃপুত হচ্ছিলো না। সে নিঃশব্দে অন্ধকার গুহা ছেড়ে দেয়ালের সন্নিকটে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে পিরামিডের সঞ্চিত হাজার হাজার বছরের নির্জন স্তব্ধতা। এই অন্ধকার গুহায় আজ সংঘটিত হতে যাচ্ছে তার জীবনের সবচাইতে ভয়ঙ্কর নাটক। সে ভাবলো যদি হেরে যায়? তার চোখ মুখ উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে উঠলো। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। নির্নিমেষ চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা অপেক্ষা করতে লাগলো।

কুয়াশা ঠিকই বলেছিল। পিরামিডের নিচে আজ জেন ভয়ঙ্কর এক নাটক অভিনীত হতে চলেছে। শয়ন-মন্দিরের মমিগুলো যখন নিশ্চল প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে অন্ধকারচারী

প্রেতাত্মাদের জন্য, তখন পিরামিডের তৃতীয় গুহাপথে ঢুকলো নতুন আর একদল নিশাচর। তারা সকলেই সশস্ত্র। দলের নেতা সহকারীকে বললো, 'ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই'র ব্যবস্থা ঠিক মতোই আছে তো মি. শরীফ?'

'আছে। আপনি আদেশ দেয়া মাত্র পিরামিডের অন্ধকার গুহা আলোময় হয়ে উঠবে।'

দলের নেতা হাসলো। বললো, 'আজ আমার হাতে কারো নিস্তার নেই। আজ আমি পরাজয় আর অপমানের প্রতিশোধ নেবোই।

মি. শরীফ বললো, 'আপনি স্যার কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা সকলেই যে কোনো এনকাউন্টারের জন্য প্রস্তুত। বাইরে আমাদের জন্য একটা পুরো ব্যাটেলিয়ান রিজার্ভ রয়েছে।'

ফিস ফিস করে দলের নেতা বললো, 'আমি সবচেয়ে কাকে ভয় করি জানেন মিঃ শরীফ?'

'কাকে স্যার?'

দলের নেতা একটু হাসলো। বললো, 'ভয়, শ্রদ্ধা দুই–ই করি। তার নাম কুয়াশা।'

'কুয়াশা?'

মিঃ শরীফ বিস্ময়ে বিমূঢ় হলেন, 'আপনি স্যার কুখ্যাত বাঙালী দস্যু কুয়াশার কথা বলছেন?'

'অবিকল তাই। কুয়াশা কখনো হারেনি। তার হাতে বার বার আমিই পরাজিত হয়েছি। কিন্তু আজ কুয়াশা, নেসার কারো নিস্তার নেই।'

দলের নেতা হুকুম দেয়।

হঠাৎ কি একটা শব্দে সকলে চমকে উঠে। দলের নেতা দীর্ঘকায় লোকটিও প্রথমে থমকে যায়। তার হাত চকিতে গিয়ে স্থির হয় কোমরের রিভলভারের বাঁটে। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি লাগলো না। এ একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। শত্রু পক্ষের আক্রমণ নয়, আসলে পিরামিডের পুরনো দেয়ালের একটা পাথর কালের অবক্ষয়ে ধসে পড়েছে।

দলের নেতা হাসলো।

নেসার আহমেদও হাসছিল। প্রচণ্ড অট্টহাসি। সে দাঁড়িয়ে ছিলো রাজা অ্যামন হোটাপের মর্মর মূর্তির সামনে। রাজা অ্যামন হোটাপ নিষ্ঠুর হাসি হাসছেন। সেই হাসিকে ব্যঙ্গ করে নেসার আহমেদ অট্টহাস্য করে উঠলো। বললো, 'দোস্ত, আমি কিছু একটা রাজা বাদশা নই। কিন্তু তোমার চেয়ে আমি অনেক শক্তিশালী। ঘন্টা দুই অপেক্ষা করো। তোমার মহামূল্যবান রাজ পোশাক আর চোখের মণি জোড়া নিয়ে

তোমাকে সুখী করবো!'

হঠাৎ অলৌকিক বিস্ময়ের মতো সেই আচ্ছন্ন আলোময় স্থানে মৃদু টুং টাং ঘন্টা ধ্বনি শোনা গেল। সেই সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের ফিস ফিস কথাবার্তা ও গুঞ্জন। নেসার আহমেদ চমকে ফিরে তাকালো। সতর্ক হয়ে কান পাতলো। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। এ যেন রাজা অ্যামন হোটাপ সপরিষদ দরবারে প্রবেশ করছেন। নেসার আহমেদ সভয়ে ফিরে তাকালো রাজা অ্যামন হোটাপের মর্মর মূর্তির দিকে। দেখলো রাজা অ্যামন হোটাপ নিঃশব্দে হাসছেন। হঠাৎ দারুণ ত্রাসে ছুটতে আরম্ভ করলো নেসার আহমেদ। রাজা অ্যামন হোটাপের শয়ন মন্দির পার হয়ে যেমনি গুহা মুখের উপর উঠতে গেল অমনি নারী কণ্ঠের উন্মাদ খিল খিল হাসি শোনা গেল। সভয়ে পেছন ফিরে তাকালো নেসার। দেখলো নর্তকী জেবা ফারাহ্ দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। খিল খিল করে হাসছে। জেবা ফারাহ্ জেবা ফারাহ্ এখানে কেন? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না নেসার। জেবা ফারাহ্কে সে নিজের হাতে গলা টিপে খুন করেছে। একি তবে জেবা ফারাহ্র প্রেতাত্মা...

নেসার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো জেবা ফারাহ্র দিকে। জেবা ফারাহ্ হাসতে হাসতে বললো, 'নেসার আহমেদ! এখন জেবা ফারাহ্র হাত থেকে তোমাকে কে, বাঁচায়?'

নেসার আহমেদ ভয়ে উত্তেজনায় পিস্তল বের করলো। উন্মাদের মতো গুলি করলো জেবা ফারাহ্র মূর্তির দিকে। আশ্চর্য। ভোজবাজির মতো সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। সারা গুহাময় শুধু কাঁপতে লাগলো জেবা ফারাহ্র ভৌতিক হাসি।

নেসার আহমেদ গুহা মুখের পাথর ধরলো। আবার সেই নিঝুম ঘন্টাধ্বনি। হাজার হাজার মানুষের পদ-চারণার শব্দ, ফিস ফিস গুঞ্জনের স্বর। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

নেসার আহমেদ আর কালবিলম্ব না করে পালাতে চাইলো। পিরামিডের প্রেতাত্মারা যেন ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। মৃত রাজা অ্যামন হোটাপের নির্দেশে প্রতিটি পাথর যেন জিঘাংসায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। আর দেরি নয়। অনতিবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে।

হঠাৎ কি একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ শোনা গেল। কোনো মানুষের গলায় এই আর্তনাদ সম্ভব নয়। নেসার সভয়ে পেছনে ফিরলো। দেখলো একটা কফিনের ডালা খুলে গেছে। আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে বিপুলকায় এক মমি কোনো যাদুমন্ত্রের বলে প্রাণ ফিরে পেয়ে। মাটিতে যেন পা গেড়ে গেল নেসারের। এও কি সম্ভব?

বিপুলকায় মমিটা এবারে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মমিটার আপাদ

মস্তক সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। হাত দুটি আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনে বাড়ানো। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল নেসারের—ভয়ে কণ্ঠতালু গেল শুকিয়ে। হঠাৎ পাগলের মতো পর পর দুটো গুলি করলো সে মমিটা লক্ষ্য করে। কয়েক মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল মমিটা। পরে প্রচণ্ড, গগন-বিদারী চিৎকার করে উঠলো। দারুণ ক্রোধে থপ থপ পা ফেলে এগোতে লাগলো নেসারের দিকে; নেসার ততক্ষণে পাথর ধরে ফেলেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে উপরে উঠে গেল। তারপর সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ছুটতে লাগলো। এক লাফে পাথর টপকে তার পেছনে পেছনে অন্ধের মতো ছুটলো মমিটা। যেন পিরামিডের ক্ষুধার্ত প্রেতাত্মা আজ কিছুতেই নেসারকে ক্ষমা করবে না।

কোনও ক্ষমা নেই নেসারের।

দীবা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। কুয়াশা নেমে গেছে সুড়ঙ্গ পথে। পিরামিডের সঞ্চিত অর্থ আজ তার আয়ত্তে। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী এই কুয়াশা। দীবা আর গোগীকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিয়েছে নেসার আহমেদকে। আর সেই সুযোগে গোগীর পিঠে করে সমস্ত গুপ্তধন নতুন আবিষ্কৃত এক সুড়ঙ্গ পথে লঞ্চে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নেসারের গুলিতে গোগীর একটা পা ভয়ানক যখম হয়েছে। দরদর করে রক্ত পড়ছিল জখম থেকে—কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কুয়াশার সব আদেশ পালন করছে গোগী। পিরামিডের অজস্র ধন-রত্ন, হীরা-মুক্তা, মাণিক্য সাত রাজার ধন এখন কুয়াশার হস্তগত। নেসার আহমেদের মুখের গ্রাস অপরূপ উপায়ে কেড়ে নিয়েছে কুয়াশা। আশ্চর্য এই লোকটি। দীবা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ভাবলো। পরনে তার নর্তকী জেবা ফারাহর পোশাক। কিন্তু এই পোশাক তার সত্যিকার পরিচয় বহন করে না। দীবার মনে জেবা ফারাহর কোনো দুর্বলতা নেই। দীবার মনে আছে পিরামিডের রহস্যের চেয়ে রহস্যময় ভালবাসা। এই ভালবাসার আবেগ অস্থির হয়ে উঠছে দীবার মনে। কুয়াশার জন্য অপেক্ষা করছে সে। কাল ভোরেই মিশর ত্যাগ করবে তারা। বাংলাদেশে ফিরে যাবে। বাংলাদেশটা নাকি সুন্দর। কতো সুন্দর? কুয়াশার চোখের মতো সুন্দর?

কুয়াশা! আশ্চর্য লোকটি! দীবা উন্মুখ হয়ে আছে তার একটি ডাকের জন্য, একটু আদরের জন্য, প্রীতিময় স্পর্শের জন্য। কুয়াশা নির্লিপ্ত। কোনো সাধারণ দুর্বলতা তার নেই। সে অপেক্ষা করছে বিপদমুক্ত দিনের জন্য।

পিরামিডের অন্ধকার কবরে দাঁড়িয়ে দীবা ভাবলো বিপদমুক্ত দিন কি সত্যি তার জীবনে আসবে?

পদশব্দে সে চমকে ফিরে তাকালো। কুয়াশা। দীবা হেসে উঠলো। দৌড়ে কাছে

গেল। কুয়াশার একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। আঙুল উঁচিয়ে চুপ করবার ইঙ্গিত করলো দীবাকে কুয়াশা। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, 'চুপ, কথা বলো না। আমার সব কাজ শেষ। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। চলো…'

কিন্তু গোগী?

কুয়াশা চারদিকে তাকালো। গোগী নেই। বললো, 'ভয়ানক জখম হয়েছে বেচারা—বোধহয় কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। চল, এগোই।' সতর্ক হয়ে ওরা রাজা আকতানুনের শয়ন মন্দির থেকে বাইরে এলো। দু'পাশে সঙ্কীর্ণ খাড়া দেয়াল। দেয়ালের কোণে কোণে খাপ পেতে আছে শত্রু। ম্যান-ট্র্যাপের ভয়। কুয়াশা সাবধানে টর্চটা ব্যবহার করলো। সপ্তম প্রাচীর পর্যন্ত বিনা বাধায়ই এলো। ষষ্ঠ প্রাচীরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কুয়াশা। চকিতে দীবাকে ঠেলে নিয়ে এক পাশে সরে গেল। একটা অট্টহাসি শোনা গেল কাছেই। দেখতে পেয়েছে ওদেরকে নেসার। কুয়াশা অস্থির হয়ে উঠলো। প্রতিহিংসার আগুনে তার চোখ জ্বলছিল। সে নিঃশব্দে দীবাকে কাছে টানলো। পরম মুহূর্ত যদি আর না আসে। পর মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকারে।

অন্ধকারে দুটি দুর্ধর্ষ শক্তিশালী মানুষের হিংস্র যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠলো। প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নয়, নেসার আহমেদ। সে অট্টহাস্য করছিল। বলছিল, 'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে এসব ভৌতিক কাজ আর কারো নয়, কুয়াশার। আজ তোকে হাতে পেয়েছি কুয়াশা। তোর বুকের রক্ত শুষে খাবো আমি। আমার হাতে তোর নিস্তার নেই আজ।'

প্রত্যুত্তরে কুয়াশার হিংস্র গর্জন শোনা গেল।

দীবা স্থির, অচল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো কুয়াশা। তার সারা শরীর রক্তে প্লাবিত। বললো, 'নেসার পালিয়েছে দীবা। তুমি এই পথে সোজা লঞ্চে চলে যাও, আমি আসছি।'

হঠাৎ সারা পিরামিড যাদু-মন্ত্রের মতো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আর সেই আলোয় পালিয়ে বেড়াতে থাকলো গুপ্তধন লোভী নিশাচরের দল। চারদিকে গুলি-গোলার আওয়াজ আর ধোঁয়ার ঝাপ্টা।

পাগলের মতো কুয়াশা খুঁজছে নেসারকে। মাথায় খুন চেপে গেছে তার। অলিন্দ দিয়ে ছুটলো সে নেসারের পিছু পিছু। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই কুয়াশা দেখতে পেলো নেসারের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে গোগী। সে-ও বুঝি খুঁজে ফিরছিল নেসারকে।

এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে আসছিল নেসার আহমেদ। আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল সেই ভয়ঙ্কর গরিলা হিংস্র গর্জন করতে

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

করতে। সারা অঙ্গে তার ব্যাণ্ডেজ জড়ানো মমির ছদ্মবেশ। বাঁ পায়ের উরুর কাছে ব্যাণ্ডেজ লাল হয়ে ভিজে গেছে রক্তে। বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে।

হঠাৎ শোল্ডার হোলস্টার থেকে টান দিয়ে পিস্তলটা বের করলো নেসার। উদ্যত ছুরি হাতে পিছন থেকে ছুটে এলো কুয়াশা। কিন্তু ততক্ষণে দুটো গুলি বেরিয়ে গেছে পিস্তল থেকে। পিস্তল দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল গোগী। প্রথম গুলিটা লাগলো না তার গায়ে—কিন্তু দ্বিতীয়টা লাগলো গিয়ে ডান পায়ের ঠিক হাঁটুর নিচে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল গোগী মাটিতে।

সাথে সাথেই হুমড়ি খেয়ে তার পাশে পড়লো নেসার আহমেদ। পিঠের উপর তার আমূল বিঁধে আছে কুয়াশার হাতের ছুরিটা। প্রাণটা তখনও বেরোয়নি। আ···হ্! এক অপার্থিব চিৎকার বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে।

হাতের কাছে পেয়ে ক্রোধ–মত্ত গোগী নেসারের হাঁ করা মুখের দুই পাটি দাঁত দুই হাতে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। নেসারের সেই চেহারার দিকে আর তাকাতে পারলো না কুয়াশা—শিউরে উঠে দৃষ্টি ফেরালো সে অন্যদিকে।

'কাম্ গোগী।' কুয়াশা ডেকেই পিছন ফিরলো। এখন পালাতে হবে এখান থেকে। একদল লোক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাদের কথাবার্তার শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। কুয়াশা চিনলো সিম্পসনের গলা। নিশ্চয়ই সশস্ত্র বাহিনী আছে সঙ্গে। আর দেরি নয়।

আরে, একী! গোগী আবার পড়ে গেল কেন? কুয়াশার আদেশ পাওয়া মাত্রই অভ্যাস বসে একঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছিল গোগী। কিন্তু দুই পা এগিয়েই হাঁটু ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে পড়ে গেল সে। আর চলতে পারছে না।

বিস্মিত কুয়াশা দেখলো দুই পায়েই মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে গোগী। সম্পূর্ণ ভাবে চলৎশক্তি হারিয়েছে সে। কিন্তু সময় নেই—আর তো অপেক্ষা করা চলে না। আর পনেরো সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেই ধরা পড়ে যাবে সিম্পসনের হাতে। পালাতে হবে এখান থেকে এই মুহূর্তে। উপায় নেই, গোগীকে পিছনে ফেলেই যেতে হবে।

মনটাকে শক্ত করে ঘুরে দাঁড়ালো কুয়াশা। তারপর এগিয়ে গেল তার একমাত্র বিশ্বস্ত এবং প্রিয় সাথীকে পিছনে ফেলে। জীবনে একটিবারও যে ধোঁকা দেয়নি কখনও এমন বন্ধুকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলে পালাতে হৃদয়টা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো কুয়াশার। কয়েক পা এগিয়ে থামলো কুয়াশা। আবার পিছন ফিরে চাইলো। দেখলো গোগীর চোখে করুণ মিনতি—আমাকে বাঁচাও প্রভু, আমাকে ফেলে চলে যেয়ো না।

কি যেন ভাবলো কুয়াশা। তারপর ফিরে এলো গোগীর কাছে। আনন্দে ও

কৃতজ্ঞতায় জ্বল জ্বল করে উঠলো গোগীর ছোটো ছোটো চোখ দুটো। একান্ত বিশ্বাসে, পরম নির্ভরতায় তার গলা দিয়ে খুশির অভিব্যক্তি বেরিয়ে এলো ঘরর্ ঘরর্।

মাটি থেকে নেসারের পিস্তলটা তুলে নিলো কুয়াশা। তারপর নিষ্ঠুরভাবে পর পর দুবার গুলি করলো সে গোগীর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। সিম্পসনের হাতে মরার চেয়ে এই–ই ভালো।

চমকে উঠলো গোগী। অবাক হয়ে গেল সে। কোনও শব্দ বেরোলো না তার মুখ দিয়ে। স্তব্ধ বিস্ময়ে কুয়াশার চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো। এই অসম্ভব ব্যাপার সে বিশ্বাস করবে কি করে?

চলে গেল কুয়াশা। পিছনে আহত, মুমূর্ষু গোগী বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো প্রভুর যাত্রা পথের দিকে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কুয়াশা-৫

[আগের কথা]

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

সন্ধ্যা আট ঘটিকা। অভিজাত নাভানা ক্লাবের হলঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সারি সারি চেয়ারে বসে আছেন নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। ক্লাবের সেক্রেটারী মি. মাহতাব পেছনের গ্রীন রুমে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখছেন আর বিরক্ত মুখে বিড়বিড় করে বলছেন, 'হঠাৎ বড়লোকদের কাণ্ডই আলাদা। আটটা বাজতে চললো কোনো পাত্তাই নেই!'

গ্রীন রুমের পাশে ছোটো একটা ঘরে ক্লাবের ক'জন মেম্বার দরজা ভেজিয়ে তাস খেলছিল। সেই ঘরের এক পাশে খবরের কাগজ পড়ছে সখের গোয়েন্দা শহীদ খান আর উল্টোদিকে বসে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে রিটায়ার্ড মেজর বদরুদ্দিন।

'বুঝলে শহীদ, লোকটা একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন। বুদ্ধুও বলতে পারো। আমি যখন আর্মিতে ছিলাম সে হলো গিয়ে ১৯৪৩ সালের কথা, তখন চৌধুরী আলী নকীব একটা সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর কন্ট্রাক্টর ছিলো। ওকে আমরা, মানে কমিশনড অফিসাররা পাত্তাই দিতাম না। কী হে শুনছ তো?'

বুড়ো মেজর গল্প থামিয়ে আচমকা প্রশ্ন করে বসে শহীদকে। শহীদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'তা শুনছি বৈকি। তারপর কি হলো বলুন।'

আসলে শহীদ মেজরের কথায় একটুও কান দিচ্ছিলো না। সর্বক্ষণ এটা ওটা নিয়ে বক বক করা বুড়োর একটা রোগ। তার কথার শুরু আছে, শেষ নেই। বকবকানি শোনার ভয়ে সহজে কেউ কাছে ঘেঁষে না বুড়োর। বুড়ো এজন্যে সারা দুনিয়ার উপর চটা। তার ধারণা দুনিয়া থেকে ভালো মানুষ খোদা সরিয়ে নিচ্ছেন। এখন দুনিয়ায় কিলবিল করছে যতো জুয়াড়ী আর মাতাল। শহীদকে বুড়ো বেশ পছন্দ করে। তার মতে সারা ক্লাবে দুজন ভদ্রলোকই আছে। একজন শহীদ খান, অপরজন সে নিজে। সন্ধ্যার পর থেকে মেজর বদরুদ্দিন ক্লাবে এসে বসেছে, কথা বলার মতো কাউকে পাচ্ছে না। শহীদকে দেখে বুড়ো তাকে আশ্রয় করেছে। কড়া লিকারের চা খাচ্ছে, আর শহীদকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলছে।

'তারপরের কথা কি বলব? সবই তো জানো। শালা চৌধুরী কন্ট্রাক্টরী করে কপাল

ফিরিয়ে নিলো। বছর না ঘুরতেই থার্ড ক্লাস কেটাগরি থেকে একদম ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন। ভাগ্য আর কাকে বলে!'

'তা বটে,' শহীদ মেজরের কথা সমর্থন করে, 'এখন তো চৌধুরী আলী নকীব কোটিপতি।'

'কিন্তু শালার স্বভাব একটুও বদলায়নি।'

মেজর বদরুদ্দিন অভ্যাস বসে চোখ টিপে বলে, 'কথায় বলে স্বভাব না যায় মলে। বয়স হয়েছে ষাটের উপর, তাও এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই। বিয়ে করে বসেছে সুলতানা পারভিনকে। হুঁ,...'

মেজর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, 'বিয়ের পর আলী নকীব চৌধুরী একদম বদলে গেল। বোতল বোতল মদ খাওয়া ধরেছে, বাড়িটাকে বানিয়ে তুলেছে একটা শরাবখানা!'

এই সময় হল ঘর থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। মাইকে সেক্রেটারী মি. মাহতাবের গলার স্বর ভেসে এলো, 'ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ,...আমাদের প্রধান অতিথি চৌধুরী ও বেগম আলী নকীব পৌঁছে গেছেন। আপনারা আশা করি অবগত আছেন যে, আমরা মি. ও মিসেস চৌধুরীর সম্মানেই আজকের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছি। আপনাদের ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু করছি।'

যারা তাস খেলছিল তাদের মধ্যে কে একজন বললো, 'এখন খেলা বন্ধ করে দিই, কি বলো?'

'কেন, খেলা বন্ধ করার কি দরকার হে? ইচ্ছে হলে তুমি কেটে পড়ো, যাও, সুলতানা পারভিনের চন্দ্র বদন দেখো গে! আমরা খেলব, কি বলিস, মকবুল?'

'নিশ্চয়ই!'

মকবুল সায় দেয়, 'আমরা দুনিয়াতে এসেছি কাজ করার জন্য, বক্তৃতা শোনার জন্য নয়। নাও, লিড্ দাও।'

তাস খেলা পুরোদমে চললো। শহীদ খবরের কাগজ নিয়ে বসে রইলো। মেজর বদরুদ্দিন বকবক করতে লাগলো আপন মনে।

'চৌধুরী আলী নকীবকে চীফ গেস্ট কেন করা হয়েছে জানো শহীদ? মানি...অল ফর মানিস সেক। চৌধুরী নাকি ক্লাবের সুইমিং পুলটা করে দেবে, সেজন্যে তাকে অনার দেয়া হচ্ছে। এসব খবর আমি চারদিন আগেই জানি।'

শহীদ নাভানা ক্লাবের একজন পুরানো মেম্বার। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট ধনপতি চৌধুরী আলী নকীবকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে...এটা সে ক্লাবে এসে আজই প্রথম শুনলো। সেক্রেটারী মি. মাহতাব শহীদকে অভ্যর্থনা সভায়

যোগ দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছে। জবাবে শহীদ একটু হেসেছে, কিছু বলেনি। এতক্ষণ সে সান্ধ্য দৈনিকগুলোর পাতা উল্টিয়েছে, আর বুড়ো মেজর বদরুদ্দিনের বকবকানি শুনেছে। সে উঠে গিয়ে হল ঘরে বসবে কিনা ভাবছে, এই সময় ভেজানো দরজার এক চিলতে আলো ভরা ফাঁকটুকু ভরে গেল অন্ধকারে। শহীদ বুঝলো কেউ একজন দরজার ফাঁক দিয়ে তাদের দেখছে। শহীদ ফিরে তাকাতেই লোকটা সরে গেল।

ভেজানো দরজার এক চিলতে আলো ভরা ফাঁকটুকু আবার দৃষ্টি গ্রাহ্য হয়। শহীদ বুঝলো হল ঘরের সভা শুরু হয়ে গেছে। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে গদগদ কণ্ঠে, 'আলী নকীব আমাদের দেশের গৌরব। তাঁর জীবন আমাদের কাছে আদর্শ স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয় কর্মবীর, সামান্য অবস্থা থেকে তিনি যে অবস্থায় উঠেছেন তাতে কবির ভাষায় বলতে হয়, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'।'

বক্তৃতা ভেসে আসছিল গ্রীন রুমের পাশের ঘরটিতে, শহীদ শুনছিল। মেজর বদরুদ্দিন ফিসফিস করে বললো, 'যে বক্তৃতা দিচ্ছে, তার নাম হলো আলী তরফদার। প্রোফেশন্যাল বক্তা। দশটা টাকা ফেললেই যেমন খুশি বক্তৃতা চাও তেমন বক্তৃতা দেবে তরফদার। ওকে মি. মাহতাব ভাড়া করে এনেছে।'

মেজর বদরুদ্দিন মাথা নাড়ে, 'দুনিয়া একটা চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে দিন দিন। এই যে সুলতানা পারভিন স্টেজ আলো করে বসে আছে, চৌধুরী আলী নকীবের বেগম, ক'দিন আগে সে কি ছিলো জানো? এ্যাকট্রেস···লাহোরে এ্যাকটিং করতো সুলতানা পারভিন···তার মানে বেগম সাহেবার চরিত্রখানা কি রকম ছিলো বুঝতেই পারছো! স্বভাব–চরিত্র এখনো বদলেছে কিনা কে জানে! কথায় বলে কাদা ধুলেও কাদা! হুঁ,···সুলতানা পারভিন এখন কোটিপতির স্ত্রী, তার কতো শান–শওকত, কতো বাহানা। অথচ দশ এগারো বছর আগে তার যখন বিয়ে হয় তৈমুর মীর্ধার সাথে তখন প্যাকাটির মতো দেখতে ছিলো মেয়েটা, সাত চড়েও রা বেরোতো না মুখ দিয়ে। তৈমুর মীর্ধা ছিলো আমার বন্ধু মানুষ, এক গেলাসের ইয়ার। আমি তখন লাহোর আছি মেজর হয়ে আর তৈমুর মীর্ধা এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রন লীডার। আমি বলেছিলাম—'তৈমুর, পাখিকে উড়াল তো শেখালে, দেখো এখন না আবার পালিয়ে যায়।' তৈমুর হো হো করে হেসেছিল। শালা একটা স্কাউণ্ড্রেল ছিলো যাই বলো শহীদ। দু'বছর আড়াই বছর যেতে না যেতেই কোথায় যে গা ঢাকা দিলো শালা···সবাই বললো মারা গেছে, ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত ইস্যু করা হলো, কিন্তু আমি জানি তৈমুর মীর্ধা মরেনি। ও হলো উঁচু জাতের জুয়াড়ী। কোনো একটা তালে পড়েছিল হয়তো···'

শহীদ উঠে দাঁড়ায় এই সময়। বুড়ো মেজর বদরুদ্দিন বলে, 'ওকি কোথায় যাচ্ছো?'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'হল ঘরে গিয়ে একটু বসি। আপনি যাবেন তো চলুন।'

একটু ইতস্ততঃ করলো মেজর। তারপর বললো, 'চলো। চৌধুরী আলী নকীব কি বলে শুনেই আসি। কিসমত যখন দিয়েছে তখন কে জানে মাহমুদও হয়তো বক্তৃতা দেবে। ওর বক্তৃতাও শুনবো। কথায় বলে পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে!'

ছোটো ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ওরা তখন হলঘরে ঢুকেছে। শহীদ বললো, 'মাহমুদ কে?'

'চেনো না?' ঐ দেখো ষ্টেজে বসে আছে সুলতানার ডান পাশে। ভাবখানা যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। ব্যাটা ডাকাত, পাঁচ বছর আগেও জেলের ঘানি টেনেছে আর আজ পোজ নিয়েছে একখানা যেন মহাপুরুষ!'

ছোটো ষ্টেজের উপর বিচিত্র রং-এর আলো জ্বলছে। ডায়াসের উপর বসে আছে সভাপতি জনৈক সম্মানিত নাগরিক, চৌধুরী আলী নকীব, সুলতানা পারভিন, তার ভাই মাহমুদ আর ক্লাবের সেক্রেটারী মি. মাহতাব। একজন বক্তা বক্তৃতা করছিল উদাত্ত কণ্ঠে। হঠাৎ শহীদের চোখ পড়লো ডানদিকের প্রবেশ দরজার দিকে। একজন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ লোক পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়াল ঘেঁষে। মুখটা দেখা যায় না। শহীদের মনে হলো লোকটাকে যেন সে চেনে। কিন্তু কে হতে পারে কিছুতেই মনে করতে পারলো না।

একে একে সকলের বক্তৃতা শেষ হলো। সবশেষে সভাপতির অনুরোধে বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী আলী নকীব। বয়সে প্রৌঢ়। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। প্রশান্ত হাসি। মোটা ভরাট গলার স্বর। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কোটিপতি আলী নকীব বললেন, 'আমার মতো নগণ্য একজনকে আপনারা যে সম্মান উপহার দিলেন...'

হল ঘরে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সকলেই পূর্ব পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী চৌধুরী আলী নকীবের বক্তৃতা শুনছে তন্ময় হয়ে...।

আলী নকীব বললেন, 'ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, হয়তো বেশি দিন বাঁচবো না...কিন্তু...'

হঠাৎ দপ করে ঘরের সব ক'টা আলো নিভে গেল। পর মুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা শব্দের সাথে সাথে হৃদয়-বিদারক আর্তনাদে ভরে গেল হল ঘর। চারদিকে ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল।

শহীদ হতবাক হয়ে পড়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়। চেতনা ফিরতেই সে ছুটে বেরিয়ে এলো হল ঘর থেকে এপাশের ষ্টাডিকর্নারে। তার অনুমান মিথ্যে নয়। দেখলো একটা ছায়া মূর্তি লাফিয়ে এসে পড়েছে ছোটো ঘরটায়। শহীদ পেছন থেকে জাপ্টে

ধরলো লোকটাকে কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়লো তার তলপেট ঘেঁষে বাঁ উরুর উপর। সে ছিটকে পড়লো দূরে। পকেট থেকে ততক্ষণে পিস্তল বের করেছে শহীদ। ঠিক এই সময় আলো জ্বলে উঠলো। ছায়া মূর্তি ফিরে তাকালো। শহীদ চমকে উঠলো।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। কঠোর মুখে একটা তীব্র অভিব্যক্তি।

'কুয়াশা, তুমি!'

কুয়াশা একটু হাসলো। বললো, 'হ্যাঁ আমি…'

কি একটা আবেগে শহীদ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে তার সময় লাগলো না। দয়া, মায়া, মমতায় ভুললে চলবে না। মায়া–মমতার চেয়ে কর্তব্য অনেক বড়। কুয়াশা দুষ্কৃতকারী; কুয়াশা দস্যু…কুয়াশাকে ছেড়ে দিলে চলবে না।

শহীদ উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ততক্ষণে কুয়াশা দরজা ঠেলে বাইরে চলে গেছে। বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে গেছে দরজায়। শহীদ বার বার দরজার কপাট ধরে নাড়া দিলো। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

হাতের ঘড়িতে সময় দেখলো শহীদ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কুয়াশা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে।

শহীদ গম্ভীর মুখে ফিরে এলো হল ঘরে। তার অনুমান মিথ্যে নয়। চৌধুরী আলী নকীবকেই খুন করা হয়েছে। চৌধুরী আলী নকীব পড়ে আছেন মঞ্চের উপর রক্তাক্ত দেহে। গুলিটা লেগেছে ঠিক হৃৎপিণ্ডে। কিছু বলার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুলতানা পারভিন উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। মাহমুদ বিমর্ষ, গম্ভীর।

শহীদকে দেখে ক্লাবের সেক্রেটারী মি. মাহতাব এগিয়ে আসেন। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, 'দেখুন দিকি মি. শহীদ, কি বিপদেই পড়লাম।'

শহীদ শুধু ম্লান হাসলো। বললো, 'চিন্তা করবেন না মি. মাহতাব। আমি এদিকটা দেখছি; আপনি পুলিসে খবর দিন।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দুই

সকাল দশটায় লাইব্রেরী ঘরে বসে শহীদ একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করছিল প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি. মি. কবীরের কাছে। চিঠিখানা এই রকমঃ

জনাব, আপনাদের কন্ট্রাক্ট আমি গ্রহণ করলাম। চৌধুরী আলী নকীবের হত্যাকাণ্ডে আমার ব্যক্তিগত কিছু দায়িত্বও রয়েছে, কারণ নিজে আমি সে রাতে নাভানা ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম। যাহোক, আমি যথাশীঘ্র তদন্ত শুরু করবো।

চিঠিখানা এনভেলাপে ভরে চিঠির উপর ডি. আই. জি. অফিসের ঠিকানা লিখলো শহীদ। সে তার কাজে তন্ময় ছিলো। হঠাৎ একফলা একটা ছুরি তীব্র বেগে ছুটে এসে বিদ্ধ হলো ক্যালেণ্ডারের উপর··· লাল কালিতে লেখা রোববারের তারিখটায়। পেছনে মোটা কর্কশ গলায় কে যেন বলে উঠলো, 'এক পা নড়েছো কি মরেছো! সাবধান!'

শহীদ সবই বুঝলো কিন্তু কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। মাস্টারি ভঙ্গিতে শুধু বললো, 'ছুরি ছোঁড়াটা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু গলা কাঁপছে কেন কামাল?' বলে সে পেছন ফিরলো।

কামাল বললো, 'গলা কাঁপবে না তো ঠ্যাং কাঁপবে? মাত্র মাসখানেক হলো ছুরির এই খেলাটা প্র্যাকটিশ করছি—সেই তুলনায় যথেষ্ট ভালো করিনি বলতে চাস?'

শহীদ হাসলো।

কামাল বললো, 'এক মহিলা ড্রয়িংরুমে বসে আছেন। তোর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'দয়া করে বলে দিলেই পারতিস আমি ব্যস্ত আছি, দেখা হবে না।'

'বলেছিলাম। লাভ হয়নি কিছু। মহিলা ড্রয়িংরুমে জাঁকিয়ে বসেছেন। খুব নাকি জরুরী দরকার।'

'বটে?'

'হ্যাঁ, আমাকে বলে দিলেন মি. শহীদের সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাবেন না। দরকার হলে ড্রয়িংরুমে বসে অপেক্ষা করবেন।'

শহীদ হাতের খাম বন্ধ করলো। বললো, 'চল তো দেখি।'

মহিলা একাকী ড্রয়িংরুমে বসে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাচ্ছিল। শহীদ ও কামাল ঘরে ঢুকতেই নড়েচড়ে বসে। একটু হেসে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই মি. শহীদ। আমার নাম বেগম রশিদ। আমি আপনার বন্ধু এ্যাডভোকেট মি. শফির কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

মেপে মেপে কথাগুলি বললো বেগম রশিদ। যেন এই কথাগুলি বলার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। ব্যাগ খুলে বের করলো একটা খামে আঁটা চিঠি। তারপর হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে দিলো শহীদের হাতে।

শহীদ চিঠিখানা পড়তে লাগলো। বেগম রশিদ তাকালো কামালের দিকে। বললো, 'মি. শহীদ বুঝি আপনার বন্ধু?'

'জ্বি।'

'এই দেখুন, আমি ঠিক অনুমান করেছিলাম।' বেগম রশিদ সগর্বে হাসলো।

বেগম রশিদ মধ্যবয়স্কা মহিলা। দেখতে শুনতে অপূর্ব সুন্দরী। চিকন করে টানা দুটি কাজল ভ্রূ'র নিচে ডাগর আঁখি। থুতনীর নিচে সামান্য একটু খাঁজ। সোজা সিঁথির

দু'পাশে কুঞ্চিত অলকরাশি ঘাড়ের পেছনে এলো খোঁপায় বাঁধা। বয়স হলেও বেগম রশিদের যৌবন এখনো তার তন্বী শরীরে অটুট বন্দী হয়ে আছে। গায়ের রংটা অদ্ভুত ফর্সা…রক্তাভ।

চিঠিখানা পড়লো শহীদ। বললো, 'বলুন আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'বলছি।'

বেগম রশিদ একটু ইতস্ততঃ করলো, 'তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস পানি আনতে বলুন দয়া করে।'

গফুরকে ডেকে পানি আনতে বললো শহীদ। বেগম রশিদ শহীদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো, 'এতো বড়ো বাড়িটায় আপনি থাকেন?'

'জ্বি।'

'আপনাকেই মানায়।'

বেগম রশিদের সুবিন্যস্ত দাঁতগুলি মিষ্টি হাসিতে ঝকঝক করে উঠলো। ভাবে-ভঙ্গিতে একটু ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো।

গফুর টেবিলের ওপর এক গ্লাস পানি এনে রাখলো। বেগম রশিদ ঢক ঢক করে পানি খেলো। আলতো করে ঠোঁট মুছলো হাতের পাতলা রুমাল দিয়ে। আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তাকে।

শহীদ তাকিয়েছিল বেগম রশিদের হাতের দিকে। মহিলার হাতের আঙুলগুলির অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আঙুলগুলি কেমন যেন রোগা আর কুঁকরে যাওয়া। কুৎসিৎ। অমন সুন্দর শরীরে আঙুলগুলো বেমানান লাগে।

হাসলো বেগম রশিদ। বললো, 'বেশ হোম্‌লি লাগছে আপনার এখানে বসে। তা অমন করে কি দেখছেন আপনি, রুমালটা?'

রুমালটা খুলে দেখায় বেগম রশিদ। গর্বে তার চোখমুখ ভরে ওঠে, 'এই যে ফাইন সুতোর কাজ দেখছেন সব আমার হাতে করা। কি, পছন্দ হচ্ছে আপনার?'

মৃদু হেসে শহীদ বললো, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন খুলে বলুন বেগম রশিদ।'

দপ করে যেন নিভে যায় বেগম রশিদের উৎসাহ। অস্ফুট গলায় বলে, 'বলছি…।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেগম রশিদ। তারপর বলতে শুরু করেঃ

ব্যাপারটা একান্ত ভাবে আমাদের পারিবারিক। আমার এক বড়জা মানে ভাসুরের স্ত্রীর হয়ে আপনার কাছে এসেছি আমি। বড়জা হলে কি হবে—বয়সে আমার চেয়ে ঢের ছোটো। বেচারী বড় হতভাগী। দু'দুবার বিয়ে হয়েছে। দু'বারই কপালের দোষে স্বামী

হারিয়েছে।

কামাল এতক্ষণ পত্রিকা পড়ছিল। পত্রিকা নামিয়ে এইবার সে জুত হয়ে বসে। বেগম রশিদের কথায় কেমন একটা গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়।

আমার বড়আর প্রথম বিয়ে হয় আজ থেকে এগারো বছর আগে। স্বামী ছিলো এয়ারফোর্সের বড় চাকুরে। থাকতো লাহোরে। সেখানেই সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন কেটে যাচ্ছিলো আমার বড়আ সুলতানার। কিন্তু সুখ কপালে সইলো না। বিয়ের বছর দুই পরেই হঠাৎ তার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায়। কিছুদিন পর জানা গেছে অপঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদে খুব দুঃখ পায় সুলতানা। কিন্তু দুঃখ পেলেই কি করবে? কপালের উপর তো কারো হাত নেই।

দম নেয় বেগম রশিদ। তারপর বলে, 'সুলতানা বাঙালী হলেও বরাবর লাহোর থাকতো। গতবছর আমার ভাসুর লাহোরে গিয়েছিলেন ব্যবসার কাজে। আমার ভাসুরের বয়স হয়েছিল ধরুন ষাটের মতো। গত পনেরো বছর যাবৎ তিনি বিপত্নীক। আমরা কতো তাঁকে বলেছি বিয়ে করার জন্য। কিছুতেই তিনি বিয়ে করেননি। কিন্তু আশ্চর্য, গত বছর লাহোরে গিয়ে কি যে হলো তাঁর আল্লা মালুম। সুলতানাকে তিনি প্রথম দেখেন একটা সিনেমায়। সুলতানা তখন আবার সিনেমায় অভিনয় করতো। সুলতানাকে বিয়ে করার জন্যে আমার ভাসুর লোক লাগালেন। প্রচুর টাকা খরচ করলেন, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।'

শহীদ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ভেতরে ভেতরে কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সংযত হলো। চৌধুরী নকীবের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদে পুলিস তাকে নিযুক্ত করেছে, বেগম রশিদ নিশ্চয়ই তা জানে না। দেখা যাক, বেগম রশিদ কি বলেন। সে মনযোগী ভাব নিয়ে গল্প শুনে যেতে লাগলো। কামাল বললো, 'একজন বুড়োকে বিয়ে করলেন আপনার বড়আ?'

'হ্যাঁ করলেন। সুলতানা তখন সিনেমা লাইনে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। আমাকে সে বলেছে, বিয়ে করার ইচ্ছে একদম তার ছিলো না। প্রথম স্বামীকে সে খুব ভালবাসত। তার স্মৃতি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে বলে সে ভেবেছিল। কিন্তু বোঝেন তো, তার বয়স কম, লাইনটা আবার খারাপ, এদিকে দেখতে সে অদ্ভুত সুন্দরী। প্রথম স্বামীর স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চাইলেই সে পারবে কেন? নানারকম মানুষ অহরহ তাকে উৎপাত করতে শুরু করলো। এইসব উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সুলতানা আমার ভাসুরকে বিয়ে করে। বিয়ের পর সুলতানা আমার ভাসুরের সঙ্গে লাহোর ছেড়ে মানিকপুর চলে আসে, আচ্ছা আপনারা কেউ মানিকপুর গিয়েছেন?'

কামাল মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ গিয়েছি।'

'চমৎকার জায়গা, তাই না? থানা আছে, হাসপাতাল আছে, কাপড়ের কল আছে, সুন্দর সুন্দর রাস্তা-ঘাট, গাড়ি ঘোড়া সব আছে। মানিকপুরেই আমাদের বাড়ি। আমার ভাসুরের দোতলা বাড়িটার নাম চৌধুরী কুটির। মোজাইক করা দেয়াল আর পাথরের মেঝে। এই বাড়িতেই বিয়ের পর বৌ নিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন আমার ভাসুর।

'কিন্তু ভাগ্যের লেখা খণ্ডায় কার সাধ্য বলুন? বিয়ের পর ছ'মাসও কাটলো না, আমার ভাসুর প্রাণ দিলেন আততায়ীর হাতে। আজ পর্যন্ত সেই খুনের কোনরকম সুরাহা হয়নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেগম রশিদ বলে, 'বেচারী সুলতানা। এই বয়সেই দু-দুবার কপাল ভাঙলো ওর!'

শহীদ নিবিষ্ট মনে শুনে যাচ্ছিলো। বললো, 'তারপর…?'

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না বেগম রশিদের কাছ থেকে। বেগম রশিদ অনেকটা আপন মনে বলে, 'আমার ভাসুরের ষাট বছর বয়স হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এমন সুন্দর স্বাস্থ্য ছিলো যে দেখে চল্লিশ বছরের বেশি কিছুতেই মনে হতো না। আর বেচারী সুলতানা। স্বামীর মৃত্যুতে সে অবশ্য বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল এক সম্পত্তির মালিক হয়েছে। কিন্তু মানুষের অভাব কি টাকা দিয়ে পূরণ হয়, বলুন? যার স্বামী নেই, তার সাধ আহলাদও নেই। সে টাকা দিয়ে কি করবে?'

'অত্যন্ত মূল্যবান কথা,…'

একটা সূক্ষ্ম হাসি শহীদের ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে যায়, 'তা আপনার বড়জা সুলতানা কি বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'অসম্ভব কি?'

বেগম রশিদ চোখ বড় বড় করে তাকায় শহীদের দিকে।

'চিন্তা করুন খুব শান্ত আর নরম স্বভাবের একটা মেয়ের কথা। দু'দুবার সে হোঁচট খেয়েছে জীবনের কাছে। আত্মবিশ্বাস, আনন্দ সব গেছে তার। মন তার উড়ু উড়ু। এই অবস্থায় এই মেয়ে যদি সংসার ত্যাগ করতে চায়, আশ্চর্য কি?'

'না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'বড় কষ্টে আছে বেচারী সুলতানা। তার দুঃখ দেখে আমাদের প্রাণ ফেটে যায়। সম্পর্কে বড় হলে কি হবে সে আমাকে দেখে ঠিক তার বড় বোনের মতো। শহীদ সাহেব,…'

'বলুন।'

'আমি সুলতানার জন্য কিছু করতে চাই। আপনি যদি সাহায্য করতে পারেন…'

'যেমন?'

'খবর পেয়েছি।'

বেগম রশিদের বড় বড় চোখ দুটি তীক্ষ্ণতায় ছোটো হয়ে আসে। বলে, 'বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি সুলতানার আগের স্বামী অপঘাতে মরেনি। এখনো জীবিত আছে। তাকে উদ্ধার করে আনার ভার আপনার উপর দিতে চাই। মি. শফির কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আপনার কথা বলে দিয়েছেন। এখন দয়া করে যদি ভার গ্রহণ করেন…'

শহীদ কথা বললো না। চুপ করে রইলো। কামালের চোখে মুখে মৃদু উত্তেজনা ফুটে উঠলো। কি বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। সারা ঘর নিস্তব্ধ। শুধু দেয়াল ঘড়ি টিক টিক করছে।

'একটু ভাবুন বেচারী সুলতানার কথা। প্রথম স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা চিরদিনই অটুট ছিলো। এই অবস্থায় সে যদি তার স্বামীকে ফিরে পায়, কি পরিমাণ আনন্দ সে পাবে চিন্তা করুন!'

'সে অবস্থায় সুলতানার চেয়ে আপনিই বোধহয় বেশি আনন্দ পাবেন, তাই না বেগম রশিদ!'

'আপনি ঠিক ধরেছেন। সুলতানাকে আমি বড় ভালবাসি। চিরদুঃখিনী সুলতানা যদি তার স্বামীকে ফিরে পায় তাহলে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না…। আপনি যদি সুলতানার স্বামীকে উদ্ধার করে আনার ভার গ্রহণ করেন, তাহলে মানিকপুরের চৌধুরী পরিবার আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।'

একটু থেমে বেগম রশিদ বলে, 'ভালো একটা source থেকেই সুলতানার প্রথম স্বামীর জীবিত থাকার সংবাদটা পেয়েছি। সে নাকি এখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছদ্মবেশে আছে। আমি অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। মি. শহীদ।'

'এবং অনেক দুঃখ নিয়ে আপনাকে ফিরে যেতে হবে বেগম রশিদ।'

শহীদ বললো, 'আমি নিজেও দুঃখিত। আপনার এই কেস গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়…'

শহীদের কথায় খিলখিল করে হেসে ওঠে বেগম রশিদ। বলে, 'আপনি পাকা লোক মি. শহীদ। আমারই ভুল হয়েছে। কেসটা দেয়ার আগে আপনার ফি–র কথাটা আলোচনা করা উচিত ছিলো। তা দেখুন, আমি নিজে গরীব মানুষ। আপনার মতো স্বনামধন্য লোকের ফি জোগাতে পারবো এমন সামর্থ্য আল্লা আমাকে দেননি। তবে…'

বেগম রশিদ অল্প একটু হাসলো, 'সুলতানার প্রথম স্বামীকে যদি উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে...'

'আপনি অতি মহিয়সী মহিলা বেগম রশিদ। বড়জার দুঃখে কাতর হয়ে টাকা খরচ করা আপনাকেই সাজে। কিন্তু আমি এবারও দুঃখ প্রকাশ করছি…'

এবার সত্যি সত্যি দুঃখিত হলো বেগম রশিদ। বললো, 'হুঁ, বুঝতে পারছি দরে পোষাবে না বলে ভয় করছেন আপনি। কি জানেন? কোটিপতি চৌধুরী আলী নকীবের ভাইয়ের বৌ-এর পক্ষে আপনার দাবি মেটানো অসম্ভব হতো না···কিন্তু কি বলবো? সবই কপালের ফের।'

'চৌধুরী আলী নকীব!'

শহীদ যেন অতিশয় অবাক হয়েছে এমন ভাব দেখায়। বলে, 'চৌধুরী আলী নকীব আপনার ভাসুর?'

'চেনেন দেখছি। হ্যাঁ, উনিই আমার ভাসুর। সুলতানা বর্তমানে ওঁরই বিধবা স্ত্রী। মাস খানেক আগে চৌধুরী সাহেবের হত্যার খবর পত্রিকায় নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

'দেখেছি! সুলতানা তাহলে সুলতানা পারভিন? আর তার প্রথম স্বামীর নাম তাইমুর মীর্ধা?'

'ঠিক তাই।'

বেগম রশিদ মাথা নাড়ে, 'তাইমুর মীর্ধাকেও আপনি চেনেন দেখছি।'

শহীদ সে কথায় কান দিলো না। সে শুধু চৌধুরী আলী নকীবের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বেগম রশিদের বলা কাহিনীর সম্পর্ক কি হতে পারে, তা-ই চিন্তা করলো।

ওদিকে বেগম রশিদ বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। দুঃখের গলায় বলে, 'মি. শহীদ, অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম। এভাবে ফিরিয়ে দেবেন, সত্যি বলতে কি কখনো আশা করিনি। যাক গে, এখন তাহলে ওঠা যাক···'

শহীদ বললো, 'চলুন, আপনাকে আমরা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।'

বেগম রশিদ উঠলো। দীর্ঘ সুঠাম শরীর। অপূর্ব সুন্দর দুটি ভাবাময় চোখ। শহীদ কামাল দুজনে তাকে গেটের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

যেতে যেতে শহীদ বললো, 'চৌধুরী সাহেবের সম্পত্তির বার্ষিক আয় কতো বললেন?'

'ছাপান্ন লক্ষ টাকার মতো।'

'চৌধুরী সাহেব আপনার আপন ভাসুর?'

আপনই বলতে পারেন। চৌধুরী আলী নকীব সাহেবের সহোদর ভাই কেউ নেই। আমার স্বামী তাঁর আপন চাচাতো ভাই।

'চৌধুরী আলী নকীব বিয়ের পরে সুলতানা পারভিনের নামে সবটা সম্পত্তি উইল করে দিয়েছিলেন, তাই না?'

'জ্বি হাঁ। অল্প বয়সে বেচারী মেলা টাকার মালিক হয়েছে বটে, কিন্তু টাকায় কি সুখ আসে মি. শহীদ?'

'আপনার তো টাকাতেই সুখ বেগম রশিদ!'

'মানে,' অস্ফুট আর্তনাদ করে থেমে যায় বেগম রশিদ। তার চোখ মুখে ভয়ের ভাবনা ফুটে উঠেছে।

শহীদ একথার জবাব দিলো না। শক্ত গলায় শুধু প্রশ্ন করলো, 'আপনি এখানে কার স্বার্থে এসেছিলেন বেগম রশিদ?'

'কার স্বার্থে! কি বলছেন আপনি?'

বেগম রশিদ যেন অবাক হয়। বলে, 'আমি কেন এসেছি সে কথা আগেই আপনাকে বলা হয়েছে। আমি বড়জা সুলতানার জন্যে, সুলতানার স্বার্থে এসেছিলাম…'

'মিথ্যে কথা। আপনি আপনার নিজের স্বার্থে এখানে এসেছিলেন…'

বেগম রশিদ থতমত খেয়ে যায়। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। শহীদ একটু হেসে বলে, 'সে যাই হোক বেগম রশিদ, আমরা আপনার কেস গ্রহণ করলাম।'

বেগম রশিদ আনন্দিত হয়ে উঠলো। শহীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো বুঝতে পারছি না। তাইমুর মীর্ধাকে যদি উদ্ধার করে দিতে পারেন তাহলে আমরা সকলে আপনাদের কেনা হয়ে থাকবো।…দাঁড়ান, আমি আমার ঠিকানাটা দিয়ে রাখি।'

বেগম রশিদ ব্যাগ থেকে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বের করলো। ব্যাগের উপর কাগজটা রেখে ঠিকানা লিখতে লাগলো। ইতিমধ্যে শহীদ ও কামালের দৃষ্টি বিনিময় হলো বার দুই। কামাল হাসলো।

'এই যে আমার ঠিকানা নিন।'

বেগম রশিদ ঠিকানাটা শহীদকে দিলো। শহীদ সংযত গলায় বললো, 'কাজ করার আগে আপনাকে জানাবো বেগম রশিদ। দরকার হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতেও যাবো।'

বেগম রশিদ উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। কামাল ও শহীদের প্রশস্তি গাইতে লাগলো। তারপর চলে গেল বিদায় নিয়ে।

শহীদের মনে পড়ছিল কুয়াশার শান্ত কঠিন মুখের ছবিটা। যে কুয়াশাকে সে এতো ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ঘটনাচক্রে আবার তার সঙ্গেই বাধলো সংঘর্ষ। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

শহীদ সেই রাতের ঘটনা স্মরণ করলো একবার আর কঠিন হয়ে উঠলো তার ইচ্ছা। না, হত্যাকারী যে-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে আপোস নেই। শাস্তি তাকে দিতেই হবে। স্নেহ ভালবাসার চাইতেও কর্তব্যের আহ্বান অনেক বেশি মূল্যবান। সে কথা ভুললে তো চলবে না।

শহীদ ও কামাল ফিরে এলো ড্রয়িংরুমে। ঘরে এসেই কামাল একটা সোফায় বসে গাম্ভীর্য অবলম্বন করলো। শহীদ মৃদু হেসে বললো, 'রহস্য ভেদ করতে চাইছিলি না? নে জুটিয়ে দিলাম।'

'আহ্, ডিসটার্ব করিস না।'

কামাল খুব মাতব্বর গোছের একজন ডিটেকটিভ মতো মুখভঙ্গি করে। বলে, 'আমি এখন কেসটার কথা ভাবছি।'

'বাপরে...'

শহীদ হাসে, 'এযে দেখছি গরু কেনার আগেই দইয়ের হিসাব!'

সে আর কিছু বলে না। বেগম রশিদের লেখা ঠিকানাটার উপর চোখ বুলায়। সুন্দর মেয়েলী অক্ষরে লেখা আছে, 'বেগম আকিয়া রশিদ, পাতা বাহার রোড, মানিকপুর।'

এক

মানিকপুর জায়গাটা ছরিব মতো সুন্দর।

জেলা শহর থেকে দশ মাইল উত্তরে পীরগঞ্জের উঁচু-নীচু টিলা। টিলা থেকে বেরিয়েছে একটা ছোটো আঁকাবাঁকা নদী। একটা প্রকাণ্ড ঢালু মাঠ দক্ষিণে রেখে নদী ঢুকেছে শাল-মহুয়ার জঙ্গলে। জঙ্গলের গা ঘেঁষে সবুজ গাছপালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী হাসপাতাল। এখান থেকে মানিকপুরের শুরু। এখানে ওখানে সবুজ গাছপালার দ্বীপের ভেতর রয়েছে বাজার, থানা, পোস্টাফিস, ট্যুরিস্ট হোটেল আর 'দি মানিকপুর কটন মিল্‌স' নামে বিরাট এক কাপড়ের কল। কাপড়ের কল কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কলোনী। এর নাম চৌধুরী কলোনী।

মানিকপুর শহর না হলেও নির্দেন পক্ষে উপশহর। জেলা শহর থেকে চমৎকার পীচ ঢালা রাজপথ চলে এসেছে চৌধুরী কলোনী বরাবর। সেখান থেকে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে রাজপথটি ছড়িয়ে আছে মানিকপুরের সর্বত্র। মানিকপুরে একটা হাই স্কুল আছে। একটা মুন্সেফ কোর্ট আছে আর আছে মহকুমা রেজিস্ট্রারী অফিস। মানিকপুর ট্যুরিস্ট এবং স্বাস্থ্য-লোভীদের পক্ষে আকর্ষণীয় জায়গা। এছাড়া বহু পুরানো আমলের নবাবদের তৈরি একটা ভাঙা দুর্গ আছে। এছাড়া আছে পীরগঞ্জের টিলায় হারিয়ে যাওয়া প্রকাণ্ড রাজা সাহেবের মাঠ ও শাল-মহুয়ার অরণ্য। জায়গাটার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলে দূর দূরান্ত থেকে প্রতি বছর বহু লোক এখানে চেঞ্জে আসে। হেমন্তের শুরু থেকেই মানিকপুরে ট্যুরিস্ট এবং স্বাস্থ্য লোভীদের আগমন শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া প্রতিদিন বাইরে থেকে বহু লোক এখানে বেড়াতেও এসে থাকে। কেউ রাজা সাহেবের মাঠে বা পীরগঞ্জের টিলায় বেড়াতে যায়। কেউ দেখতে যায় নবাবদের ভাঙা দুর্গ।

মানিকপুরের সবচেয়ে সুন্দর পথটির নাম পাতাবাহার রোড। এই রোড শুরু হয়েছে কলোনী থেকে, কিছুদূর গিয়ে সোজা পৌঁছেছে হাসপাতালে! সেখান থেকে শাল-মহুয়ার অরণ্য দক্ষিণ পাশে রেখে চলে গেছে 'হোটেল তাজ'-এ। হোটেল তাজ রাজা সাহেবের মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে শাল-মহুয়ার ছায়া, পুবে ধূ ধূ মাঠের দিগন্ত।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। ছবির মতো সাজানো আর ঝকঝকে। মনে হয় কোনো এক শিল্পীর মনের একটি স্বপ্ন যেন শাল-মহুয়ার অরণ্যের পাশে, রাজা সাহেবের মাঠের কিনারায় ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

পাতাবাহার রোডের ডান পাশে একটি পুরানো বাড়ির বাগানের সামনে দাঁড়িয়েছিল

তেইশ চব্বিশ বছরের এক স্বাস্থ্যবতী শ্যামলা মেয়ে। নাম শাহেলি। দুপুর বারোটায় তখন পাতাবাহার রোড রীতিমত কর্মব্যস্ত। গাড়ি-ঘোড়া এবং লোকজনের চলাফেরায় সরগরম। রাস্তার কেউ কেউ চোখ তুলে এই স্বাস্থ্যবতী সুন্দর শ্যামলী মেয়েটিকে দেখে যাচ্ছিলো। কিন্তু শাহেলির কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে অপলক চোখে তাকিয়েছিল উত্তর প্রান্তের একটা লাল রঙের সুন্দর দোতলা বাড়ির দিকে। গাছপালার নিবিড়তার ফাঁকে বাড়িটার ওপরের একাংশ মাত্র দেখা যাচ্ছিলো। শাহেলি তাকিয়েছিল সেদিকেই।

মানিকপুরের সবচে' বিখ্যাত লোকের বাড়ি ওটা, 'নাম চৌধুরী কুটীর।' মানিকপুরে শাহেলি ফিরে এসেছে একমাসেরও আগে। কিন্তু ফিরে এসে অবদি একবারও ঐ বাড়িতে যায়নি। অথচ ধরতে গেলে ঐ বাড়িতেই সে মানুষ। দু'বছর আগে শাহেলি যখন পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতন যায় তখন জানতো ফিরে এসে প্রকৃতপক্ষে ঐ বাড়ির মালিক হবে রবিউল্লা আর সে-ই। কপালের ফেরে এখন সব উল্টে গেছে। এখন মালিকানার দাবি দূরে থাক, ঐ বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাওয়ার অধিকারও শাহেলির কিছুমাত্র নেই। ঐ বাড়ির মালিক এখন এককালের অভিনেত্রী সুলতানা পারভিন ও তার অভিভাবক বড় ভাই আশিক মাহমুদ। মাঝে মাঝে ঐ বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে শাহেলির। অধিকার না-ই থাক। অধিকার ছাড়া কি বাইরের মানুষের মতো একবার যাওয়া যায় না ঐ বাড়িতে? শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি ভরা ঐ লাল রঙের সুন্দর দোতলা বাড়িটা অজানা এক আকর্ষণে টানে শাহেলিকে। শাহেলি যেতে চায়। কিন্তু মা মানা করেন। শাহেলির বড় চাচা চৌধুরী সাহেব বেঁচে নেই, শাহেলি আর কেন যাবে ঐ বাড়িতে? মায়ের এইসব কথার অর্থ বোঝে না শাহেলি। একদিন সে চৌধুরী কুটীরে যাওয়ার জন্য জিদ ধরেছিল। মা বলেছিলেন, 'কি বেয়াদব মেয়ে রে বাবা। একশোবার মানা করছি। একটু যদি কথাবার্তা শোনে!'

শাহেলি বলেছিল, 'কেন মা, একদিন গেলে কি হয়? রোজ রোজ তো যাচ্ছি না। একদিন গিয়ে শুধু বাড়িটা দেখবো আর নতুন চাচীর সঙ্গে গল্প করে আসবো।'

'ইস; নতুন চাচী। কথা শুনে আনন্দে আর বাঁচি না। বলি যেতে যে চাচ্ছিস ও একটা মানুষ না শয়তান? জানিস তোর বড় চাচাকে ঐ মাগীই খুন করেছে?'

চমকে উঠেছিল শাহেলি।

মা বলেছিল, 'বুড়োকে মেরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হয়েছে ঐ শয়তান মেয়েলোকটা, বুঝিস না কিছু?'

বড় চাচার স্নেহময় হাসি মাখা মুখটা মনে পড়ে শাহেলির। বড় চাচার বুক ভরা ছিলো স্নেহ-মমতা। চৌধুরী বংশের প্রতিটি লোক তাঁর কাছে ঋণী। শাহেলিকে তিনিই

শান্তিনিকেতন পাঠিয়েছিলেন। বি. এ. পাস করার পর রবিউল্লাহকে তিনিই চাকরি নিতে দেননি। তাঁরই সাহায্য এবং নির্দেশে ছোটো একটুকরো জমি নিয়ে ফার্ম শুরু করেছিল রবিউল্লাহ। এখন সেই ফার্ম বিরাট বড় হয়েছে। সারা জেলার সেটা গর্বের বস্তু এখন। শুধু যে রবিউল্লাহ এবং শাহেলিকে তিনি সাহায্য করেছেন তা নয়। ডাক্তার চাচা, রশিদ চাচা থেকে শুরু করে চৌধুরী বংশের প্রতিটি মানুষকে নানাভাবে নিয়মিত সাহায্য করেছেন তিনি। আত্মীয়-স্বজনের জন্য অর্থ ব্যয়ে কোনদিন তাঁর কার্পণ্য ছিলো না। কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে এলে তিনি হাসতেন। বলতেন, 'খোদা আমাকে প্রচুর দিয়েছেন। এখনো দিচ্ছেন। ছেলেপুলে নেই, একলা একটা মানুষ··· এতো ধনদৌলতে আমার হবেটা কি?'

আরো বলতেন, 'আমার বংশের কেউ যদি লেখাপড়া না শিখে মূর্খ হয়, অসম্মানটা কার? আমার পরিবারের কেউ যদি দুর্দশায় পড়ে, অপমানটা কার হয় শুনি?'

এমন ফেরেশতার মতো মানুষ হঠাৎ রাতারাতি যেন বদলে গেলেন। লাহোরে ব্যবসার কাজে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করে বসলেন লাহোর সিনেমা জগতের সুলতানা পারভিনকে। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন তার নামে। বিয়ের পর ক'মাসও কাটলো না। অপঘাতে মৃত্যু হলো তাঁর।

শাহেলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। লাল রঙের দোতলা বাড়িটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়।

মা খুঁজতে খুঁজতে আসেন বাইরে। এসে অযত্ন বর্ধিত বাগানের কামিনী গাছের নিচে ভরা দিনের আলোয় খোলা চুলে শাহেলিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আঁৎকে ওঠেন।

'ও কিরে শাহেলি। দাঁড়াবার কি নমুনা বাপু! রাস্তা দিয়ে কতো লোকজন যাচ্ছে, একটু যদি লজ্জা শরম থাকে। নে চল।'

শাহেলির প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয়। দু'বছর অন্য পরিবেশে মন তার বেড়ে উঠেছে স্বাধীন ভাবে। এসব বাধা নিষেধ ভালো লাগে না। মায়ের কথায় প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয় তার। কি ভেবে চেপে যায় সে। শুধু বলে, 'কারা কারা এসেছেন মা? বুলু চাচীমা এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ওঁরা দুজনেই এসেছেন। রবিউল্লাহ আর তোর ডাক্তার চাচা এখনো আসেননি। ওরাও এখুনি এসে পড়বেন। চল···তোর বুলু চাচীমা একটু আগেই খুঁজেছিলেন।'

শাহেলি মায়ের পিছু পিছু ঘরে আসে। আজ শাহেলির মা মর্জিনা বানু চৌধুরী পরিবারের প্রায় সবাইকে দুপুর বেলা খেতে ডেকেছেন। শাহেলি আর রবিউল্লাহর বিয়ের ব্যাপারে সকলের মতামত শেষ বারের মতো জানার জন্যেই চৌধুরী পরিবারের

সকলকে ডেকেছেন। কিন্তু চৌধুরী আলী নকীবের বিধবা স্ত্রী সুলতানা পারভিন ও তার বড় ভাই মাহমুদকে ডাকেননি তিনি।

বেগম রশিদ বলে, 'যাই বলো মেজো আপা। সুলতানা না এলে ঠিক জমতে চায় না। ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

খোঁচা খেয়ে মর্জিনা বানু বলেন, 'কথাটা ঠিকই বলেছো ছোটো বৌ। কিন্তু বেগম সাহেবাকে যে খেতে বলবো, তার উপায় আছে কিছু? দেখছো তো আমার অবস্থাটা?'

'না, না…ওকে দাওয়াত না করে ভালো করেছো ভাবী।'

রশিদ সাহেব বললেন, 'সুলতানা ভাবী সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু ওই যে একটা পাজী আছে সঙ্গে…মাহমুদ, ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'আঃ, তুমি থামবে?'

বেগম রশিদ রেগে মেগে তাকায় রশিদ সাহেবের দিকে। রশিদ সাহেব স্ত্রীর ধমক শুনে বুঝতে পারেন মাহমুদ সম্পর্কে অমন খোলামেলা মন্তব্যটা করা তাঁর উচিত হয়নি। দেয়ালেরও কান আছে আর এ তো রীতিমত গুলজার আসর। কাঁচুমাচু হয়ে যান রশিদ সাহেব। নিচের দিকে চোখ নামিয়ে পা নাচাতে লাগলেন তিনি।

চৌধুরী আলী নকীব মানিকপুরের চৌধুরী পরিবারের ছেলে। নিজের চেষ্টায় তিনি বড়লোক হয়েছিলেন। সারা পাকিস্তানে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে চালু ও জনপ্রিয় প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, পিপলস ব্যাঙ্কের তিনি একমাত্র স্বত্বাধিকারী। তাছাড়া নানান জায়গায় রয়েছে তাঁর চিনির কল, কাপড় ও সুতা তৈরির কল, তেল কোম্পানি ইত্যাদি। কোটিপতি আলী নকীব চৌধুরীর সহোদর কোনো ভাই-বোন নেই। চৌধুরী আকবর হোসেন, ডাঃ চৌধুরী, চৌধুরী মমতাজ হোসেন ও চৌধুরী রশিদ আহমেদ,—'এই চারজন তার আপন চাচাতো ভাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ চৌধুরী ও চৌধুরী রশিদ আহমদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। চৌধুরী আকবর হোসেন ও চৌধুরী মমতাজ হোসেন একটি মাত্র মেয়ে ও একটি মাত্র ছেলে রেখে মারা যান। চৌধুরী আকবরের মেয়ের নাম শাহেলি ও চৌধুরী মমতাজের একমাত্র ছেলের নাম রবিউল্লাহ। চৌধুরী আলী নকীব শাহেলি ও রবিউল্লাহকে আপন ছেলে-মেয়ের মতো ভালবাসতেন। বিপত্নীক আলী নকীব পরিণত বয়সে এদের বিয়ে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। শাহেলিকে পাঠিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বাইরে। রবিউল্লাহকে একটা কৃষি ফার্ম করে দিয়েছিলেন। কথা ছিলো শাহেলি ফিরে এলেই আলী নকীব নিজের হাতে রবিউল্লাহর সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে রেখেছিলেন। সেই উইলে সম্পত্তির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেয়া হয়েছিল শাহেলি আর রবিউল্লাহকে, পঁচিশ ভাগ রিজার্ভ করা হয়েছিল হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি জনহিতকর

প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ব্যয়ের জন্য। বাকি পঁচিশ ভাগ সমান ভাবে দেয়া হয়েছিল ডা. চৌধুরী ও রশিদ আহমেদকে। কিন্তু হঠাৎ সাজানো দাবার ছকটা কে যেন উল্টে দিলো। গোলমাল হয়ে গেল সবকিছু। বুড়ো আলী নকীব হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন। রাতারাতি উইল বদলে সম্পত্তি লিখে দিলেন যুবতী স্ত্রীর নামে।

এতদিনের সব আশায় ছাই ঢেলে দিলো কোথাকার একটা নষ্ট মেয়েমানুষ এসে।

রশিদ সাহেবের চোখ মুখ উত্তেজনায় জ্বলতে থাকে। বর্তমান উইল যে জাল প্রমাণিত করবেন তারও উপায় নেই। উইলে সাক্ষী হিসাবে নাম এবং টিপসই আছে তার এবং ডা. চৌধুরী দুজনেরই। উকিলের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে বহু পরামর্শ নিয়েছেন রশিদ সাহেব। কোনো আশা পাওয়া যায়নি আইনজ্ঞদের কাছ থেকে। তাঁরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন উইল জাল প্রমাণিত করার কোনো উপায় নেই। চৌধুরী আলী নকীবকে হত্যার অপরাধে মাহমুদকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছেন রশিদ সাহেব, শুধু চেষ্টা নয়, এর পিছনে তিনি সর্বস্ব ব্যয় করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের উকিল এ বিষয়েও কোনো নিশ্চিত আশ্বাস দেননি। মামলায় জেতা প্রায় অসম্ভব, এটা বুঝতে বাকি নেই কারো, রশিদ সাহেবের তো নয়ই।

রশিদ সাহেব উত্তেজিত নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। এই সময় ঘরে ঢুকলেন ডা. চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী রাবেয়া সৈয়দ ও রবিউল্লাহ। নানারকম বিষয় নিয়ে গল্প জমে উঠলো।

শাহেলির দিকে তাকিয়ে ডা. চৌধুরী বলেন, 'মানিকপুর কেমন লাগছে মা?'

শাহেলি হেসে ফেললো, 'বাঃ, কেমন লাগবে আবার, ভালো। নিজের জায়গা কারো কাছে খারাপ লাগে?'

রবিউল্লাহ শান্তশিষ্ট, ধীর-স্থির মানুষ। সে একটু ঠাট্টা করে বলে, 'সারাদিন মুখ চুন করে বাড়িতে বসে থাকার নাম বুঝি তোমার ভালো থাকার লক্ষণ?'

শাহেলি বলে, 'বাড়িতে থাকবো না তো কি ঐ চাষাদের কাজ দেখতে যাবো দুপুরের রোদ ভেঙে?'

রবিউল্লাহ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বেগম রশিদকে বলে, 'দেখলেন বুলু চাচী মা (বেগম রশিদের ডাক নাম), শাহেলি, ধরুন গিয়ে আমাকেই চাষা বলছে।'

ডা. চৌধুরী হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'সম্পর্ক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে তো। তাই শাহেলি মা গালিগালাজটা এখন থেকেই রিহার্সেল দিয়ে রপ্ত করে নিচ্ছে।'

শাহেলি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

মর্জিনা বানু এসে বলেন, 'চলো তোমরা, খানা তৈরি।'

ভেতরের বারান্দায় টেবিল পাতা হয়েছে। ডা. চৌধুরী, রশিদ সাহেব ও রবিউল্লা

টেবিলে গিয়ে বসে। রাবেয়া সৈয়দ আর বেগম রশিদ মর্জিনা বানুর জন্য অপেক্ষা করেন।

'আপনিও চলুন আপা...'

'তোমরা গিয়ে বসো না ভাই। শাহেলি তোমাদের সঙ্গে বসুক। আমি তদারক করি...'

রাবেয়া সৈয়দ বলেন, 'শাহেলি তো বসছেই। আপনিও চলুন।'

রাবেয়া সৈয়দ এই পরিবারের সবচে' মানী আর বিদুষী মহিলা। সম্পর্কে ছোটো ভাই-এর বৌ হলেও স্বয়ং মরহুম আলী নকীব চৌধুরী পর্যন্ত এঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। রাবেয়া সৈয়দের কথায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে মর্জিনা বানুর। বলেন, 'আর ভাই আমাদের খাওয়া-দাওয়া। এখন মরতে পারলে বাঁচি। বড় কর্তা কি বাঁচার হাল করে রেখে গেছেন আমাদের!'

কথাটা চৌধুরী পরিবারের সকলেরই মনের কথা। রাবেয়া সৈয়দ চুপ করে রইলেন। বেগম রশিদ জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মর্জিনা বানু এইবার ফিসফিস করে বলেন, 'খবর শুনেছো ভাই?

'কি?'

এদিক ওদিক তাকান মর্জিনা বানু। তারপর তেমনি ফিসফিসে গলায় বলেন,' ওই যে সুলতানার ভাইটা মাহমুদ, ও নাকি সুলতানার আপন ভাই না।'

'বলেন কি মেজো আপা।'

বেগম রশিদ আসমান থেকে পড়ে। বলে, 'না...না...এ হতেই পারে না।'

তিক্ত অথচ তীক্ষ্ণ গলায় মর্জিনা বানু বলে, 'কেন হতে পারে না শুনি? সুলতানার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো মোটে ছ'সাত মাসের। তার কে আছে না আছে সে খবর তুমি আমি কতটুকু জানি বলো? পেয়ারের নাগরকে নিজের কাছে রাখার জন্য তাকে ভাই বলে জাহির করা, এটা কি এতোই অসম্ভব?'

রাবেয়া সৈয়দ কিছু বললেন না।

বেগম রশিদ চোখ বড় বড় করে বললো, 'কার মনে কি আছে আল্লাহ্ জানেন! শুনেছি প্রথম স্বামী মারা যাবার পর সুলতানা নাকি লাহোরে সিনেমায় অভিনয় করতো।'

'তাহলেই বোঝো। একটা রাণ্ডী মেয়েমানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না। এমন কি...'

মর্জিনা বানু আবার চারদিকে তাকায়। তার চোখ দুটি লাল আর ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। বলেন, 'আমার মনে হয় বড়কর্তাকে সুলতানাই গুণ্ডা দিয়ে মারিয়েছে...'

'ইয়াল্লা!'

বেগম রশিদ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'মেজো আপা, আপনি এসব কি বলছেন! শুনে যে রীতিমত আমার গা কাঁপছে…'

'এটা কিন্তু ঠিক হলো না ভাই মেজো আপা।'

রাবেয়া সৈয়দ শান্ত কণ্ঠে এবার বলেন, 'চৌধুরী সাহেবকে শত শত লোকের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী যে-ই হোক তার উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই ছিলো। কিন্তু সেটা না জানা পর্যন্ত এভাবে বিনা প্রমাণে দায়িত্বহীন ভাবে কাউকে হত্যাকারী বলা অত্যন্ত অন্যায় কাজ।'

রাবেয়া সৈয়দ মৃদু গলায় বলে চলেন, 'লোকে তো শুনি এই খুনের ব্যাপারে চৌধুরী পরিবারের মানুষের কথাও বলে? কার কথা সত্য বলবে বলো?'

'কই গো,…তোমরা সব চলে এসো।' অদূরের বারান্দায় টেবিল থেকে ডাক্তার চৌধুরীর আর্তনাদ শোনা গেল, 'কতক্ষণ এভাবে কই মাছের ভাজা সামনে রেখে আমাকে কষ্ট দেবো?'

'ওসব কথা কাউকে বলবেন না আপা…'

রাবেয়া সৈয়দ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'কপালের দোষে আমরা সবাই এখন গরীব। আমরা যদি সুলতানা পারভিন আর তার ভাইয়ের নামে এসব রটিয়ে বেড়াই তো সবাই বলবে আমরা হিংসে করে এসব বলছি। তাই না…?'

মর্জিনা বানু একটু থতমত খেয়ে যান। রাবেয়া সৈয়দ মিষ্টি হেসে বলেন, 'চলুন, কর্তারা ডাকছেন। আর দেরি করা ঠিক না।'

খাবার টেবিলে কর্তারাও কিন্তু প্রায় একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। রশিদ সাহেব বলছিলেন, 'আগের উইলটার কথা মনে আছে ছোটো ভাই?'

ডাক্তার চৌধুরী বললেন, 'হুঁ।'

রশিদ সাহেব বললেন, 'আগের উইলটা করার সময় বড় কর্তাকে আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম আপনি আপনার সম্পত্তি এভাবে আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন না। ভবিষ্যতে কি হয় কে জানে? আপনার স্বাস্থ্য ভালো, বয়সও এমন কিছু একটা হয়নি। এমনও হতে পারে আপনি আর একবার বিয়ে করবেন, ছেলেপুলে হবে—।' বড় কর্তা হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। 'তোদের কথাবার্তার ধরনই আমি বুঝি না রশিদ। আমার ছেলেমেয়ে নেই বলতে চাস? শাহেলি, রবিউল্লা এরা আমার ছেলেমেয়ে নয়?'

মর্জিনা এক বাটি কোর্মা এগিয়ে দেন ডাক্তার চৌধুরীর দিকে। বলেন, 'তোমাকে দিই ডাক্তার সাহেব।'

'সামান্য দাও। হয়েছে, হয়েছে আর না...'

রশিদ সাহেব ভাতে ঝোল মাখতে মাখতে বলেন, 'কি মানুষ ছিলো বড় কর্তা। আর হঠাৎ রাতারাতি কি হয়ে গেল।'

'সবই কপাল...'

রশিদ সাহেব বলেন, 'এখন বড় কর্তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক ঐ সুলতানা পারভিন আর তার বেয়াদব ভাইটা। কোনদিন যা করিনি এখন তাই করতে হবে। নিজেদের সামান্য যা কিছু আছে তারই উপর নির্ভর করতে হবে।

'আর নির্ভর...'

ডা. চৌধুরী আস্তে আস্তে অনেকটা আপন মনে বলার মতো বলেন, 'আমার প্র্যাকটিশ তো কোনদিনই ভালো ছিলো না তোমরা জানো! এ্যাদ্দিন সংসার চলছিল কাঠের গুদামটা দিয়ে। এবার সেটাও গেল। দশটা জাহাজী নৌকায় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার কাঠ চালান যাচ্ছিলো চালনা বন্দরে। সাইক্লোনে দশটা জাহাজই রূপসা নদীতে ডুবেছে। এক ধাক্কায়ই আমি শেষ!'

এই দুর্ঘটনার কথা সবাই জানে। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মর্জিনা বানু বলে, 'তোমার তো তবু শেষ সঙ্গতী রইলো ডাক্তার সাহেব। আমার? বাড়ি ভাড়া থেকে যে দেড়শোটি টাকা মাসে মাসে পাই শ্রেফ সেই আমার সম্বল।'

রবিউল্লা এই আলোচনায় যেন বিব্রত বোধ করছিল। সে বললো, 'সবই ধরুন গিয়ে আমাদের কপালের ফের। এসব বলে কি হবে...'

রশিদ সাহেব বলেন, 'না অভাবের কথা আর বলবো না। রবিউল্লাহ ঠিকই বলেছে। এসব বলে কি লাভ? তার চেয়ে যদি পারি তাহলে ঐ সুলতানা পারভিন আর তার ভাই মাহমুদকে একটু ভালো রকম শিক্ষা দিয়ে গায়ের ঝালটা মেটাবো...'

হঠাৎ ঘরে বজ্র পতন। ভেতরের দরজা দিয়ে বারান্দায় আসে সুলতানা পারভিন ও মাহমুদ। সবাই মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে যায়। কেউ কথা বলতে পারে না...

'বাঃ এ যে দেখছি রীতিমত ভোজের ব্যাপার। এক সুলতানা বাদে চৌধুরী পরিবারের সবাই উপস্থিত...'

মাহমুদ হাসতে থাকে। তার পাশে অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে সুলতানা।

মর্জিনা বানু হঠাৎ অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে ওঠেন। বলেন, 'দয়া করে যদি তোমরা এলেই ভাই তাহলে দাঁড়িয়ে কেন? বসো। আমাদের সঙ্গে চাট্টে ডাল ভাত যা হোক...'

সুলতানা বলে, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না আপা। আমরা এই একটু আগে খেয়েছি।'

একটু থেমে বলে, 'খুব অসময়ে এসে পড়েছি দেখছি।'

'না, না। সে কি।'

মর্জিনা বানু বিনয়ে একেবারে বিগলিত, সময় অসময়ের কথা কি বলছো ভাই। এ হলো গিয়ে তোমার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়িতে আসবে তার আবার সময় অসময় কি?

'তা তো বটেই।'

মাহমুদ মাথা নাড়ে, বলে, 'সুলতানা এসেছে আপনার শান্তি নিকেতন ফেরত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে। বোধহয় নিয়ম মতো আপনার মেয়েরই যাওয়া উচিত ছিলো। তা মোহাম্মদ যদি পর্বতের কাছে না যায় তো পর্বতকেই মোহাম্মদের কাছে আসতে হয়। কি বলেন?'

রাবেয়া সৈয়দ বলেন, 'তা দাঁড়িয়ে কেনো ভাই মাহমুদ? তোমরা বসো।'

সুলতানা বললো, 'আপনারা খান। আমরা ততক্ষণ পাশের ঘরে বসছি।'

শাহেলির খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে বললো, 'চলুন চাচীমা আমরা ওই ঘরে গিয়ে বসি।'

খাওয়ার পর সবাই বসবার ঘরে ঢোকে। একথা ওকথা নিয়ে গল্প জমে উঠে। রশিদ সাহেব তাকিয়েছিলেন সুলতানা পারভিনের দিকে। মনে মনে বলছিলেন, 'সুলতানা পারভিন, তুমি সত্যি একজন পাকা অভিনেত্রী। অসময়ে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছো নিশ্চয়ই কোনো মতলবে, অথচ ভাবখানা দেখাচ্ছো তোমার মতো সরল আর নিরীহ মেয়ে হয় না! হুঁ।'

মর্জিনা বানু পানের বাটা আনলেন। পান মুখে দিয়ে মেয়েরা ছেলেরা কখন অজান্তেই দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। পুরুষেরা বসেছেন সোফা ও কৌচে ছড়িয়ে, মেয়েরা বসেছেন এক কোণে দূরে। কিভাবে কিভাবে যেন শিকারের গল্প উঠলো। মাহমুদ বললো, 'যাই বলেন মানিকপুরের শাল মহুয়ার জঙ্গলে একদম কিচ্ছু মেলে না। দু'দিন শিকার করতে গিয়েছি, দুদিনই ফাক্কা। মেরেছিলাম গোটাকতক হরিয়াল আর ঘুঘু। হ্যা, মানিকপুরে ঘুঘু আছে বটে। প্রচুর ঘুঘু। তা ঘুঘু মারতে মন্দ লাগে না...'

রশিদ সাহেব বলেন, 'শিকারে খুব ওস্তাদ বুঝি আপনি? অপেক্ষা করুন, পীরগঞ্জের টিলা থেকে মাঝে মাঝে চিতা বাঘ আসে। একদিন ঠিক নিসে যাবে দেখবেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। ঘুঘু মেরে মেরে বিরক্ত হয়ে গেছি।'

রশিদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসে মাহমুদ, 'চিতা বাঘের খবরটা দেয়ার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হঠাৎ রবিউল্লাহকে সে প্রশ্ন করে, 'আপনি শিকার টিকার করেন না?'

'জ্বি না...'

'বলেন কি?'

মাহমুদ অবাক হবার ভান করে। বলে। 'শিখবেন?'

রবিউল্লাহ কোনমতে বিরক্তি চেপে বলে, 'তা শিখলে নেহায়েত মন্দ হতো না। কিন্তু কাজকর্ম ফেলে শিকার করার সময় কোথায় বলুন?'

'স্ট্রেঞ্জ!'

মাহমুদ হো হো করে হেসে ওঠে।

এ পাশে গল্প চলছিল মেয়েদের। বেগম রশিদ সুলতানাকে বলছিল, 'শুনলাম তুমি নাকি ঢাকা চলে যাবে?'

'না! কে বলেছে...'

সুলতানা অপ্রতিভ হাসলো, 'বেশ তো আছি মানিকপুরে।'

রাবেয়া সৈয়দ একমনে দেখছিলেন সুলতানাকে। হঠাৎ তিনি বলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী আলাপ আছে সুলতানা। তুমি কি কাল দুপুরবেলা বাড়ি থাকবে?'

'হাঁ থাকবো।'

'তাহলে একবার যেতে পারি।'

'আসবেন। আমি বাড়ি থেকে বেরোই কালে ভদ্রে।'

এদিকে ডাক্তার চৌধুরী জমিয়ে তুলেছিলেন মাহমুদের সঙ্গে। বলছিলেন, 'কবে ছিলে বলছো, পঞ্চাশে?'

'হ্যাঁ, ফিফটি থেকে ফিফটি-ফাইভের মধ্যে। রবার্ট হেনরী নামে এক ইংরেজ এই দলটা গঠন করেছিলেন। প্রথম ঐ দলে আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। পরে আমার সাহস ও কার্য-কুশলতা দেখে হেনরী আমাকে ঐ দলের ডেপুটি চীফ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি দল ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

'দলটা যেন কিসের বললে?'

'ডাকাতির। বুঝলেন না? আমরা আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূলে ডাকাতি করে বেড়াতাম। রাহাজানি, খুন, জখম এসব ছেলেখেলা ছিলো আমাদের কাছে।'

সবাই স্তব্ধ হয়ে মাহমুদের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল। লোকটা বলে কি?

ডাক্তার চৌধুরী যথেষ্ট মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'তা এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে খুব ভালো করেছো ভাই।'

'ছেড়েছি বটে, কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিয়েছি তা আপনাকে কে বললো। দরকার হলেই আবার ধরবো।'

মাহমুদের কথাবার্তার ভেতর কেমন একটা রহস্য-রহস্য ভাব। আর লোকটার ভেতর ভদ্রতা বলতে কিছু যদি থাকতো! দেখতেও অসম্ভব রকমের জটিল চেহারা। গায়ের ফর্সা রংটা পুড়ে গিয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। চোখ দুটি ভয়ঙ্কর। খুনীর

চোখের মতো সর্বদাই ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে।

এপাশে তখন মেয়েদের মধ্যে সুলতানাকে ঘিরে প্রশংসা ও তোষামোদের ঝড় উঠেছে। বেগম রশিদ বলছিল, 'আমি ভাই একমুহূর্ত তোমার কথা ভুলতে পারি না। আহা, এই তো বয়স। এই বয়সেই...'

মর্জিনা বানু প্রায় হাহাকার করে বলেন, 'কতো যে আল্লার কাছে মোনাজাত করি সুলতানার জন্যে। এমন রাণীর মতো চেহারা,...আহা রে...'

সুলতানা অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকে। কি করবে বুঝতে পারে না।

ওদিক থেকে মাহমুদের গলা ভেসে এলো, 'সুলতানা, এবারে চলো বেরোই... অনেক তো গল্প হলো...'

'আর একটু বসবে না ভাই?'

মর্জিনা বানু মিনতি করেন!

'সুলতানা বসতে চায় বসতে পারে...আমার কাজ আছে। আমাকে উঠতে হবে।'

সুলতানার মুখ শুকিয়ে যায়। সে পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ায়! বলে, 'আমি যাই, আর একদিন আসবো। শাহেলি, সময় করে এসো আমার ওখানে। গল্প করবো, কেমন?'

মাহমুদের পেছনে পেছনে সুলতানা চলে যায়। সকলেই বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেইদিকে। সারা–ঘর নীরব, নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটা ফিসফিস শব্দ শুনে শাহেলি ফিরে তাকালো। দেখলো বেগম রশিদ সাহেবের কানে কানে কি যেন বলছে আর রশিদ সাহেব মাথা নাড়ছেন।

হঠাৎ বেগম রশিদ বলে, 'আমরা এখন উঠছি মেজো আপা।'

'এখনই? বলো কি ছোটো বৌ?'

'হ্যাঁ, উঠতে হবে। কাজ আছে।'

'আমরাও উঠছি...'

মিষ্টি হাসলেন রাবেয়া সৈয়দ। বললেন, 'শাহেলিকে নিয়ে আমার ওখানে আসবেন আপা। কই গো; তুমি উঠছো না যে?'

'হ্যাঁ, এই তো...চলো।'

ডাক্তার চৌধুরী সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান। চৌধুরী পরিবারের দুই জোড়া মানুষ নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। গেট পেরোয়। শাহেলি লক্ষ্য করে রাস্তায় নেমেই দু'দল দু'দিকে চলে গেলেন। বেগম রশিদ ও রশিদ সাহেব গেলেন সুলতানারা যে পথে গিয়েছে সেই পথে।

মর্জিনা বানু কেমন একটা হিংস্র দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যে উদ্দেশ্যে

দুপুর বেলা চৌধুরী পরিবারের সকলকে বাড়িতে জড়ো করেছিলেন, শাহেলিকে দেখতে আসার নামে সুলতানা ও তার ভাই মাহমুদ সেই উদ্দেশ্যটা মাটি করে দিয়ে গেল।

মর্জিনা বানু আপন মনে গজরাতে থাকেন।

শাহেলি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। হঠাৎ তার চোখ গেল রাস্তার দিকে আর রীতিমত চমকে উঠলো সে। দেখলো রাস্তার পেছনে একটা লাল মাটির উঁচু টিলার উপর একটা কালো আলখাল্লাধারী লোক তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে। লোকটা যেমন দীর্ঘ তেমনি বলিষ্ঠ। শাহেলি তার দিকে তাকাতেই সে রাস্তার ছায়ায় মিশে গেল।

শাহেলি এই আলখাল্লাধারী মূর্তিটিকে আগেও দু'একদিন দেখেছে। লোকটা ছায়াবাজির মতো, এই আছে এই নেই। শাহেলি অনুভব করলো একটা ভয়ঙ্কর রহস্য আস্তে আস্তে ধূমায়িত হয়ে উঠছে মানিকপুরে।

দুই

পরদিন সকালবেলা বসবার ঘরে সুলতানার সামনে বসে বার বার থতমত খাচ্ছিলেন মর্জিনা বানু। কথাটা কিভাবে ওঠাবেন বুঝতে পারছিলেন না। শেষে মরিয়া হয়ে বলেই ফেললেন।

'তোমার কাছে এসেছি কিছু টাকার জন্যে। আমার অবস্থা তো জানো। দুটো ভাঙাচোরা বাড়ি আছে, ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে দেড়শোটি টাকা পাই। কিন্তু এই চড়া বাজারে দেড়শো টাকা দিয়ে কি হয় বলো তো ভাই?'

সুলতানা শুধু অবাক হয়ে বললো, 'টাকা?'

'হ্যাঁ অল্প কয়েকটা টাকা, ধরো হাজার পাঁচেক। টাকাটা তোমার পক্ষে সামান্যই।'

মর্জিনা বানু কাকুতি-মিনতি করেন, 'বাজারে আমার দেনার অন্ত নেই সুলতানা। তোমার কাছ থেকে টাকাটা পেলে দেনার কিছুটা শোধ করে দিতাম। আমার ইজ্জত বাঁচতো। বুঝলে তো কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে তিন মাসের কড়ারে টাকা কর্জ করেছিলাম। টাকা শোধ করতে পারিনি। শুনছি, কাবুলিওয়ালা নাকি বেইজ্জত করবে বলে বেড়াচ্ছে…'

সুলতানা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

'তুমি তো জানো ভাই, বড় কর্তার আমলে আমার সংসারের অর্ধেক খরচ বরাবরই উনি দিতেন। চাইতে হতো না, না চাইতে দিতেন। বড় কর্তা নেই। কিন্তু তুমি তো আছো? এই বিপদে আর কোথায় যাই বলো?'

সুলতানা বললো, 'কিন্তু টাকা…'

'মেয়েটা শান্তিনিকেতনে পড়ছিল। বড় কর্তার কতো সাধ ছিলো তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবেন। কিন্তু পোড়া কিসমতের জন্যে কিছুই হলো না। মেয়েটাকে পরীক্ষার আগেই ফিরিয়ে আনতে হলো।'

মর্জিনা বানুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। আপন মনে বলেন, 'আজ বড় কর্তা যদি বেঁচে থাকতেন…'

সুলতানা ছটফট করে উঠলো। এসব টাকার বেড়াজালে পড়ে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। সে অস্থির চোখে তাকালো মর্জিনা বানুর দিকে। বললো, 'কিন্তু আমি তো বড় কর্তার মতো মাসে মাসে আপনাকে টাকা জোগাতে পারবো না। বড় জোর এবারের মতো কিছু টাকা…ধরুন হাজার দুই টাকা আপনাকে দিতে পারি। নেবেন?'

'দু' হাজার…'

ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হলো মর্জিনা বানু যেন হতাশ হয়েছেন। কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে তিনি খুশি। কিছু যে পাওয়া যাচ্ছে এই যথেষ্ট। সুলতানা টাকা না দিলে কি করতে পারেন তিনি? সত্যি বলতে কি টাকা পাওয়ার এক বিন্দু আশাও তিনি করেননি। মাহমুদকেই তার ভয় ছিলো। মাহমুদ বাড়িতে নেই জেনেই সুলতানার কাছে টাকার কথাটা পেড়েছেন। এখন যা পাওয়া যায় তা নিয়ে মানে মানে সরে পড়াই ভালো।

ভেতরে ভেতরে মর্জিনা বানু খুব খুশি। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করবেন না। একটু হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক আছে ভাই বড় বৌ। তা-ই না হয় দাও। কি কপাল নিয়েই যে এসেছিলাম। তোমাদের এক বিন্দু উপকারে লাগলাম না। মাঝখান থেকে তোমাদের শুধু ঝামেলায় ফেলছি।

'আপনি বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।'

সুলতানা অস্থির পায়ে উঠে নিজের ঘরে যায়। ফিরে আসে একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে। একশো টাকার কুড়িখানা নোট। মর্জিনা বানুর হাতে টাকাটা দিয়ে বলে, 'এই নিন। টাকার কথাটা দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। আর, আর, টাকার জন্য কখনো আসবেন না।'

মনে মনে হাসেন মর্জিনা বানু। পরের কথা পরে। এখন তো ওঠা যাক। মুখে বলেন, 'কিছু মনে করো না ভাই বড় বৌ। ভিক্ষার কপাল নিয়ে এসেছি। তোমাদের বিরক্ত করা ছাড়া উপায় কি?'

সুলতানা কিছু বললো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'তাহলে এখন আসি। মেয়েটা বাড়িতে একলা আছে।'

'আসুন। আবার আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসবো। এ হলো গিয়ে বড় কর্তার বাড়ি।'

মর্জিনা বানু এক গাল হাসলেন, 'নিজের বাড়ির ভাড়া। নিশ্চয়ই আসবো।'

বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন। গেটের কাছে এসে দেখা হলো মাহমুদের সঙ্গে। মাহমুদের হাতে একটা দো-নলা বন্দুক। মর্জিনা বানুকে দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। ঠোঁট-জোড়া শক্ত হয়ে উঠে।

'এই যে মাহমুদ! কেমন আছো ভাই! শরীর-টরীর ভালো তো? মর্জিনা বানু যেন ভ্রাতৃ বিগলিত হয়ে পড়েন। মাহমুদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মর্জিনা বেগমের দিকে তাকায়। দেখেই চেনা যায় বুড়ি একটা পাকা ঘুঘু। সে বলে, 'কেমন আছি জিজ্ঞেস করছেন তো? ভালো নেই। এই দেখুন না। শিকারে বেরিয়েছিলাম। একটা কিছুও মেলেনি। গুলি ভর্তি বন্দুক যেমন ছিলো তেমনই আছে। এখন ভাবছি গুলি দুটো খরচ করি কোথায়? আমার হাতটা নিসপিস করছে…'

'আমি যাই এখন…'

মর্জিনা বেগমের গলার স্বর কাঁপতে থাকে, 'আমার অনেক কাজ আছে ভাই…আমি গেলাম।'

পেছনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে মাহমুদ। বুড়ী আচ্ছা ভয় পেয়েছে যা হোক। এবার সে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢোকে। আস্তে আস্তে তার চোখ-মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বন্দুক যথাস্থানে রেখে সে সুলতানার ঘরে ঢোকে।

সুলতানা মুখে হাসি টেনে এনে বলে, 'এসো শিকার-টিকার মিললো কিছু?'

'না। মানিকপুরে অনেক মানুষ শিকার আছে। কিন্তু মেরে আনন্দ পাওয়া যায় এমন পাখি একটাও নেই। পীরগঞ্জের টিলা থেকে কখন চিতাবাঘ বেরোয় তার অপেক্ষায় আছি।'

মৃদু হাসলো মাহমুদ। একটা কোচের উপর বসলো। বসে পা নাচাতে লাগলো একদৃষ্টে সুলতানার দিকে তাকিয়ে। ভয়ে ফ্যাকাসে দেখায় সুলতানার মুখ।

'সুলতানা।'

'বলো।'

'ওই বুড়ি তোমার কাছে কেন এসেছিল, টাকা চাইতে না?'

'হ্যাঁ।'

'এবং দয়ার শরীর তোমার, টাকা চাইতেই দিয়ে ফেলেছো, তাই না?'

'খুব কাকুতি মিনতি করছিল আমার কাছে। বলছিল টাকা না দিলে নাকি ইজ্জত যায়।'

'ইজ্জত যায়? চমৎকার! মানিকপুরের চৌধুরী বংশের মান ইজ্জত রাখার ভার তো তোমারই উপর! হুঁ! তা কতো টাকা দিয়েছো।'

সুলতানা ভয়ে ভয়ে বললো, 'দু'হাজার।'

'ভালো।'

মাহমুদ তীক্ষ্ণ গলায় মন্তব্য করে, 'ভবিষ্যতে তোমার কি হবে জান সুলতানা? চৌধুরী পরিবারের লোকেরা দল বেঁধে তোমার কাছে আসবে টাকা চাইতে। টাকা দাও ভালো। না দিলে ডাকাতি করবে। তোমাকে খুন করবে টাকার জন্যে।'

সুলতানা আর্তনাদ করে উঠলো। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হা হা করে হেসে উঠলো মাহমুদ। বললো, 'ওদের কিছু দোষ নেই। সুযোগ পেলে সবাই তা-ই করে। আমিও এ-ই করতাম।'

একটু থেমে সে বলে, 'তোমাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে পারলে চৌধুরী পরিবারের লাভটা কি দেখেছো? তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই তারা রাতারাতি বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়...'

সুলতানা পাথরের মতো অনড় ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাহমুদ শান্ত গলায় বলে, 'সুতরাং আমি যা বলি বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করাই কি তোমার উচিত না সুলতানা?'

অস্ফুট গলায় সুলতানা বলে, 'তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, কিন্তু দোহাই তোমার, ওসব ভয়ানক কথা আমাকে আর শুনিয়ো না।'

'বেশ, শোনাবো না।'

মাহমুদ হাসলো মৃদু। বললো, 'মনে রেখো আমি ছাড়া এই দুনিয়ার সবাই তোমার শত্রু। কাউকে দয়া করতে যেয়ো না। বিশ্বাস করতে যেয়ো না।'

'আমি তা-ই করবো, বিশ্বাস করো তাই করবো।' কথা বলতে বলতে মাহমুদের নিকটবর্তী হয় সুলতানা। বলে, 'এখন তো আমাদের অনেক টাকা। চলো না কোথাও বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'যাহোক কোথাও। এই মানিকপুরে থেকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চক্রান্ত ছাড়া আর কোনো খবর নেই এখানে। চলো আমরা অনেক দূরে কোথাও চলে যাই।'

'যাব সুলতানা। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল। জালটা একটু গুটিয়ে আনতে পারলেই চলে যাব মানিকপুর থেকে।'

সুলতানা বলে, 'চৌধুরীরা ষড়যন্ত্র করছে তা কি বুঝি না ভেবেছো, সব বুঝি! চৌধুরীদের প্রত্যেকটা লোক ভয়ঙ্কর।'

মাহমুদ বলে, 'মানিকপুরের চৌধুরীদের কুটিল বুদ্ধি যথেষ্ট আছে তা আমি স্বীকার করি সুলতানা। কিন্তু ওদের আমি থোড়াই কেয়ার করি···আমি যাকে ভয় করি সুলতানা, তার নাম কুয়াশা। চমকে উঠো না...কুয়াশা মানিকপুরে আছে, আমার সব দুর্বলতা ওর জানা···কুয়াশার সাথে আমার লড়াই চলছে সুলতানা···'

মাহমুদ কোচ থেকে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'লড়াই ফেলে আমি কখনো পালিয়ে যাই না সুলতানা। তুমি তো জান এ আমার স্বভাব নয়। মানিকপুরে কিছুদিন আমাদের থাকতেই হবে।'

সুলতানা বলে, 'কিন্তু কদ্দিন?'

'তা আমি নিজেই জানি না, তোমাকে বলবো কি করে?' মাহমুদ হাসে। এগিয়ে এসে সুলতানার কাঁধে হাত রাখে। স্নেহের সুরে বলে, 'তুমি ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি। যতক্ষণ আমি তোমার পাশে আছি ততক্ষণ কারো সাধ্য নেই তোমার একটুকু ক্ষতি করে। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

দরজার কাছে পদশব্দ শোনা গেল।

'বড় বৌ, আছো নাকি?'

সুলতানা মাহমুদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়।

মাহমুদ বলে, 'কে?'

এক মুখ মিষ্টি হাসি নিয়ে ঘরে ঢোকেন রাবেয়া সৈয়দ। বললেন, 'ভাই-বোন দুজনেই আছো দেখছি। বিরক্ত করলাম না তো?'

অজান্তেই বিনীত হয়ে ওঠে সুলতানার চোখ-মুখ। সারা মানিকপুরে রাবেয়া সৈয়দের মতো মানী-গুণী মহিলা একটিও নেই। প্রথম দেখায়ই কেমন একটা সম্ভ্রম বোধ জাগে মহিলাকে দেখে। সুলতানা এগিয়ে আসে, বলে, 'না, না, কিসের বিরক্ত করলেন। ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করছিলাম। আপনি বসুন আপা···'

মাহমুদ কথা বলে না। সে গিয়ে দাঁড়ায় দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে। হেমন্তকাল মাত্র শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে গাছ-গাছালির সবুজ রং-ধূসর হয়ে উঠছে একটু একটু।

রাবেয়া সৈয়দ বসলেন। দেখেই বোঝা যায় এই মহিলা অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসী আর দৃঢ় স্বভাবের।

ভূমিকা ছাড়াই রাবেয়া সৈয়দ শুরু করলেন, 'আমার কারবারের লোকসানের কথা নিশ্চয়ই শুনেছো সুলতানা? ছোট কারবার, পুঁজি পাটা যা ছিলো সব নৌকা-ডুবিতে শেষ। এখন তুমি যদি কিছু টাকা ধার দাও তাহলে কারবারটা আবার শুরু করতে পারি।'

মাহমুদ এদিকে ফিরে তাকায়। শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বলে, 'same old

story. টাকা চাইতে এসেছেন?'

'চাইতে নয়, ধার করতে।'

'একই কথা।'

মাহমুদ এগিয়ে এসে কোচের উপর রাবেয়া সৈয়দের মুখোমুখি বসলো। বললো, 'এসব ব্যাপারে সুলতানার কিছু বলার নেই। আমি তার গার্জিয়ান। যা বলার আমাকে বলুন।'

'বেশ তো, তোমাকেই বলছি। তুমি আমাদের বাড়ি বন্ধকীর উপর হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার দাও।'

'পঞ্চাশ হাজার?'

মাহমুদ ঠাট্টার দৃষ্টিতে রাবেয়া সৈয়দের দিকে তাকায়। বলে, 'আমাদের প্রচুর টাকা আছে সত্যি। কিন্তু টাকা থাকলেই টাকা আপনাকে দেবো এমন ভরসা আপনি কোথেকে পেলেন?'

রাবেয়া সৈয়দ মাহমুদের অভদ্র কণ্ঠস্বরে প্রথম একটু যেন চমকে গেলেন। সেটা কাটিয়ে উঠতে তার দেরি হলো না। স্বভাব সিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, 'বাঃ, এ কেমন কথা বলছো মাহমুদ! তোমার টাকা আছে, আমি তোমাদের গরীব আত্মীয়, ঠেকায় পড়ে তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবো এতে অবাক হওয়ার কি আছে?'

'না, অবাক হইনি। কিন্তু শুনুন, আত্মীয় বলে অতো ভড়ং আর না–ই করলেন। আপনাদের আত্মীয় বলে আমি স্বীকার করি না...'

'বটে!'

এক ধরনের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো রাবেয়া সৈয়দের চোখে মুখে। বললেন, 'যে আলী নকীবের টাকা পেয়ে অতো অহঙ্কার, তারই আত্মীয়কে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে এতো আপত্তি! বাঃ, এরই নাম বোধহয় কৃতজ্ঞতা!'

'হ্যা। মনে করুন তাই।'

মাহমুদের চোখমুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। বলে, 'আলী নকীব তো বহুদিন এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে। সবাই মিলে লুটেপুটে খেয়েছে বুড়োকে। বুড়ো অক্কা পেয়েছে, আগের জের আর এখন টেনে লাভ নেই মিসেস চৌধুরী। দাও দাও, খাই খাই ব্যবসা আলী নকীবের সঙ্গে সঙ্গেই খতম। এখন যে যার পথ দেখলেই ভালো হয়।'

অপমানে লাল হয়ে ওঠে রাবেয়া সৈয়দের মুখ। ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুলতানা। কিন্তু কোনদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই মাহমুদের। নিষ্ঠুর ভাবে রাবেয়া সৈয়দকে বলে, 'আপনার ব্যবসা চলুক না চলুক তা নিয়ে সুলতানার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই মিসেস চৌধুরী। সুলতানার টাকা আপনাদের মতো লোভীদের পেট ভরার জন্যে

নয়।'

রাবেয়া সৈয়দ বলেন, 'অনেকে বলতো বটে তুমি বেয়াদব। কিন্তু এতোটা তা ভাবিনি।'

'ও, আমি বেয়াদব? তা আমাকে কি রকম আশা করেছিলেন শুনি? টাকা চাইছেন শুনে ধন্য হয়ে যাবো, বিনয়ে গলে গিয়ে চেয়ার এগিয়ে দেবো, এই ভেবেছিলেন?'

রাবেয়া সৈয়দ উঠে দাঁড়ালেন। স্থির ও শান্ত গলায় বললেন। 'মাহমুদ, আমি টাকা ধার করতে এসেছিলাম। ভদ্রভাবেও সেটা 'না' করতে পারতে।'

'ভদ্রভাবে, হুঁ। নাম মাত্র পরিচয় নিয়ে যারা টাকা চাইতে আসে তাদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা। এই তো কিছুক্ষণ আগে মর্জিনা বানু এসে সুলতানাকে ধাপ্পা দিয়ে দু'হাজার টাকা নিয়ে গেছে। আপনি তো সোজা কথায় ডাকাতি করতে এসেছেন, আপনার সঙ্গে ভদ্রতা কি?'

বিচিত্র এক ক্রোধ নীল হয়ে ফুটে উঠলো রাবেয়া সৈয়দের চোখে মুখে। সুলতানা দেখে শিউরে উঠলো। রাবেয়া সৈয়দ বললেন, এই অপমান আমি সহ্য করবো না মাহমুদ। মনে রেখো।

অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সুলতানা। বলে, 'ভাইয়া, ওকে ফিরতে বলো।'

রাবেয়া সৈয়দ বললেন, 'যে কোনো ক্ষতির জন্যে প্রস্তুত থেকো। আজ পর্যন্ত কখনো কাউকে ক্ষমা করিনি আমি।'

রাবেয়া সৈয়দ স্থির পায়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। এক মুহূর্তকাল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মাহমুদ। তারও একটু একটু মনে হচ্ছিলো কাজটা তেমন ভালো হয়নি। সাপের মধ্যে বিষধর নাগিনী যে জাতের, মেয়ে মানুষের ভেতর রাবেয়া সৈয়দ সেই জাতের। রাগে ও উত্তেজনার মাথায় মাহমুদ আসলে কাল-নাগিনীর ছোবলটাকেই জাগিয়ে দিয়েছে। এখন সবরকমে প্রস্তুত থাকতে হবে। এতদিন ভদ্র ও মিষ্টি হাসিতে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন রাবেয়া সৈয়দ। এখন ছদ্মবেশ খুলে বেরিয়ে পড়েছে তার আসল স্বভাব।

আমি প্রস্তুত। মাহমুদ যেন নিজেকে ভরসা দেবার জন্যেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মনে মনে বললো। রাবেয়া সৈয়দ, আপনি মাহমুদকে চেনেন না। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য স্বর্ণ-উপকূলে ডাকাতি করে বেড়িয়েছে সে। তাকে চোখ-রাঙালেই সে ভয় পাবে এমনটা আশা করা অন্যায়। বেশ তো, আসুন এক চক্কর হয়ে যাক।

সুলতানা এগিয়ে এসে ভীরু গলায় বললো, 'একি করলে তুমি?'

'ঠিক করেছি।'

'জানো, আমার মনে হচ্ছে...'

'তোমার কি মনে হচ্ছে তা আমি জানি সুলতানা। তুমি আসলে ভয় পেয়েছো। কিন্তু অতো সহজে ভয় পেলে কি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে? লড়াই তো সবে মাত্র শুরু হলো…'

মাহমুদ হাসে, 'অপেক্ষা করো। দেখো…।'

তিন

রবিউল্লাহ্‌র ফার্ম দেখতে বেরিয়েছিল শাহেলি।

দু'ধারে পাতাবাহার রোডের বিচিত্র বর্ণালী। রাস্তা পার হয়ে মাঠে নামলো ওরা। সুন্দর, উজ্জ্বল দিন। মিষ্টি বাতাস বইছে। শাহেলির ভালো লাগছিল খুব।

রবিউল্লাহর পাশাপাশি হাঁটছিল সে। হঠাৎ দেখলো একটা লোক রাস্তার ঝাঁকালো কড়ুই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শাহেলি তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই লোকটা এগিয়ে এলো সামনে। লোকটার বয়স চল্লিশের দিকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বাঁ' চোখের নিচে একটা গভীর কাটা দাগ। লোকটার পিঠে একটা ঝুলি, হাতে একটা তারের বেহালা।

'চলছে না স্যার।'

বুরুজ মিঞা আকর্ণ বিস্তীর্ণ হাসি হাসলো, 'গত পরশু টাউনের বাজার থেকে মোট তিন টাকার মাল এনেছিলাম। তা বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, এই দেড় দিনে মাত্র আট আনার বিজিনেস করেছি।'

রবিউল্লাহ মাথা নাড়ে। বলে, 'আমি বলেছিলাম না মিঞা মানিকপুরে তোমার তারের বেহালা চলবে না?' এখন দেখলে তো?

'দেখলাম মানে? হাড়ে হাড়ে বুঝলাম স্যার। বললে বিশ্বাস করবেন না, কাল রাত থেকে উপোষ মারছি।'

একটু হাসলো বুরুজ মিঞা। বললো, 'সবই কপালের দোষ বুঝলেন না? মানিকপুরে তারের বেহালা বিক্রি করতে এসে লোকসান তো লোকসান, এখন পুঁজি নিয়ে টানাটানি। দিন স্যার একটা সিগারেট দিন। বড় তেষ্টা লেগেছে।

রবিউল্লাহ পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা বুরুজ মিঞাকে দিলো। শাহেলির বিরক্তি লাগছিল একটা পথের লোকের সঙ্গে রবিউল্লাহকে আলাপে জমে উঠতে দেখে। অনেক কষ্টে সে বিরক্তি চেপে রেখেছিল।

বুরুজ মিঞা সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলো না। সিগারেটটা লোলুপ নয়নে দেখতে দেখতে বলে, 'কই স্যার, দিন।'

'আবার কি দেবো বুরুজ মিঞা?'

'ঘোড়া দিলেন স্যার, চাবুক দেবেন না? ম্যাচটা দিন।'

রবিউল্লাহ পকেট থেকে ম্যাচ বের করে বুরুজ মিঞাকে দিলো। সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বুরুজ মিঞা বলে, 'আপনাদের স্যার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। ঐ আমার এক দোষ স্যার, কথা কিছুতেই কমিয়ে বলতে পারি না। এজন্যে আমার ওস্তাদ কি করেছেন জানেন? তাহলে ঘটনাটা স্যার খুলেই বলি।'

'না হে,' রবিউল্লাহ বাধা দেয়, 'এখন ধরোগে তোমার গল্প শোনার ফুরসত নেই। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি ফার্ম দেখাতে। আরেক সময় তোমার গল্প শুনবো।'

'আচ্ছা স্যার, সেই ভালো। আমি বরং সন্ধ্যের দিকে আপনার ওখানে যাবো।'

বুরুজ মিঞা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে মাঠ ছেড়ে রাস্তার দিকে চলে যায়।

আবার হাঁটতে থাকে ওরা। রবিউল্লাহ বলে, 'লোকটা খুব গুণী বুঝলে তো? যেমন সুন্দর বেহালা বাজায়, তেমন সুন্দর স্বভাব। দোষের মধ্যে মাথায় একটু ছিট আছে।'

শাহেলি কিছু বলে না। কিন্তু রবিউল্লাহর অস্বাভাবিক সৌজন্য বোধ দেখে মনে মনে একটু অবাক হয়। ছোট বেলা থেকেই রবিউল্লাহ ভীষণ হিসেবী ছেলে। ধীর স্থির স্বভাব, কথা বলে কম। আবেগের ছিটে ফোঁটা ওর মনে আছে কিনা সন্দেহ। নামহীন, গোত্রহীন বুরুজ মিঞার প্রতি এহেন রবিউল্লাহর ব্যবহার তাই তাকে বিস্মিত করে তোলে।

কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করে না। রবিউল্লাহর পাশে হাঁটতে থাকে।

প্রকাণ্ড মাঠ জুড়ে রবিউল্লাহর ফার্ম। দিগন্ত বিস্তৃত ধানী জমিতে সবুজ আমন ধানের শিষ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ধানের কাঁচা জমিতে সবুজ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। খামার বাড়ির পিছনে সব্জি ও কলা বাগান। কলা বাগানের ঠিক গা ঘেঁষে বিরাট এক দীঘি। দীঘির উঁচু পাড়ে আখ খেত।

'এই আমার জমিদারী,'

রবিউল্লাহ একটু গর্ব মিশ্রিত লজ্জার হাসি হাসে, 'চাকরি-বাকরি করার চেয়ে ধরোগে তোমার, এটা অনেক ভালো।'

'অনেক।'

শাহেলি সায় দেয়, বলে, 'দোষের মধ্যে সবাই তোমাকে চাষা বলে ঠাওরাবে।'

রবিউল্লাহ রাগ করে না। শাহেলির ঠাট্টা সহজ ভাবেই গ্রহণ করে। বলে, 'চাষা বলে বলুক না। তাতে ক্ষতিটা কি হচ্ছে। গায় তো আর ফোস্কা পড়ছে না।'

রবিউল্লাহ বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক। শাহেলি মনে মনে স্বীকার করে। মিথ্যে দুর্নাম

ও সহজ প্রশংসার ধার ধারে না সে। নিজের লাইনে রবিউল্লাহ উন্নতি করবে এ একেবারে অবধারিত।

রবিউল্লাহ্ বলে, 'ধানী জমি দেখলে, এবারে চলো আখ-খেত দেখিয়ে আনি।'

শাহেলি ইতিমধ্যে ক্লান্ত। বললো, 'না, এবারে বাড়ি ফিরবো।'

'বলো কি, এক্ষুণি? ঠিক আছে, চলো আমার খামার বাড়িতে বসবে কিছুক্ষণ।'

খামার বাড়িতে ওরা কিছুক্ষণ বসলো। রবিউল্লাহর খামার বাড়ির কিষাণ আবদুল বাগানের পেঁপে কেটে খেতে দিলো শাহেলিকে। বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে এক কাঁদি সাগর কলা গাছ থেকে পেড়ে সামনে রাখলো।

রবিউল্লাহ তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুলে বলছিল শাহেলিকে। ভবিষ্যতে উত্তর চকের রাজা সাহেবের পুরো মাঠটাই ফার্মের জন্যে নেবে বলে আশা রাখে রবিউল্লাহ। মাটি যে রত্নগর্ভা তা সে ভালো করেই জেনেছে। এই মাটিতে সোনা ফলিয়েই আগামীতে সে চৌধুরী আলী নকীবের মতো বিত্তশালী হওয়ার আশা রাখে।

আশা করাটা খুব কি বোকামি? চৌধুরী আলী নকীবের মতো অতোটা না হোক, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারে সেই পরিমাণ বিত্তও কি মাটি থেকে পারবে না অর্জন করতে?

রবিউল্লাহ্ প্রায় অনেকটা আপন মনেই কথা বলছিল। চিরদিনের হিসেবী ছেলেটা যেন হঠাৎ একটা ধাঁধায় পড়ে স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। টাকা চাই। স্বাচ্ছন্দ্য চাই। সুখ ও শান্তি চাই। রত্নগর্ভা মাটি কি সেই অর্থ ও মোক্ষ দেবে না জীবনে?

রবিউল্লাহ কোন জবাবের আশা না করেই আপন মনে বলছিল। শাহেলি শুনছিল কথাগুলি আর নিঃশব্দে হাঁটছিল। খামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তখন তারা মাঠে নেমেছে। পেছনে কলার কাঁদি নিয়ে আসছে কৃষাণ আবদুল। বেলা একটার কম নয়। মাথার উপর সূর্য জ্বলছে। খোলা মাঠে হাওয়া ঝিরঝির করছে।

এমন সময় পেছনে একটা যান্ত্রিক ঘড়ু ঘড়ু ঘড়ু আওয়াজ পাওয়া গেল। দূর থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে দেখা গেল একটা বৃহৎ মোটর বাইককে। আশ্চর্য, বাইকটা এসে থামলো শাহেলির ঠিক পাশে। আরো আশ্চর্য, ফাইভ হাণ্ডরেড সি. সি. মিলিটারী মডেলের ট্রায়াম্প বাইকটির মালিক মাহমুদ হাসছিল শাহেলির দিকে তাকিয়ে।

বেপরোয়া উচ্ছৃংখল হাসি। শাহেলি অবাক, রবিউল্লাহও। কিষাণ আবদুল কলার কাঁদি নামিয়ে রাখলো মাটিতে। এই সাহেবটা ভীষণ রগচটা আর খামখেয়ালী। মানিকপুরে এসেছে ছ'মাসও হয়নি, এরই মধ্যে তার স্বভাব জানতে কারো বাকি নেই। মোটর বাইক নিয়ে যখন পেছনে ধাওয়া করেছে তখন একটা না একটা মতলব আছে নিশ্চয়ই। আর সেটা যদি ভয়ঙ্কর কিছুও হয় তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং

কলার কাঁদি নামিয়ে অপেক্ষা করাই ভালো।

কিন্তু না, তেমন ভয়ঙ্কর কোন ইচ্ছা মাহমুদের আছে বলে মনে হলো না। সে তীক্ষ্ণ চোখে একবার শাহেলিকে দেখলো শুধু। তার চোখ দুটি শাহেলির শ্রী ও সৌন্দর্য দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

রবিউল্লাহ বিরক্ত হয়। অনেক কষ্টে সেটা চেপে রেখে সে বলে, 'এই যে, কি ব্যাপার? শিকারে বেরিয়েছেন বুঝি?'

'না, আজ বেরিয়েছিলাম এমনি এমনি।' দূর থেকে দেখলাম কার লাল শাড়ি উড়েছে। কৌতূহল নিয়ে ছুটে এসেছিলাম…'

মাহমুদ হাসলো। বললো, 'তারপর কাছে এসে দেখি (শাহেলির উদ্দেশ্যে) আপনি। আপনি ভালো আছেন?'

'ভালোই।'

মাহমুদ বলে, 'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন না?'

শাহেলি বলে, 'জিজ্ঞেস করতেই হবে?'

মুহূর্তে যেন চেতনা ফিরে পায় মাহমুদ। তার দু'চোখ ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি নিমেষে উবে যায়। বদলে সেখানে ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে সাপের হিংসা। স্বভাব-সিদ্ধ নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত ভাব ফিরে আসে চোখে-মুখে। একটু হেসে বলে, 'না না, তা কেন? সহজ ভদ্রতার ব্যাপার কিনা, তাই ভেবেছিলাম আমি কেমন আছি তা উল্টে জিজ্ঞেস করবেন।'

'ভদ্রতা জিনিসটা লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি পাওয়ার মতো কপালের গুণ না, বুঝলেন? ওটা শিখে অর্জন করতে হয়।'

'বাঃ, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন দেখছি। না, আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম। আপনি হলেন গিয়ে চৌধুরী পরিবারের সবচে' ট্যালেন্টেড লোক।'

মাহমুদের কথার সুরে একটু বা প্রশংসা ফোটে। বলে, 'আপনি একটুও আপনার মায়ের মতো হননি। একদম অন্যরকম হয়েছেন।'

শাহেলি হতবাক। রাগে ও বিস্ময়ে সে ছটফট করে ওঠে। বলে, 'আমার মায়ের ব্যাপারে কি বলতে চান শুনি?'

'না, না…বলাবলির কি আছে। বলছিলাম কি আপনার মা বেশ চালাক-চতুর। সেদিন সুলতানার কাছ থেকে একটা গল্প ফেঁদে দিব্যি দু'হাজার টাকা কোকটে মেরে নিয়ে এসেছেন। জানতেন আমার কাছে চাইলে পাবেন না, তাই আমি যখন বাড়ি নেই সেই সময় তিনি সুলতানার কাছে গিয়ে হাজির।'

'আম্মা টাকা নিয়েছেন?'

শাহেলি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারে না।

'আহা, তাতে কি হয়েছে? ব্যাপারটা অতো সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? মোটে তো দু'হাজার টাকার মামলা...'

মাহমুদ যেন দয়ার সাগর। বলে, 'ভদ্রমহিলা গিয়ে বললেন টাকা না দিলে ইজ্জত যায়, তাইতো সুলতানা টাকা দিয়ে দিলো। তা আপনার মা বেশ খোলাখুলি মানুষ কিন্তু। সোজা গিয়ে সুলতানাকে বললেন কিছু টাকা ভিক্ষা দিতে হবে।'

শাহেলি অপমানে স্তব্ধ হয়ে থাকে! মাহমুদ বলে, 'দু'হাজার টাকা সুলতানার কাছে কিছুই না। এটা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না সে। তা যাক সেকথা...এদিকে এসেছিলেন কি মনে করে? ফার্ম দেখতে? হ্যাঁ, রবিউল্লাহ সাহেব কৃষিকাজ জানেন বটে। ভালো কৃষক। আচ্ছা চলি...হয়তো শীঘ্রই আবার দেখা হবে।'

মাহমুদ তার মোটর সাইকেলের সিটে বসেই পা নামিয়ে কথা বলছিল। এইবার সে গাড়ি স্টার্ট দেয়। গর্জন করে ওঠে অতিকায় যন্ত্রটা মাহমুদের পায়ের এক লাথি খেয়ে! এঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন আর...কম্পন শুনে মনে হচ্ছিলো ছিপছিপে মাহমুদের পক্ষে ওটা বুঝি কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে না। কিন্তু দেখা গেল শক্ত হাতে অবলীলাক্রমে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে মাহমুদ। ধোঁয়া আর গর্জন ছড়িয়ে গাড়িটা তীব্র গতিতে ছুটে গেল রাস্তার দিকে।

এতক্ষণে মুখ খোলে রবিউল্লাহ। বলে, 'লোকটা ধরো গে তোমার, একেবারে বাজে। আমাকে বললো কিনা কৃষিকাজ করি...কৃষক। মুখে একটুও আটকাল না বলতে। তা তুমি অমন চুপচাপ হয়ে গেলে কেন শাহেলি? এসব নিয়ে মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু?'

'লাভ লোকসানের কথা না।'

শাহেলির ঠোঁট জোড়া শক্ত দেখায়। বলে, 'আমি ভাবছি মান অপমানের কথা। রবি ভাই, দু'হাজার টাকা যে করে হোক আমাকে জোগাড় করতে হবে। ঐ অভদ্র, ইতর লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে হবে টাকাটা। নইলে আমি স্বস্তি পাবো না। উঃ, আম্মা অমন সর্বনেশে মানুষ, কে জানতো? রবি ভাই...'

'কি বলছো?'

'তুমি আমাকে দু'হাজার টাকা ধার দেবে?'

'দু'হাজার টাকা সমান্য টাকা না...' রবিউল্লাহ আস্তে আস্তে বলে, 'জোগাড় করতে একটু সময় লাগবে বৈকি। তাছাড়া একটু চিন্তা ভাবনাও করা দরকার।'

'চিন্তা ভাবনা, সেটা আবার কি?'

শাহেলি হাবেভাবে নির্মম হয়ে ওঠে।

'তুমি রাগ করছো বুঝতে পারছি শাহেলি। তা এতে তোমার রাগের কি আছে? মাহমুদ সাহেব এখন এই তল্লাটের সবচে' টাকাওয়ালা মানুষ। খারাপ মানুষের হাতে টাকা হলো গিয়ে চাবুকের মতো। যার হাতে এই চাবুকটা আছে, তাকে সবাই ভয় পায়।'

'তুমি মাহমুদকে ভয় পাও?'

'ভয়?'

রবিউল্লাহ একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে। বলে, 'না ভয় ঠিক পাই না। আমি হলাম গিয়ে ঠাণ্ডা কিসিমের মানুষ। ভীতুই বলো আর দুর্বলই ভাবো ভালরকম ভেবেচিন্তে তবে আমি একটা কাজ করি। হাঙ্গামা ফ্যাসাদের ভেতর যেতে সহজে আমি চাই না। মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে লড়ালড়ি, ও একটা হাঙ্গামা। দেখছো না লোকটা ঝগড়া কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

শাহেলি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'এ ইতরটার সঙ্গে ঝগড়া করতে কে যাচ্ছে শুনি? আমি চাইছি আম্মা যে টাকাটা নিয়েছেন সেটা শোধ দিতে...'

'টাকা...'

রবিউল্লাহ চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলো। বললো, 'আচ্ছা, টাকাটা তোমাকে দিতে পারবো কি না সেটা কাল বলতে পারবো।'

শাহেলি বললো, 'বেশ, কালকেই বলো। তুমি টাকাটা ধার দিতে পারো ভালো, নতুবা যে করে হোক টাকা জোগাড় আমাকে করতেই হবে।'

রবিউল্লাহ দেখলো শাহেলি উত্তেজিত। এখন তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে-চেষ্টা সে করলো না। বললো, 'চলো, কিছুদূর তোমাকে এগিয়ে দিই...'

নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজন মাঠ পার হয়ে রাস্তায় উঠলো। দু'পাশে পাতা বাহার রোডের গাছপালা ও বাড়িঘর। রাস্তা দিয়ে চলাচল করছিল গাড়ি ঘোড়া ও পথচারি। রবিউল্লাহ ভাবছিল শাহেলির কথাই। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্বে শাহেলি অনেক উঁচু শ্রেণীর মেয়ে। স্বাভাবিক হিসাবে তার সঙ্গে শাহেলির বিয়ের প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতো না। বড়কর্তা চৌধুরী আলী নকীব তার সঙ্গে শাহেলির বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন বলেই আজ সে শাহেলির মতো মেয়েকে পাওয়ার কথা ভাবছে। হ্যাঁ, শাহেলির মতো মেয়েকে বিয়ে করা রবিউল্লার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। শুধু আফসোস হয় অতো রূপ আর গুণ আছে শাহেলির, সঙ্গে যদি আরো খানিকটা বাস্তব বুদ্ধি থাকতো!

পাতাবাহার রোডের স্নিগ্ধ ছায়া হেমন্তের বাতাসে কাঁপছে। ষ্টেশন থেকে সুন্দর পীচ ঢালা এই পথটা মাঠ ঘুরে কলোনীর ভেতর দিয়ে গিয়ে ঢুকেছে শাল মহুয়ার জঙ্গলে।

সেখান থেকে থানা ও হাসপাতাল হয়ে পৌছেছে একেবারে উত্তর সীমানায় রাজা সাহেবের মাঠে। মাঠের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত ট্যুরিস্ট হোটেল, হোটেল তাজ।

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে একসময় শাহেলি বলে, 'তুমি কি আমাদের বাড়ি যাচ্ছো এখন?'

'না। কিছুদূর তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

'আর এগিয়ে দেয়ার দরকার কি? এই তো বাড়ির কাছেই এসে গেছি।'

রবিউল্লাহ বললো, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে কাল তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

শাহেলি চলে গেল। রবিউল্লাহ আর এই অবেলায় ফার্মের দিকে গেল না। কলোনীর শেখ সাহেবের কাছে একটু কাজ ছিলো। ভাবলে, কলোনী হয়ে বাড়ি চলে যাবে।

রবিউল্লাহর বাড়ি স্টেশনের কাছাকাছি। পাতাবাহার রোডের সুনিবিড় ছায়া পার হয়ে সে পৌছলো কলোনীর কাছাকাছি। রাস্তা থেকে নেমে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকবে এই সময় পেছন থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এলো, 'একটু শুনবে?'

রবিউল্লাহ ফিরে তাকায়। সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। কোট-প্যান্ট-টাই পরা। বিশাল কাঠামো শরীরের, কিন্তু সেই অনুপাতে শক্ত-সামর্থ্য নয়। কেমন যেন দুর্বল দেখাচ্ছে। ভদ্রলোকের নাকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। চোখ জোড়া ক্লান্ত।

রবিউল্লাহ বললো, 'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ! হোটেল তাজের পথ কি এটাই?'

'জ্বি। সোজা এই পথ ধরে চলে যান। এই রাস্তাটার নাম পাতাবাহার রোড। কিছুদূর গিয়ে দেখবেন শাল-মহুয়া জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা হোটেল তাজ-এ চলে গেছে।'

'আপনি দেখছি ভূগোল ইতিহাস বেবাক ঝেড়ে ফেলেছেন।'

লোকটা মাথা নিচু করে মুচকি হাসে। বলে, 'মেলা চক্করের পথ নাকি, অ্যাঁ? ক'মাইল হবে এখান থেকে?'

'তা ধরুনগে দেড় মাইল তো হবেই। এইটুকু পথ রিকসা করেও যেতে পারেন। মানিকপুরে রিকসা ভাড়া আপনার খুব কম।'

'হুঁ!'

লোকটা যেন কি ভাবে। রবিউল্লাহ বলে, 'আপনাকে মানিকপুরে নতুন দেখছি। চেঞ্জে এসেছেন বোধ করি।'

লোকটা এই কথার জবাব দেয় না। মুখ উঁচু করে দূরে তাকিয়ে কি যেন দেখে। তারপর বলে, 'আচ্ছা, আপনি একটা খবর দিতে পারেন?'

'কি খবর?'

'চৌধুরী আলী নকীব সাহেবের বিধবা স্ত্রী সুলতানা পারভিন কি এখন মানিকপুরে আছেন না অন্যত্র চলে গেছেন?'

'না, তিনি এখনো মানিকপুরেই আছেন!'

'আচ্ছা…ওতেই হবে।'

ব্যাগ হাতে লোকটা মাথা নিচু কর হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে একটা খালি রিকসায় চেপে বসে। হাঁ করে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো রবিউল্লাহ। লোকটা রিকসায় চেপে বোধহয় হোটেল তাজ-এ,চললো। কিছুক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলো রবিউল্লাহ। তারপর আর ইতস্ততঃ না করে সেও একটা খালি রিকসা ডেকে নিলো। রিকসাওয়ালাকে বললো, 'হোটেল তাজ-এ চলো।'

রিকসা চলতে লাগলো।

প্রকাণ্ড রাজা সাহেবের মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে হোটেল তাজ। দীর্ঘ, প্রশস্ত বারান্দার উপর টালির ছাত। ভেতরে যাবার সরু পথের দু'পাশে মৌসুমী ফুলের বাগান। মানিকপুরে যারা টিলা পাহাড় দেখতে আসে, ঐতিহাসিক দুর্গ, রাজা সাহেবের মাঠ বা শাল মহুয়ার জঙ্গল দেখতে আসে, বা স্বাস্থ্য-উদ্ধারে চেঞ্জে আসে তারা সাধারণতঃ এই হোটেলে এসে আশ্রয় নেয়। হোটেল তাজ মানিকপুরের গর্ব। জেলা শহরেও অমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হোটেল আছে কিনা সন্দেহ। প্রকাণ্ড ঢালু রাজা সাহেবের মাঠের কিনারায় ছবির মতন ছিমছাম ও সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হোটেলটি।

হোটেলের ম্যানেজার আইনুল হক মাত্র একজন খদ্দের রিসিভ করে বারান্দায় এসেছে। এই সময় বাগানের ছোট পথটি ধরে ব্যস্ত ভাবে আসতে দেখা গেল রবিউল্লাহকে।

'আরে রবিউল্লাহ! কি ব্যাপার? এই সময়ে তুমি?'

'একটা খবর জানতে এসেছি তোমার কাছে আইনুল।'

'খবর! ঠিক আছে, বসো। এই বারান্দায়ই বসো না হয়।'

'না হে, চলো একেবারে ঘরে। এই কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি তোমাদের হোটেলে এসেছে ওর নামটা আমার জানা দরকার।'

আইনুল হক রবিউল্লাহর ব্যক্তিগত বন্ধু। সে রবিউল্লার এই কৌতূহলে একটু অবাক না হয়ে পারে না। কিন্তু বিস্মিত ভাবটা চাপা দিয়ে সে রবিউল্লাহকে নিয়ে ঘরে

আসে। রেজিস্টার খুলে নাম বের করে। রবিউল্লাহ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে নাম ও ঠিকানার উপর।

খাতায় লেখা আছে, হাসান মওলা, চব্বিশ, মেহগনি রোড, ময়মনসিংহ। পেশা ব্যবসা।

'হাসান মওলা,'

রবিউল্লাহ নামটা উচ্চারণ করে আর ভাবতে চেষ্টা করে এই ধরনের কাউকে সে চেনে কি না…

আইনুল হক বলে, 'কি হে, ব্যাপার কি?' লোকটা তোমার চেনা-জানা নাকি?…'

'না, না…চেনা-জানা কিছু না। লোকটা ধরোগে তোমার খুব অভদ্র। কি উদ্দেশ্যে মানিকপুরে এসেছে একটু জানা দরকার।'

'ঠিক আছে চিন্তা করো না। আজ থেকেই আমি মুন্সিকে পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি খবর নিয়ো। মুন্সি সব খোঁজ-খবর করে তোমাকে জানাবে। দাঁড়াও, মুন্সিকে ডেকে আমি এখনই বলে দিচ্ছি।

খবর দিতেই হোটেলের 'কেয়ার টেকার' মুন্সি ভেতরের পথ দিয়ে ঘরে এলো। ধূর্ত চেহারা। বাড়ি সিলেট! লোকটা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে হাঁটতে পারে।

আইনুল হক মুন্সিকে মোটামুটি কাজটা বুঝিয়ে দিলো। একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ভেবে রবিউল্লাহ বললো, 'না হে, আমার এমন একটা কিছু interest নেই, বুঝলে? লোকটাকে দেখে-শুনে কৌতূহল হয়েছে, তাই খোঁজ নিচ্ছি। এরকম ব্যস্তসমস্ত হওয়ার কিচ্ছু দরকার নেই এজন্যে।'

মুন্সি বললো, 'ঠিক আছে স্যার। তেমন খবর থাকলেই জানাবো।'

'হ্যাঁ, তাই।'

রবিউল্লাহ সায় দেয়। আইনুল হক বলে, 'মুন্সি, আমাদের জন্য দু'পেয়ালা চায়ের কথা বলে এসো কিচেনে। কি হে, চায়ে আপত্তি নেই তো?'

রবিউল্লাহ একটু ইতস্তঃ করে বলে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মুন্সি চলে যায়। আইনুল হক বলে, 'তারপর তোমার বিয়ের গল্প বলো দোস্ত।'

রবিউল্লাহ সে কথার জবাব দেয় না। সে হঠাৎ চমকে ফিরে তাকায় পাশের কাঁচের জানালার দিকে। আইনুল হকও দেখলো একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে কাঁচের জানালার ওপাশে ঘাপটি-মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে ওঠে আইনুল হক, 'কে, কে, ওখানে?'

ধপাস করে একটা পতনের শব্দ হলো। কি একটা ভারি বস্তু যেন পড়ে গেল উপর থেকে নিচে। রবিউল্লাহ ও আইনুল হক দুজনেই তাড়াতাড়ি জানালার দিকে ছুটে যায়। জানালা খুলে নিচে ও আশেপাশে তাকিয়ে দেখে। না কেউ নেই।

'আশ্চর্য।'

ম্যানেজার আইনুল হক বলে, 'চার বছর ধরে হোটেলে ম্যানেজারী করছি। কখনো এমনটি ঘটতে দেখিনি, আর হাসান মওলা লোকটা হোটেলে পা দিতে না দিতেই দিনে দুপুরে ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল?'

রবিউল্লাহ আইনুল হকের কথায় কর্ণপাত করে না। সে চারপাশে তাকিয়ে কি যেন খোঁজ করছিল। হঠাৎ দেখলো বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় বুরুজ আলী তারের বেহালা বাজাতে বাজাতে চলেছে।

একটু হাসলো রবিউল্লাহ। বুরুজ আলীর বেহালার ব্যবসা তাহলে ভালোই চলছে।

চার

তখন বেলা দুটোর কম নয়।

চৌধুরী কুটীরের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তারের বেহালা বাজাচ্ছিল বুরুজ আলী। চারপাশে জমে উঠেছিল পথচারী ও বাচ্চাদের ভিড়। চোখ বুঁজে একমনে বেহালা বাজাচ্ছিল বুরুজ আলী আর সুরের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে বাজনা শুনছিল সুলতানা। বাজনা শুনে সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। লোকটা লোকপ্রিয় পরিচিত গানের গৎ বাজাচ্ছে। থেকে থেকে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে সুলতানার। পুরনো গানের সুরে পুরনো দিনগুলিও কি আশ্চর্য রকম মিশে থাকে। সুলতানা মুগ্ধ হয়ে বুরুজ আলীর বাজনা শুনছিল আর ভাবছিল লোকটাকে বাড়ির ভেতরে ডাকলে কেমন হয়।

সুলতানা অনেকটা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দোতলার রেলিং ধরে, তার চমক ভাঙলো মাহমুদের হাসির শব্দে। ঘর থেকে সেও এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়।

'কি হাসছো যে?'

'হাসছি তোমাকে দেখে। কি সরল আর সহজ তোমার মন সুলতানা যে সাধারণ তারের বেহালা বাজনা শুনে তুমি একেবারে তন্ময়।'

'এইটা বুঝি হাসির ব্যাপার হলো তোমার কাছে?'

'নিশ্চয়ই। যার কোটি কোটি টাকা আছে ব্যাঙ্কে সে রাস্তার একটা লোকের তারের বাজনা শুনে চেতনা হারিয়েছে ভাবতে হাসি পায় না?'

সুলতানা বিস্মিত হয়ে বলে, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। বেহালার বাজনা শুনে মুগ্ধ হওয়ার সঙ্গে কোটি কোটি টাকার কি সম্পর্ক?'

মাহমুদ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটাকে বাড়ির ভেতরে ডেকে আনতে খুব ইচ্ছে করছে, তাই না?'

'তা করছে বৈকি।'

'লোকটাও তাই চায়।'

'মানে?'

মাহমুদ গম্ভীর হয়ে বলে, 'ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছি এই বেহালা বাদক লোকটা আমাদের বাড়ির চারপাশে যখন তখন ঘুরঘুর করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর টোর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি লোকটা গভীর জলের মাছ।'

সুলতানা কিছুক্ষণ কথা বলে না। তার চোখমুখে আরক্তিম হয়ে ওঠে একটা জমাট বেদনা। আস্তে আস্তে বলে, 'হয়তো তোমার কথাই সত্যি। আমি অতোটা তলিয়ে দেখিনি। বাজনা শুনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এখন থেকে আমি সাবধান হলাম। কিন্তু এভাবে দম বন্ধ হয়ে কদ্দিন আর মানিকপুরে থাকতে হবে বলতে পারো?'

'বেশি না, আর মাস দুই তোমাকে মানিকপুরে থাকতে হবে সুলতানা। এর ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মানিকপুরে এই দু'মাস থাকার সত্যি কি কোনো প্রয়োজন আছে বলতে চাও?'

'হঠাৎ কপালের গুণে কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছো সুলতানা। তাই কোটি টাকার মলিক হওয়ার যে কি বিপদ তা বুঝতে পারছো না। যদি বুঝতে তাহলে এ প্রশ্ন আমাকে করতে না তুমি।'

সুলতানা বললো, 'তুমি রাগ করো না। বিশ্বাস করো এখানে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। মানিকপুরের এই দূষিত পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও না গেলে আমি বোধহয় দম বন্ধ হয়েই মারা পড়বো। মাঝে মাঝে মনে হয় কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার চেয়ে আমার আগের জীবন অনেক সুখের ছিলো।'

মাহমুদ একটু হাসলো। বললো, 'শাঁখের করাত আসতেও কাটে, যেতেও কাটে সুলতানা। এই অবস্থায় আগের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেছো তো ধনে প্রাণে মরেছো। তুমি নির্বোধ নও। এসব ভাবনা মন থেকে একদম ঝেড়ে ফেলো। এখন তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি চৌধুরী আলী নকীবের বিধবা স্ত্রী। তোমার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আছে দেশে-বিদেশে। কিসমত ও দৌলতের তুলনায় তোমার শত্রুর সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং এ অবস্থায় হাল ছেড়ে দেয়া চরম বোকামির লক্ষণ।'

সুলতানা বললো, 'মানিকপুরে পা দিয়ে অবধি শুনছি আমার শত্রুর অন্ত নেই। আমার এইসব শত্রু কারা একটু খুলে বলবে?'

সুলতানা আর কথা বললো না। উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রেলিং ধরে। গেটের

বাইরে বুরুজ আলী বেহালা বাজিয়ে অনেকক্ষণ বোধহয় চৌধুরী কুটিরের মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ দূরে থাক, গেটের দারোয়ান পর্যন্ত ভালো–মন্দ একটা কথা বললো না।

আর অপেক্ষায় না থেকে বুরুজ আলী একটা ভিড় পেছনে নিয়ে বেহালা বাজাতে বাজাতে দূরে পাতাবাহার রোডের সর্পিল বাঁকে হারিয়ে গেল।

মাহমুদ বলে, 'চলো, সুলতানা ঘরে চলো।'

'চলো।'

সুলতানা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। মাহমুদ সস্নেহে একটা হাত ধরলো সুলতানার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো হঠাৎ দেখলো একটা অপরিচিত লোক গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পিয়ন কালু এসে সালাম দিলো। সুলতানার হাত আগেই ছেড়ে দিয়েছিল মাহমুদ। কালুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি খবর কালু?'

'হোটেল তাজের একজন কর্মচারী একটা চিঠি নিয়ে এসেছে স্যার।'

'যে লোকটা এসেছে তাকে তুই চিনিস, তাই না?'

'জ্বি স্যার। ওর নাম মতিন, হোটেল তাজের বেয়ারা।'

'স্যার।'

কালু ভয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলো, 'মতিন বললো খোদ সাহেব ছাড়া কারো কাছে তার নাকি চিঠি দেয়ার হুকুম নেই। যদি বলেন তো স্যার মতিনকে উপরে আসতে বলি।'

'বেশ তাই কর।'

কালু নিচে গিয়ে হোটেল তাজের বেয়ারা মতিনকে নিয়ে এলো। বিনীতভাবে মাহমুদকে বলে মতিন, 'কসুর মাফ করবেন হুজুর। যিনি আমাকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে সেটি দিতে তিনি মানা করে দিয়েছিলেন। তাই...'

'ঠিক আছে, চিঠি দাও।'

মতিন চিঠিখানা দিলো। সেলাম জানিয়ে কালু সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেল। চিঠি হাতে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলো মাহমুদ। খামের উপর তারই ঠিকানা লেখা। অক্ষরের ছাঁদটা একটু বাঁকা বাঁকা, মেয়েলি ধরনের। খাম খুলতেই বেরোলো এক টুকরো কাগজ। চিঠিতে লেখা ছিলোঃ

প্রিয় মাহমুদ সাহেব,

আসলে আমার এই চিঠি লেখার কথা আপনার ছোট বোন সুলতানা পারভিনের

কাছে। চিঠিখানা তাকেই লিখতাম। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম বর্তমানে আপনি তার অভিভাবক, সুলতানা পারভিন ওরফে মিসেস চৌধুরীর সম্পত্তির পরিচালনা থেকে শুরু করে তার স্বাস্থ্য রক্ষার খুটিনাটি বিষয়গুলি পর্যন্ত নাকি আপনি দেখাশোনা করেন। ভালই হলো, মিসেস চৌধুরী হয়তো বা এই চিঠি পেয়ে শুধু শুধু মন খারাপ করতেন। আমার বিশ্বাস আপনি আমার কথাগুলি বুঝবেন। চিঠিতে বিস্তারিত কিছু জানালাম না। আপনি আজ বিকেল সাড়ে ছ'টার দিকে একবার হোটেল তাজে এলে আমার সাথে দেখা হতে পারে। আমি আট নম্বর কামরায় আছি। আপনার বোনের প্রথম স্বামী ফ্লাইট লেঃ তাইমুর মীর্ধা সম্পর্কে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার নিকট আছে। আশা করি আসবেন। আপনার বিশ্বস্ত—

হাসান মণ্ডলা।

মাহমুদ অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। এগিয়ে আসে সুলতানা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, 'কি হলো?'

'পড়ো।'

মাহমুদ চিঠিখানা সুলতানার হাতে তুলে দেয়। সুলতানা আগাগোড়া চিঠিখানা পড়ে। বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠে তার চোখে মুখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি বুঝতে পারছি সুলতানা।'

মাহমুদ ঠোঁট কামড়ে ধরে ঘৃণায়। বলে, 'ওটা হলো বড় রকমের একটা চাল। কবে মরে ভূত হয়ে গেছে তৈমুর মীর্ধা। আর আজ কে না কে হাসান মণ্ডলা, তিনি দেবেন তারই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খবর। বুঝলে না সুলতানা, ওটা চাল।'

সুলতানা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভয়ে ও ভাবনায় তার চোখ-মুখ ফ্যাকাসে দেখায়। আস্তে আস্তে সে বলে, 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে তৈমুর মীর্ধা...'

'মরেনি...এই তো?'

মাহমুদ কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'কিন্তু তা বললে চলবে কেন সুলতানা? তৈমুর মীর্ধাকে মরতেই হবে। তৈমুর মীর্ধার জীবিত থাকার অর্থ আলী নকীবের বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, বুঝতে পারছো?'

'না।'

সুলতানা হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়লো-হতাশায়। ক্ষোভ-জনিত বিদ্রোহের সুর ফুটলো তার কথায়। বললো, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতেও চাই না। এই বিশ্রি গোলক ধাঁধা থেকে আমাকে তুমি মুক্তি দাও মাহমুদ...আমি এখান থেকে চলে যাবো।'

'ছিঃ লক্ষ্মীটি, অমন ভেঙ্গে পড়ো না।'

মাহমুদ যেন মিনতি করে। বলে, 'তুমি তো জানো আলী নকীবের সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আঘাতের অপেক্ষা করেছি। কিন্তু আঘাতের ঝাপটা যে এদিক থেকে আসবে তা একবারও ভাবিনি। অন্য দিকে ব্যস্ত ছিলাম সুলতানা, তৈমুর মীর্ধার কথা মনে ছিলো না।'

সুলতানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মাহমুদ তাকে অনেক আশ্বাস–বাণী শোনায়। কিন্তু সে সব আশ্বাস–বাণী সুলতানার কর্ণগোচর হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

মাহমুদ বললো, ' আমার উপর যখন ভরসা করতে পরছো না তখন তুমি এক কাজ করতে পারো সুলতানা। সোজা পুলিসের কাছে গিয়ে বলতে পারো যে…'

চকিতে ফিরে তাকায় সুলতানা। মাহমুদের মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, 'দোহাই লাগে তোমার। চুপ করো। ওসব কথা বলো না আমাকে!'

মাহমুদ সুলতানার হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি কখনো এসব কথা তোমাকে বলতে চাই না। কিন্তু যখন দেখি তুমি আমার উপর আর আস্থা রাখতে পারছো না, তখন ইচ্ছে হয় আমিই গিয়ে পুলিসকে সব জানিয়ে দিই।'

সুলতানা আস্তে আস্তে বলে, 'আমি খুব দুর্বল! আমার কথায় কিছু মনে করো না। আমার ভয়–ভাবনার কথা ছেড়ে দাও। এই চিঠির ব্যাপারে কি করবে ভেবেছো কিছু?'

'হ্যাঁ। হাসান মণ্ডলার সঙ্গে বিকেলে দেখা করবো।'

'তারপর?'

'সোজা ব্যাপার! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো।'

মাহমুদের চোখ–মুখ ঘৃণায়, আক্রোশে ভয়ঙ্কর দেখায়। বলে, 'আমি তো সাধু পুরুষ কিছু নই সুলতানা। নর–হত্যা ইতিপূর্বে বহু করেছি…মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রয়োজনে না হয় আরো দু'একটা করবো।

দুপুরে খাওয়ার পর নিজের ঘরে মাহমুদ একাকী ছটফট করে বেড়ায়। চৌধুরীদের এতদিন মিথ্যেই প্রধান শত্রু বলে সন্দেহ করলো। এদিকে ঘোড়ার চাল দিয়ে রেখেছে অদৃশ্য আর একজন। কে সে? তৈমুর মীর্ধা? তৈমুর মীর্ধা তো শোনা গিয়েছিল অপঘাতে মারা পড়েছে। তবে কি সে মারা যায়নি?

বিকেল হতে না হতেই কাপড় পরলো সে। পকেটে পুরলো গুলি ভর্তি রিভলভারটা। সুলতানা নিজের ঘরে দাঁড়িয়েছিল তার অপেক্ষায়ঃ মাহমুদ যেতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, 'কখন ফিরছো?'

'আগে দেখি তো কেমন মক্কেল।'

মাহমুদ একটু হাসে। বলে, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে তাড়াতাড়িই ফিরতে পারবো। তুমি

খামোকা চিন্তা করো না সুলতানা। মনে রেখো শক্তি এবং বুদ্ধিতে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কেউ মানিকপুরে নেই।'

সুলতানা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মাহমুদ নেমে এলো নিচে। তখনো বিকেলের রাঙা রোদ গাছপালার পেছনে সোনার মতো ঝলমল করছে। অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা মানিকপুরের আকাশে গোধূলি নামছে রক্তিম সমারোহে। চারদিকে পাখ-পাখালির কলরব। মাহমুদের মোটর বাইকটা বুনো মোষের মতো গর্জন করে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে ছুটে চললো।

হোটেল তাজ-এ যখন পৌঁছুলো মাহমুদ তখন পাঁচটা বেজে আরো কয়েক মিনিট। সুমুখে বিশাল রাজা সাহেবের মাঠ গোধূলির উদাস আলোয় আচ্ছন্ন। দিগন্তে পীরগঞ্জের টিলার অসংখ্য ত্রিভুজ স্কেচের মতো দাঁড়িয়ে আছে আকাশের গায়ে। এক ঝাঁক বুনো পায়রা আকাশ পাড়ি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শাল-মহুয়ার অরণ্যের দিকে।

হোটেলে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হলো ম্যানেজার আইনুল হকের সঙ্গে। আইনুল হক সাদরে অভ্যর্থনা করে মাহমুদকে। আট নম্বর কেবিন চিনিয়ে দেবার জন্য মুন্সিকে ডেকে দিলো ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে।

আট নম্বর কেবিন উত্তর প্রান্তের একেবারে শেষ ঘর। ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কে?'

মুন্সিজী হাঁক দিয়ে বলে, 'চৌধুরী বাড়ির মাহমুদ সাহেব স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা, তারপরই খুট করে দরজা খুলে যায়। সেই আগের গম্ভীর কণ্ঠ বলে, 'মাহমুদ সাহেব? আসুন।'

ভেতরে ঢোকে মাহমুদ। দুজন দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। হাসান মণ্ডল মৃদু হাসে। বলে, 'বসুন মাহমুদ সাহেব। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনি নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগে এসেছেন। **So kind of you.** দয়া করে বসুন। চা আনতে বলি, কেমন?'

'বেশ বলুন।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু?'

হাসান মণ্ডলার প্রচণ্ড ভদ্রতাবোধ দেখে গা জ্বলে যায় মাহমুদের। মনে মনে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে সে। মুখে বলে, 'আমার জন্যে আর কিছুর দরকার নেই।'

'**Excuse me for a moment.** আমি চায়ের কথাটা বলে আসি।

হাসান মণ্ডল বাইরে আসে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তকিয়ে কেউ আছে কি না লক্ষ্য করে। তারপর একটা বয়কে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

'এইবার সমঝোতার পালা। দুজনেই দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ নীরবতা ভেঙে প্রায় কঠোর কণ্ঠে মাহমুদ বলে, 'এইবার কেন তলব করেছেন দয়া করে খুলে বলুন মওলা সাহেব।'

'বলছি। কিন্তু তার আগে নাহক তকলিফ দেয়ার জন্যে প্রথমেই মাপ চাইছি।'

'আপনার ভদ্রতাবোধ অসাধারণ।'

হাসান মওলা বলে, 'এভাবে চিঠি লিখে নিশ্চয়ই আপনাদের অবাক করে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ। সে কৃতিত্বটুকু আপনি অনায়াসে দাবি করতে পারেন বটে। আমরা ভাই-বোন দুজনই আপনার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়েছি।'

'আমি এজন্যে খুবই দুঃখিত মাহমুদ সাহেব। কিন্তু কি করবো? এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না সামনে। যাক গে। এইবার কাজের কথায় আসি। আচ্ছা, বাই দি বাই, আপনি কি কখনো আপনার বোন মিসেস সুলতানা পারভিনের প্রথম স্বামী তৈমুর মীর্ধাকে দেখেছেন?'

'দেখবো না কেন? হাজার হোক একটা মাত্র বোন আমার। তার স্বামীকে দেখবো না?'

হাসান মওলার চোখে-মুখে একটা তীব্র ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠলো। বললো, 'মিথ্যে কথা বলবেন না মাহমুদ সাহেব। আপনি তৈমুর মীর্ধাকে কখনো দেখেননি। আপনার অভিনেত্রী বোন সুলতানা পারভিন যখন স্কোয়াড্রন লীডার তৈমুর মীর্ধাকে বিয়ে করেন তখন আপনি সুদূর আফ্রিকার গিনি উপকূলে ডাকাতি করে বেড়াতেন। ঠিক কি না? আপনার সঙ্গে সুলতানা পারভিনের দেখা হয় দীর্ঘ দশ বছর পরে। তখন সুলতানা পারভিন লাহোর সিনেমা জগতের উচ্ছ্বল নায়িকার জীবন যাপন করছেন। তৈমুর মীর্ধার মৃত্যুর খবর প্রচারিত হয়েছে তারও বেশ ক'বছর আগে।'

'চমৎকার নাটকীয় বর্ণনা। তারপর?'.

'হ্যাঁ, তারপরের কথাও আমি জানি। আফ্রিকার গিনি উপকূল থেকে ফিরে আপনি অর্থোপার্জনের দাঁও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বুড়ো আলী নকীব এই সময় সুলতানা পারভিনের রূপে উন্মত্ত হয়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। সুলতানা পারভিন ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু আপনি…'

দেখতে দেখতে মাহমুদের মুখমণ্ডল হিংস্রতায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সে তড়িতাহতের মতো উঠে দাঁড়ায়। চাপা গর্জন বেরিয়ে আসে উত্তেজিত কণ্ঠ থেকে, 'Sut up you rascal!'

'উত্তেজিত হবেন না মাহমুদ সাহেব। বসুন, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি এতক্ষণ শুধু ভূমিকাটুকু সারছিলাম। বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

হাসান মওলা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাসে, 'আমি সবই জানি মাহমুদ সাহেব। অপরাধ নেবেন না দয়া করে। আপনার কোনো ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা নয়। আগে কথাগুলি শুনুন, তারপর আপনার যা ইচ্ছা হয় করবেন। রিভলভার বের করে লাভ কি বলুন? ইচ্ছে করলেও এই অবস্থায় খুন করা আপনার পক্ষে উচিত হবে না।'

মাহমুদ পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারের বাঁটটা সজোরে চেপে ধরেছিল। হাসান মওলার কথায় একটু বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসে। বলে, 'কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত সেটা বিচার করার ভার আপনার উপর নয়। আমার সব কথাই যখন আপনি জানেন তখন আশা করি এটাও বলে দিতে হবে না যে দরকার পড়লে যে কোনো অবস্থায়ই খুন করতে আমি এতটুকু দ্বিধা করি না।'

ভেজানো দরজা খুলে এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো বেয়ারা। ট্রে নামিয়ে নিঃশব্দে সে চলে গেল। হাসান মওলা অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে দু'পেয়ালা চা তৈরি করে। এক পেয়ালা নিজে রেখে আর এক পেয়ালা বাড়িয়ে দেয় মাহমুদের দিকে। বলে, 'নিন শুরু করুন।'

মাহমুদ চায়ে চুমুক দেয়। এই প্রথম সে অনুভব করে, যে লোকটা সামনে বসে আছে শক্তি ও বুদ্ধিতে তার কাছে সে নিতান্ত অসহায় শিশু। হাসান মওলা আটঘাট বেঁধেই এই বৈকালিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে। ব্যবস্থায় এতটুকু খুঁত নেই। পকেটের রিভলভারটা হোটেল তাজের এই গোধূলি সন্ধ্যায় নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

'মাহমুদ সাহেব,' হাসান মওলা আবার শুরু করে, 'এটা ঠিক যে তৈমুর মীর্ধাকে আপনি কখনো দেখেননি।' আচ্ছা ধরুন, এখন যদি জানতে পারেন তৈমুর মীর্ধা জীবিত আছে, তাহলে?'

মাহমুদ বলে, 'ধরাধরির কিছু নেই এতে। তৈমুর মীর্ধা মারা গেছে আজ থেকে প্রায় ন'বছর আগে।'

'হ্যাঁ, ন'বছর আগে এরকম একটা খবরই প্রচারিত হয়েছিল বটে। আর খবরটা প্রচারিত করেছিল স্বয়ং তৈমুর মীর্ধাই।'

'মানে?'

'মানেটা খুবই সহজ। তৈমুর মীর্ধা আসলে মারা যায়নি। কোনো একটা বিশেষ কারণে তাকে মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করতে হয়েছিল মাত্র।'

মাহমুদ বললো, 'হ্যাঁ, আপনার মস্তিষ্ক যে উর্বর তা স্বীকার করতেই হয় মওলা সাহেব। তা এই গাঁজাখুরি খবরটা দিতেই কি আপনি মানিকপুরে এসেছিলেন?'

'আপনার কাছে খবরটা গাঁজাখুরি হতে পারে কারণ সত্যি কথাটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝালেও আপনি বুঝবেন না। কিন্তু ধরুন তৈমুর মীর্ধাকে যদি আমি চৌধুরী পরিবারের

কারো কাছে, ধরুন চৌধুরী রশিদের কাছে এনে হাজির করি, তখন আপনাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছেন?'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'না। আমি আপনাকে সত্যি কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছি মাত্র। জেনে রাখুন তৈমুর মীর্ধা এখনো জীবিত। আমি তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তার সব খবরই আমি রাখি। ন'বছর আগে ফ্রন্টিয়ারের কোন এয়ার পোর্টে একটা বড়ো রকমের স্মাগলিং কেসে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় তৈমুর মীর্ধা হঠাৎ চাকরি ছেড়ে আফগান সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যায়। যাবার আগে আমার মতো কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও সহকারী কর্মচারীদের সাহায্যে নিজেকে সে মৃত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। নানা লোকের ছদ্মবেশে এতকাল তৈমুর মীর্ধা আফগানিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আত্ম-গোপন করেছিল। তৈমুর মীর্ধা আবার স্বনামে আত্মপ্রকাশ করতে ইচ্ছুক।'

'বটে? তাহলে ধোকাবাজির অপরাধটা বুঝি সরকার থেকে মওকুফ হয়ে গেছে?'

'না, তা হয়নি। এতকাল নাম ভাঁড়িয়ে বেড়াবার ও নিজেকে মৃত বলে জাহির করার অপরাধে তৈমুর মীর্ধাকে নিশ্চয়ই অভিযুক্ত হতে হবে। কিন্তু তাতে ধরুন, কি এমন শাস্তি হবে তৈমুর মীর্ধার? বড়জোর কয়েক হাজার টাকা ফাইন। তৈমুর মীর্ধা ইতিমধ্যে আইনজীবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখেছে এবং ঐ ফাইনের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত সে।'

'হুঁ!'

মাহমুদ নিবিষ্ট মনে তাকায় হাসান মণ্ডলার দিকে। বলে, 'আপনার উদ্দেশ্যটা এখন একটু একটু বুঝতে পারছি। তৈমুর মীর্ধার ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে এসেছেন।'

'ছিঃ, ছিঃ···কথাটা এমন ভাবে বলছেন যে আমি রীতিমত লজ্জা পাচ্ছি মাহমুদ সাহেব। কদর্থ করলে ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেলিংই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ভদ্রলোকের ছেলে, নেহাৎ অসুবিধায় পড়েই আপনার কাছে টাকা চাইতে এসেছি।'

'কত টাকা?'

'তা ধরুন লাখ দেড়েক টাকা দিলেই আমার এবং তৈমুর মীর্ধার মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বাস করবেন না জানি। ভাবছেন একবার টাকা পেলে আপনাকে একেবারে পেঁয়ে বসবো। বারবার আসবো টাকা চাইতে। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। বিশ্বাস করেন না করেন আপনার ইচ্ছা।'

মাহমুদ বললো, 'তৈমুর মীর্ধাকে যদি আমার সামনে হাজির করতে পারেন তাহলে আমি টাকা দিতে পারি।'

হো হো করে হাসলো হাসান মণ্ডলা। কিছুতেই তার হাসি থামে না। অনেক কষ্ট হাসি থামিয়ে সে বলে, 'আপনি খুব মজার কথা বলতে পারেন মাইরি। তৈমুর মীর্ধাকে সামনে হাজির করে দিই, আর আপনি সুযোগ বুঝে আমাদের দুজনকেই যমের বাড়ি পাঠিয়ে নিষ্কণ্টক হন!'

'আপনাদের যমের বাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা কি এখনই কিছু কম আছে মনে করেন?'

'তা মনে করি বৈকি। তৈমুর মীর্ধাকে আপনি কোথায় পাচ্ছেন যে মারবেন? আমাকে অবশ্য ইচ্ছে করলে এখানেই আজরাইলের হাতে সঁপে দিতে পারেন। কিন্তু আমি যেখানে তৈমুর মীর্ধার বন্ধু, আর তৈমুর মীর্ধা সশরীরে জীবিত, সেখানে আমাকে খুন করলে আপনার অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করুন?'

হাসান মণ্ডলা খুব হাসে। তার তীক্ষ্ণ চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে থাকে। একটু থেমে সে বলে, 'ব্যাপারটা আশা করি আপনি বুঝেছেন। আমাকে ধরুন ঐ তৈমুর মীর্ধাই পাঠিয়েছে আপনার কাছে। তার এখন ভীষণ অর্থাভাব। লোকটা খুব খেয়ালী, যা কিছু উপার্জন করেছিল সব বেমালুম উড়িয়ে বসে আছে। তা খেয়ালী হলে কি হবে তার মাথাটা একেবারে পাকা। খবরের কাগজে চৌধুরী আলী নকীবের মৃত্যু আর সেই সঙ্গে সুলতানা পারভিনের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি পাওয়ার সংবাদটা চোখে পড়েছে। ওমনি বুঝলেন কি না একটা প্ল্যান গজিয়ে উঠলো মাথায়। তৈমুর মীর্ধার কথাটা হলো তার জীবিতাবস্থায় সুলতানা পারভিন কি করে মিসেস চৌধুরী আলী নকীব হয়? কাবিন নামার শর্তে আছে স্বামী বারো বৎসর নিখোঁজ থাকার পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বার নিকাহ করতে পারে। তা বারো বছর তো হয়নি, হয়েছে মোট ন'বছর, সাড়ে ন'বছর। সুতরাং চৌধুরী আলী নকীবের সঙ্গে সুলতানা পারভিনের বিয়েটাই অবৈধ। তা যদি হয়, অর্থাৎ বিয়েটাই যদি অবৈধ হয় তাহলে সুলতানা পারভিন আইনতঃ চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তি পেতে পারে না। আর যদি পেতে হয় সামান্য দেড় লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে।'

মাহমুদ বললো, 'একটা ধাপ্পাবাজিতে ভুলবার পাত্র আমি না। স্পষ্ট কথাই বলা ভালো। টাকা আমি দেবো না।'

'বেশ তো, না দিলেন। আমাকে তাহলে একবার চৌধুরীদের কাছ থেকে ঘুরে আসতে হয়। আমি জানি ওরা অনেক রকম ফন্দি-ফিকির করছে আলী নকীবের সম্পত্তিতে কামড় বসাবার জন্যে। কিছুতেই সুবিধা করতে পারছিল না। এইবার তৈমুর মীর্ধার বেঁচে থাকার খবরটা পেলে জিইয়ে উঠবে।'

'তুমি একটা স্টুপিড হাসান মণ্ডলা...' দাঁতে দাঁত ঘষে বলে মাহমুদ।

'আর আপনি একটা নাক-উঁচু শয়তান' হাসান মণ্ডলা হাসে।

'আমি কি সেটা যথাসময় বুঝতে পারবো। তা কতো টাকা চাইছিলে?'

'দেড় লাখ।'

'অসম্ভব। টাকাটা এক লাখে নামিয়ে আনতে পারো?'

'বেশ। কিন্তু চেক চলবে না। কারেন্সী নোট চাই।'

'দেবো। কিন্তু ক'দিন সময় দিতে হবে।'

'আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিলাম। এর ভেতর টাকাটা দিয়ে দিতে হবে।'

'এতো অল্প সময়ে শহরের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।'

'তাহলে আগামী বিষ্যুদবার?'

'ঠিক আছে,' মাহমুদ সায় দেয়। দম নিয়ে বলে, 'কিন্তু যদি ফের ব্ল্যাকমেলিং করতে আসো?'

'তা যে আসবো না তা আপনি জানেন মাহমুদ সাহেব। চোরেরও একটা ধর্ম আছে।'

'অলরাইট।'

মাহমুদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'বিষ্যুদবার সন্ধ্যার পর আমি টাকা দিতে আসবো। আশা করি আমাদের এ আলাপটা আর কেউ জানবে না?'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ক্ষতি করবার উদ্দেশ্যে আমি মানিকপুরে আসিনি।'

মাহমুদ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। হাসান মণ্ডল দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকে। ধীরে ধীরে তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে শঠতার হাসি।

সেই হাসি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে মুন্সিজীর চোখ-মুখ। সাত-আট নম্বর কেবিনে লুকিয়ে হার্ড বোর্ডের ছোট একটা ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে এতক্ষণ সে সবকিছু দেখছিল, শুনছিল। মাহমুদ চলে যাবার পর লুকানো জায়গা ছেড়ে সেও ছুটলো রবিউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সাহেবকে খবরটা দিতে হবে।

পাঁচ

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মানিকপুর স্টেশনে একটা লোকাল ট্রেন এসে থামলো। মানিকপুর ছোট স্টেশন। মাত্র জনাকয় যাত্রী গাড়িতে উঠলো। গাড়ি থেকে নামলো তারও কম সংখ্যক লোক। চিঠির ঝুলি কাঁধে নিয়ে নামলো একজন পিয়ন। স্বামী-স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যা নিয়ে একটা পরিবার, বোধহয় মানিকপুরে চেঞ্জে অথবা বেড়াতে এসেছে তারা। আর নামলো কামাল। আরো একটি দীর্ঘাকায় লোক সকলের অগোচরে ট্রেন

থেকে নামলো। পরনে কালো সার্জের স্যুট। মাথায় জিন্না ক্যাপ। ট্রেন থেকে নেমে লোকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লেবেল-ক্রসিং এর কাছে একটা কামিনী গাছের ঝাঁকালো ছায়ার নিচে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কারো জন্যে অপেক্ষা করলো। তারপর বিরক্ত হয়ে স্টেশনের উল্টো পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। কিছুদূর যেতেই শেষ হয়ে গেল কাঁটা তারের বেড়া। লোকটা চারদিক তাকিয়ে রাস্তা পরখ করার চেষ্টা করলো। একটা কাঁটামেদির ঝোপ পার হয়ে রাস্তা। লোকটা সন্তর্পণে ঝোপ পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলো।

ট্রেন থেকে নেমে কামালও একজনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সিটি বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল ট্রেন। পেছনে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মানিকপুর। স্টেশন ঘরের সামনে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে ঝোপে-ঝাড়ে। বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো কামাল। তারপর ব্যাগ হাতে স্টেশন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলো বাইরে। রাস্তার এক পাশে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা রিক্সা ও এক্কা গাড়ি। ফেরিওয়ালারা কোমরে কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে বাক্সে কুপি বাতি বেঁধে পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রি করছে। খানিকটা দূরে খোলা জায়গায় বাজার বসেছে। সারি সারি কুপি-বাতি বাতাসে দপ্‌দপ্ জ্বলছে। অল্প অল্প কলরব ভেসে আসছে বাজার থেকে। কামাল একটা এক্কা গাড়ি নিলো।

গাড়োয়ান বললো, 'কই যাইবেন স্যার?'

'হোটেল তাজ-এ।'

'একখান নোট বিল্লুক নিমু স্যার, হু!'

কামাল বুঝলো এক টাকা চাইছে গাড়োয়ান। সে হেসে বললো, 'ঠিক আছে চলো।'

গাড়োয়ান মাত্র চাবুকে 'হিস' শব্দ তুলে ঘোড়া দুটোর উদ্দেশ্যে একটা আদরের গালি ঝেড়েছে, এই সময় ছুটতে ছুটতে এলো বুরুজ মিঞা? গাড়ির পা-দানীতে উঠে জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললো, 'স্যার, দয়া করে আমাকেও যদি কলোনী পর্যন্ত নিয়ে যান।'

প্রথমটায় কামাল একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। বুরুজ মিঞাকে দেখে আশ্বস্ত হয়। মজা করার জন্য বলে, 'না হে পুরো একটা নোট দিয়ে ভাড়া করেছি গাড়ি। পারবো না। আধাআধি দিতে পারবে?'

'সিকি ভাগ দেবো স্যার। তারের বেহালা বিক্রি করি, মুরোদ তো স্যার বোঝেন।'

'গাড়িতে নিবি তো বল তা নইলো দরজা ভেঙে ঢুকবো।'

শেষের কথাটা আস্তে করে বললো বুরুজ মিঞা যাতে গাড়োয়ান শুনতে না পায়। কিন্তু কথাবার্তা শুনতে না পেলেও দেরি হওয়ায় গাড়োয়ান চটে গেছে। বললো, 'কি স্যার, ঝামেলা আছে না গেছে?'

ততক্ষণে কামাল দরজা খুলে দিয়েছে। গাড়িতে উঠে বসেছে বুরুজ মিঞা। গাড়োয়ানের কথা শুনে একটু চেঁচিয়ে বলে, 'আমি বুরুজ মিঞা গো খাঁসাব। ঐ যে যা কাছ থেকে বেহালা কিনেছিলে।'

খাঁসাব তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ তুলে বলে, 'আমি বুরুজ মিঞা আর সুরুজ মিঞা বুঝি না। হুজুর যদি তোমারে জায়গা দ্যান তো বহো। হে না আইসে বাইর অইয়া যাও কইলাম! হ!'

কামাল বুঝলো গাড়োয়ান খাঁসাব একটু মেজাজী লোক। সে গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে বললো, 'তুমি গাড়ি চালাও। বুরুজ মিঞা আমার সঙ্গেই যাবে।'

'তাইলে আর কথা নাই হুজুর...'

চাবুকের 'হিসহিস' শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো গাড়িটা। উপরের আসন থেকে গাড়োয়ানের চড়া গলার স্বর শোনা গেল, 'এহন গিয়ে আমার গাড়ির মালিক অইলো হুজুর! হুজুর যা কইবেন তা-ই সই। আমি ঐ সব বুরুজ মিঞা সুরুজ মিঞার কি ধার ধারি?'

'শালা গাড়োয়ানের খাসলত তো বড় খারাপ। বুরুজ মিঞা না বলে পারে না।'

শালা শব্দটা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল গাড়োয়ান। সে বললো, 'কি কাইলা গো বুরুজ মিঞা? আমারে নি গালি দিলা?'

'না খাঁসাব। বলছি, একটু জলদি করে চালাও।'

'হ! এইডা একশো বার কইতে পারো। কিন্তুক গালিগালাজ দিয়ো না সোনাভাই, হ! আমার মেজাজ বড় চড়া।'

গাড়োয়ান হিসহিস চাবুক চালাতে চালাতে বললো, 'ছলিম ডাকাইতের নাম হুনো নাই বুরুজ মিঞা? দুই দুইবার লাগতে আইছিল আমার লগে। দুইবারই আমি ফাস্ট অইছি।'

গাড়োয়ান উপরের সিটে বসে বিড় বিড় করতে লাগলো। সিটের গায়ে হেলান দিয়ে বুরুজ মিঞার মুখোমুখি বসলো কামাল। বুরুজ মিঞা বললো, 'আমার চিঠি পেয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। কিছুতেই তৈমুর মীর্ধার রিপোর্ট তৈরি করতে পারছিলাম না। সামনে ধাঁধা আর ধাঁধা। হাসান মওলার খবর পেয়ে অকূলে কূল পেয়েছে শহীদ।'

বুরুজ মিঞা ওরফে শহীদ একটু হাসে। বলে, 'আজ বিষ্যুদবার না? কাল ভোর বেলা মানিকপুর ছেড়ে চলে যাবে হাসান মওলা। তা লাহোর থেকে কবে ফিরেছিস তুই?'

'দিন দুই আগে।'

'লাহোরে মোটমাট ক'দিন ছিলি?'

'তিন দিন। লাহোর থেকে গেলাম পেশোয়ার, সেখান থেকে লাণ্ডিকোটাল। তৈমুর মীর্ধা আমাকে খুব ক'দিন ভুগিয়েছে বলতে হবে।'

কামাল একটু হাসে। বলে, 'আর এখন ভোগাচ্ছে শহীদ খান।'

'দুজনেই হাসলো।'

গাড়ি ছুটে চলেছে হোটেল তাজের দিকে। শহীদ বললো, 'তুই সোজা গিয়ে হোটেলে উঠবি। আমি নেমে যাবো হাসপাতালের কাছে। যথাসময় তোর সঙ্গে দেখা করবো গিয়ে...'

কামাল বলে, 'খুনীর হদিস পেলি?'

শহীদ হাসে, 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। সবই জানা গেছে মোটামুটি। এখন শুধু কুয়াশার পাত্তা নেয়া। সেও হয়ে যাবে।'

দুই বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কুয়াশাকে দু'জনেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস কুয়াশার সঙ্গেই বার বার সংঘর্ষ বেধে উঠছে।

শহীদ বলে, 'তোর রিপোর্ট কি বলে? তৈমুর মীর্ধা মৃত?'

'আমার রিপোর্ট তো তাই বলে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারিনি ন'বছর আগের ব্যাপার তো প্রমাণ পত্র খুঁজে বের করা মুস্কিল। আর হাসান মণ্ডলা কি বলে?'

'হাসান মণ্ডলা বলে সে তৈমুর মীর্ধার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মতে তৈমুর মীর্ধা এখনো জীবিত আছে।'

'তৈমুর মীর্ধার জীবিত থাকার সংবাদটা বুঝি মানিকপুরে জানাজানি হয়ে গেছে?'

'আমার মনে হয় না। হোটেল তাজ-এর একজন কর্মচারী চৌধুরী বাড়ির রবিউল্লাহ্‌কে খবরটা দিয়ে কিছু টাকা কামাই করেছে। রবিউল্লা ও সেই কর্মচারীটি রাস্তার একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আমি ছিলাম একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ওদের ঠিক পেছনে। সৌভাগ্যক্রমে ওদের সব কথাই আমার কানে এসেছে।'

'তুই তাহলে ইতিমধ্যে মানিকপুরে বেশ পরিচিত লোক?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। বেহালা বাদক বুরুজ মিঞাকে চেনে না এমন লোক এ তল্লাটে আছে কি না সন্দেহ।

শহীদ একটু হাসলো। বললো, 'হাসান মণ্ডলার সঙ্গে দেখা তো করতে যাচ্ছিস, কিন্তু খুব সাবধান। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি নিষ্ঠুর।'

গাড়ির ভেতর কামাল ও শহীদ কথা বলছিল মৃদু গলায়। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। রাস্তা প্রায় নির্জন। ক্বচিৎ দু'একটা রিক্সা বা এক্কা গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা

করছে। পাতাবাহার রোডের দু'পাশে গাছপালার আড়াল থেকে বাড়ি ঘরের আলো উঁকি দিচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে দূরে কোথাও। খটাখট শব্দ তুলে খাঁসাবের এক্কাগাড়ি এগিয়ে চলেছে হোটেল তাজের দিকে। কলোনী পার হয়ে পড়লো শাল মহুয়ার জঙ্গল। অন্ধকার আরো নিবিড় হয়ে এলো চারপাশে।

কামাল বললো, 'তুই চিঠিতে মাহমুদ সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছিলি। কিন্তু সুলতানা পারভিনের কথা একবারও উল্লেখ করিসনি। ব্যাপার কি?'

'সুলতানা পারভিন বাড়ি থেকে বেরোয় কালে ভদ্রে। বেরোলেও বেরোয় গাড়ি করে। কতবার ফন্দি খুঁজলাম চৌধুরী কুটিরে ঢুকবার। কিন্তু মাহমুদ থেকে শুরু করে বাড়ির বয় বাবুর্চি দারোয়ান পর্যন্ত এক একটা চালাকের ধাড়ি। কিছুতেই চৌধুরী কুটিরে ঢুকতে পারিনি। যদ্দুর মনে হয় সুলতানা পারভিন মনে মনে টের পেয়ে গেছে যে তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র তৈরি হচ্ছে মানিকপুরে। তাই সব সময় সতর্ক হয়ে আছে।'

শাল মহুয়ার জঙ্গল পার হয়ে আবার ফাঁকা রাস্তায় পড়লো গাড়ি। কিছুদূর এগিয়েই থানা ও হাসপাতাল। শহীদ বললো, 'আমাকে এখানেই নামিয়ে দে কামাল। নামার কথা তো ছিলো অনেক আগেই। এক গাড়িতে তোর সঙ্গে বসে এগোনো আর ঠিক হবে না।'

'কাল সকাল বেলা তাহলে আসছিস?'

'হ্যাঁ, বেহালা বাজিয়ে তোকে মুগ্ধ করে দেবে'। তুই একটা বেহালা নগদ চার আনা দিয়ে কিনবি এবং বাজনা শেখাবার জন্যে রোজ বিকাল বেলা আমাকে আসতে আদেশ দিবি। বুঝলি তো?'

'জো হুকুম ওস্তাদ।'

কামাল মৃদু হাসে, থানার চৌহদ্দি পেরিয়ে গাড়ি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ে। কামাল হাঁক দিয়ে বলে, 'খাঁসাব,গাড়ি থামাও, এখানে বুরুজ মিঞা নামবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি থামায় গাড়োয়ান খাঁসাব। বুরুজ মিঞা কামালকে ভারিক্কি রকমের একটা সেলাম ঠুকে গাড়ি থেকে নেমে যায়। গাড়োয়ান খাঁসাবকে খুশি করার জন্য বলে, 'ও খাঁসাব বিড়ি চলবো?'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এলো, 'চলবো!'

'তা নাও একটা বিড়ি। হুজুরকে ভালয় ভালয় পৌছে দিয়ো হোটেলে।

বুরুজ মিঞার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে টান দিচ্ছিলো খাঁসাব। এই কথায় সে অপমান বোধ করলো যেন। বললো, 'হে তোমার কওন লাগবো না, বাপু। আমার কাজ আমিই ভালা জানি। এ তোমার তারের সারেঙ্গী না যে হাত মোচোরা দিবা আর প্যাপো আওয়াজ উঠবো। ইডা অইলো খাঁসাবের গাড়ি। বুঝলা মিঞা?'

বুলন্দ মিঞা বুঝেছে বৈকি। সে আর কথা বাড়ায় না। পথের গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ডানদিকের জানালার কপাটটা নিচে নামিয়ে দেয় কামাল। বাতাস বইছে হু হু করে। বাতাসে শীতের স্পর্শ। অল্প অল্প কুয়াশা চারদিকে। রহস্যময় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে সারা মানিকপুর। রাত কিছুতেই সাড়ে সাতটার বেশি হবে না। এরই মধ্যে মাঝ-রাত্রির নির্জনতা নেমেছে মানিকপুরে।

গাড়ির ভিতর বসে অনেক কথাই ভাবছিল কামাল। এর আগে কতবারই তো মানিকপুরে এসেছে সে। একবার এসেছিল শহীদের বিয়ের পর শহীদ ও মহুয়ার সঙ্গে বেড়াতে। বার দুয়েক এসেছে পিকনিকে। বেগম রশিদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যি ভারি সুন্দর জায়গা এই মানিকপুর। শহরের কল-কোলাহল থেকে মানিকপুরে এসে একটা অনুরূপ মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়। এখানে সীমাহীন মাঠ আছে, উদার আকাশ আছে, ছবির মতো সুন্দর টিলা পাহাড় আছে, ছায়া সুনিবিড় অরণ্য ও অরণ্যের রং-বেরঙের পাখি আছে। প্রতিবারই মানিকপুরে এসে ভালো লেগেছে কামালের। কিন্তু এবারে মানিকপুরে আসার সঙ্গে ভালো লাগা না লাগার সম্পর্ক নেই। আকস্মিক ভাবে মানিকপুর আসতে হয়েছে এবার। ঘটনাচক্রে শহীদ জড়িয়ে পড়লো মানিকপুর হত্যা রহস্যের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো কামালও। বেগম রশিদের বিবৃতি কতদূর সত্যি তা জানার জন্যে কামালকে যেতে হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। তৈমুর মীর্ধা জীবিত কি মৃত তা জানার জন্যে সে লাহোর, পেশোয়ার, লাণ্ডিকোটাল ঘুরেছে। তদন্ত করার পর সে নিশ্চিত যে তৈমুর মীর্ধা মৃত। কিন্তু শহীদের চিঠি পাওয়ার পর সবটা ব্যাপারই দারুণ জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেথ রিপোর্ট বলে তৈমুর মীর্ধা মৃত। এদিকে তার বন্ধু হাসান মওলা এসে দাবি করছে তৈমুর মীর্ধা জীবিত।

কোনটা সত্য, কে জানে?

গাড়োয়ান খাঁসাবের গাড়ি খট খট শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। গাড়ির ভেতর বসে ঘড়িতে সময় দেখলো কামাল। সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। শহীদের খবর অনুযায়ী তাহলে হাসান মওলা এতক্ষণে লক্ষ টাকার মালিক। ব্যাগ-ভর্তি ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা নিয়ে ভোরের জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে হাসান মওলা। কিন্তু ভোর হবার অনেক আগেই হাসান মওলাকে নতুন বিস্ময়ের সম্মুখীন হতে হবে। সুলতানা পারভিন ও তৈমুর মীর্ধার রহস্য ভেদের সবচে' বড় দলিল এই হাসান মওলা। একে কামাল কিছুতেই যেতে দিতে পারে না।

গাড়ির ভেতর নিজের ভাবনায় ডুবে বসে রইলো কামাল। এক্কাগাড়ি পাতাবাহার রোডের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছলো। সামনে কয়েক সারি মেহগনি গাছের নিশ্চুপ ছায়া।

ছায়া পার হতেই কয়েকবার উজ্জ্বল আলো অন্ধকার ধাঁধিয়ে লাফিয়ে উঠলো কামালের চোখে। সামনে হোটেল তাজ। তারও সামনে প্রাচীন স্মৃতির মতো করুণ ও উদাস হয়ে আবছায়ার উপর শুয়ে আছে প্রকাণ্ড রাজা সাহেবের মাঠ। উপরে তারা জ্বালা আকাশ।

হোটেলের সামনে গাড়ি থামালো খাঁসাব। গেটের কাছে দুটো রিকসা আর একটা এক্কাগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কামাল দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলো খাঁসাবের হাতে। বললো, 'তোমার গাড়ি বহুত আচ্ছা খাঁসাব।' চড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি।

খাঁসাব খুসিতে ডগমগ। বললো, 'হুজুর যা দিছেন হেই আমার সাত রাজার ধন! আইজ ধরেন এ গরীবের ষাইট ট্যাকা রুজি অইয়া গেছে কিছুক্ষণের মইধ্যে! আল্লায় দিলে, হুজুর, দিবার পারে।'

'ষাট টাকা রুজি।'

'হ হুজুর। যে ট্রেনে আইলেন হেই ট্রেনে একজন সায়েবরে তুইল্যা দিলাম, হে দিলো একটা পঞ্চাশ ট্যাকার নুট। নাম কইলেই তারে চিনবেন হুজুর। নাম কইতে মানা কইরা গেছে তয় নামডা আর কইলাম না।'

গাড়োয়ান খাঁসাব খুশির চোটে হাসতে লাগলো। বললো, 'রুজি আমার কপালে আছে, হেইটা মারবো কে, কন, হুজুর?'

কামাল ব্যাগটা নিলো। গাড়োয়ান লম্বা সালাম দেয়। হেসে কামাল গেট পার হয়ে হোটেলের ভেতরে ঢোকে। দু'পাশে মৌসুমী ফুলের বাগান। সরু কাঁকর ঢালা পথটা গিয়ে উঠেছে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির মাঝদিকের বারান্দা বরাবর। বারান্দার ছাত টালি দিয়ে তৈরি। দু'পাশে মাধবী লতার ঝাড়, মাঝখানে কার্নিশের উপর ইংরেজি ও বাংলা হরফে হোটেল তাজ কথাটা খোদাই করা।

হোটেলের বিভিন্ন ঘরে আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা দিয়ে সেই আলো এসে পড়েছে বাগানে। বারান্দা জনশূন্য' রিসেপশানেও কেউ নেই। একটা বড় রেজিস্টার বুক-সমান উঁচু টেবিলের উপর খুলে রাখা। রিসেপশানে ঢুকে অবাক হয় কামাল। অনেকবার মানিকপুর এসেছে সে। প্রায় প্রতিবারই এখানে এসে উঠেছে হোটেল তাজে। হোটেল তাজের ব্যবস্থাপনার সুনাম বহু দিনের। কিন্তু এ কেমন ব্যবস্থাপনা যে রিসেপশান খালি রেখে ঘর থেকে কর্মচারী উধাও? সে রিসেপশানে ঢুকে ভাবছে কি করবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে একটা উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেল। কে একজন বললো, 'না তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না মুন্সি। আধ ঘন্টা আগে তোমাকে খবর দিতে বললাম আর তুমি কিনা এখন বলছো মতিনকে পাঠিয়েছ! কেন, তুমি নিজে গেলে কি ক্ষতি হতো শুনি?'

'না স্যার, ক্ষতি আর কি হতো। আমার পায়ে একটা ঘা হয়েছে, হাঁটতে পারি না

ভালো করে, এজন্যে ওকে পাঠিয়েছিলাম। মতিন এতো দেরি করবে কে জানতো স্যার। ঠিক আছে আমিই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, জলদি যাও। কপালে কি আছে আল্লা জানেন।' চার বছর ধরে এই হোটেলে চাকরি করছি, এমন কাণ্ড কখনো দেখিনি বাবা!'

দরজা খুলে যায়। রিসেপশানে ঢোকে ম্যানেজার আইনুল হক ও মুন্সিজী। কামালকে ওভাবে ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ম্যানেজার প্রায় চমকে ওঠে। বলে, 'কে?'

তারপর কামালকে চিনতে পারে। ম্যানেজারের মুখটা ফ্যাকাসে দেখায়। কোন-মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'স্যার আপনি সাড়ে ছ'টার ট্রেনে এলেন বুঝি? তা জিনিসপত্র কোথায়, বাইরে গাড়িতে? দাঁড়ান স্যার···এক মিনিট, একটা বেয়ারা পাঠিয়ে দিচ্ছি। জিনিসপত্রগুলি নিয়ে আসুক।'

বাধা দিয়ে কামাল বলে, 'ব্যস্ত হবেন না হক সাহেব। জিনিসপত্র যা কিছু আমার সঙ্গেই এই ব্যাগে আছে।'

আইনুল হক হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় মুন্সিজীর দিকে।

কড়া গলায় বলে, 'তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মুন্সি? বলি বিপদটা কি আমার বলে ভাবছো নাকি, এ্যাঁ?'

মুন্সি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়।

'আর বলবেন না স্যার।'

ম্যানেজার আইনুল হক বিমর্ষ ভাবে মাথা নাড়ে, 'কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আজ!'

'কি ব্যাপার হক সাহেব? আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'চিন্তিত?'

হক সাহেব কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'শুধু চিন্তিত বলছেন স্যার। উপায় থাকলে ডাক ছেড়ে কাঁদতাম। আপনি স্যার দয়া করে একটু বিশ্রাম করুন---ব্যবস্থা করছি। আমি অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না স্যার! এমন উড়ো ঝামেলায় পড়িনি জীবনে!'

'মনে করার কিছু নেই হক সাহেব। কাজ আছে যখন সেখানেই যান। আমাকে শুধু একটা খবর দিতে হবে।'

'খবর? বলুন স্যার।

'আমি হাসান মওলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দয়া করে এক্ষুণি ব্যবস্থা করুন।'

ম্যানেজার আইনুল হক স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কামালের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'হাসান মণ্ডলার কথা বলছেন?' He is dead, sir, murdered!'

'What do you say!'

কামাল প্রায় লাফিয়ে উঠলো, 'Murdered? কখন খুন হয়েছে?'

'অনুমান করি ঘন্টা দেড়েক আগে। আসুন স্যার দেখাচ্ছি।'

ম্যানেজার আইনুল হক কামালকে হাসান মণ্ডলার ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

ছয়

ভেতরের বারান্দার দু'পাশে টানা দুই সারি ঘর। ম্যানেজার আইনুল হকের পেছনে পেছনে কামাল গিয়ে পৌঁছলো উত্তর প্রান্তে। ডান দিকের ঘরটা হাসান মণ্ডলার। সামনের বারান্দায় কয়েকজন লোক জটলা করছিল। কথাবার্তা বলছিল। ম্যানেজার আইনুল হকের সঙ্গে কামালকে আসতে দেখে ওদের কথাবার্তা থেমে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলি দৃষ্টি কামালের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ম্যানেজার আইনুল হক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না। কামালের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'আসুন, এই ঘরই হাসান মণ্ডলার।'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘর পাহারা দিচ্ছিলো হোটেলের নেপালী দারোয়ান গুরুবন্ত সিং। ম্যানেজার বললো, 'সিংজী, খবর আছে?'

'জ্বি, আছে।'

গুরুবন্ত সিং মাথা নাড়ে 'মুন্সিজী এই ঘরে ঢুকতে চাইলো। আমি দিলাম না তো হামাকে গালিগালাজ করলো।'

'ঠিক হ্যায়, মুন্সিজীকো দেখো লেঙ্গে।'

আইনুল হক গম্ভীর গলায় বলে, 'থানার লোকজন না আসা পর্যন্ত এই ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। বুঝেছো?'

'ঠিক হুজুর।'

গুরুবন্ত সিং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষগুলির দিকে একবার অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে আইনুল হক। পেছনে পেছনে কামাল। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো। ঘরের অপরিসর মেঝের উপর লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে হাসান মণ্ডলার দেহ। মেঝে ভেসে গেছে রক্তে। নাক, ঠোঁট, জামার কলার, বুক রক্তে ভিজে জবজবে। হাসান মণ্ডলা চিৎ হয়ে শুয়ে

আছে। চোখ দুটি বিস্ফারিত। সারা মুখে একটা দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের চিহ্ন। বাঁ হাতের মুঠি বন্ধ করা। ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকানো। কপালের বাঁ পাশে একটা জায়গা ফুলে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না এটা আঘাতের চিহ্ন।

'আমরা মৃতদেহ যেরকম পেয়েছি সেরকম অবস্থায়ই রেখে দিয়েছি। থানায় খবর দিয়েছি বেশ কিছুক্ষণ আগে। দারোগা সাহেব এলেন বলে।'

আইনুল হকের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঘরটা ঘুরে ফিরে দেখলো কামাল। ছোটো ঘর। ঘরের পশ্চিম কোণে সিঙ্গল খাট পাতা, ডান পাশে একটা বন্ধ দরজা। খাটের শিয়রে আলনা আর তেপায়া টেবিল একখানা। পূর্বদিকের জানালা ঘেঁষে একটা টেবিল। চারপাশে গোটাকয়েক সোফা। কামাল দেখলো জুতার কয়েকটা এবড়ো খেবড়ো ছাপ মৃতদেহ থেকে সোজা চলে গেছে পশ্চিম দিকের দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে সে দেখলো বাঁ পাশে একটা পার্টিশন, তারপর একটা কেবিন।

'আপনারা সামনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলেন, তাই না ম্যানেজার সাহেব…?'

একটু থতমত খেয়ে যায় আইনুল হক। বলে, 'জ্বি। আপনি ঠিকই ধরেছেন। সামনের দরজা ভেঙেই আমরা ভেতরে ঢুকেছি। আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল আপনাকে খুলেই বলছি। তার আগে হাসান মওলার কথা একটু বলে নিই।' আইনুল হকের গলার স্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি হাসান মওলা লোকটা তেমন সুবিধের ছিলো না। মানিকপুরে এসেছে ধরুন আজ পাঁচদিন। এরই মধ্যে নানারকম কাণ্ড হয়ে গেছে হোটেলে। প্রথম যেদিন এলো সেদিন রিসেপশানে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বললে বিশ্বেস করবেন না একটা ছায়ামূর্তি জানালার কাছে ঘাপটি মেরে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল। আমরা টের পেয়ে যেতেই এক সেকেণ্ডের মধ্যে ছায়ামূর্তিটা কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল আল্লামালুম। রকম সকম দেখে আমি হোটেলে কেয়ার টেকার মুন্সিজীকে লোকটার পেছনে লাগিয়েছিলাম। তা অতো যে চালাক চতুর মুন্সিজী সে পর্যন্ত লোকটার সঠিক হদিস বের করতে পারলো না। শুধু এইটুকু জানা গিয়েছিল হাসান মওলা মানিকপুরে এসেছে চৌধুরী বাড়ির মাহমুদ সাহেবের কাছে। কি একটা টাকার ব্যাপার ছিলো তার সঙ্গে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে লোকটা হোটেল থেকে চলে গেলে আমরা বাঁচি। দারুণ খলিফা লোক, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। বেশি কথাবার্তা বলতো না, কিন্তু তাকাতো এমন কড়া নজরে যে মনে হতো সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচোয়া। আমি তো সাহেব একদিন খাতির জমাতে গিয়েছিলাম। তা কি বললো শুনবেন?'

আইনুল হকের চোখ মুখ রাগে আর অভিমানে ভারি দেখায়। বলে, 'বললে।

দরকার ছাড়া আমি কথা বলি না। দয়া করে ঘর থেকে বেরোন। আমি আর কথা বলি না কি? যা কিনা বদরাগি চোখ আর কড়া মেজাজ, আমি চুপ করে সেখান থেকে সরে পড়লাম। হাসান মওলার ঘরে আর যাইনি।'

কামাল বললো, 'হাসান মওলা এখানে আসার পরে নানা রকম কাণ্ড ঘটে গেছে বললেন না?'

'হ্যাঁ বলছি। হাসান মওলা এখানে আসার পরদিন রাতে এক মহিলাকে হাসান মওলার ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিলাম। মহিলার আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা। হাসান মওলার ঘর থেকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মহিলাটি মাঠে নামলো। মাঠে নেমে মহিলা যে কোনদিকে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। শুধু কিছুক্ষণ পর রাজা সাহেবের মাঠে একটা মোটর গাড়ির গর্জন শুনলাম। উত্তর দিক থেকে। গর্জনটা পাতা বাহার রোডের দিকে চলে গেল। রাত তখন ধরুন দুটোর কম না। আর এক রাতের কথা বলি শুনুন। সে রাতেও হোটেলের হিসাবপত্র মেলাতে মেলাতে রাত একটা হয়ে গিয়েছিল। ঘুম আসছিল না বলে বাগানে চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। আকাশে ছিলো কৃষ্ণপক্ষের একাদশী চাঁদ। চাঁদের ম্লান আলোয় বাঁ'দিককার রাজা সাহেবের মাঠটা ভৌতিক দেখাচ্ছিল। চেয়ারে বসে ঢুলুনি আসছিল, তো ভাবলাম এই বেলা গিয়ে শুয়ে পড়ি। হঠাৎ দেখলাম কি জানেন?'

'কি?'

'অবাক কাণ্ড স্যার। দেখলাম রাজা সাহেবের মাঠের বহুদূরে একটা নীল আলো জ্বলে উঠলো তিনবার। আর হাসান মওলা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠে নেমে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে শুনে ভয়ে বাঁচি না স্যার।'

কামাল একাগ্র মনে শুনছিল। বললো, 'তারপর?'

'হাসান মওলার কথা কতো বলবো স্যার। হোটেল তাজে এসে উঠেছে আজ নিয়ে পাঁচদিন। এরই মধ্যে কতো কাণ্ড ঘটে গেল। আজকের সন্ধ্যার কথাই ধরুন না কেন? সাড়ে পাঁচটার দিকে চা খেয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়েছে একেবারে ফুল বাবুটি হয়ে। পরনে দামী স্যুট, হাতে ছড়ি। তা খোশ মেজাজে ছিলো বোধহয়। গেটের কাছে বাগানে আমার সঙ্গে দেখা হতেই বললো, 'আমি কাল ভোর বেলা চলে যাচ্ছি হক সাহেব। রাত্রিবেলা আমার বিল পাঠিয়ে দেবেন।'

আমি বললাম, 'তা পাঠিয়ে দেবো স্যার! মানিকপুরে বেড়ানো বুঝি হয়ে গেল?'

কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিল হাসান মওলা। বলেছিল, 'আমি তো বেড়াতে আসিনি হক সাহেব, কাজে এসেছিলাম।'

একটু থেমে চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছিল, 'মানিকপুর নাকি একটা বেড়াবার

জায়গা, ছোঃ! একটা মাঠ, কিছু জঙ্গল আর এইতো আপনার বাহারের হোটেল! এ আবার দেখতে আসে কেউ?'

কথার রকম শুনলেন স্যার! মানিকপুর দেখবে বলে হাজারে হাজারে লোক প্রতি বছর আসে। আর তিনি ভারি একটা জাঁহাবাজ লোক...তিনি মানিকপুরের নামে নাক সিটকালেন। কথা শুনে স্যার ইচ্ছে হয়েছিল দিই ব্যাটাকে ভাল-মন্দ কিছু শুনিয়ে। তা বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, বছর পাঁচ ধরে হার্টের অবস্থাটা ভালো যাচ্ছে না। ধমক-টমক ঝাড়লেই হার্টটা ধ্বক ধ্বক করে ওঠে। তাই কথা বাড়ালাম না।

কামাল বুঝলো হক সাহেব আলাপী মানুষ। আলাপ শুরু করতে জানে, শেষ করতে জানে না। সে বললো, 'তারপরের কথা বলুন।'

'বলছি স্যার। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হাসান মণ্ডলা তো গেলেন রাজা সাহেবের মাঠে বেড়াতে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম দরজার বাইরে থেকে তালা মারা। বিল নিয়ে গিয়েছিলাম, ওই কাজটা নিজেরা করলেই সায়েব-সুবো লোক খুশি হন, তাই তেমন খরিদ্দার হলে বিল নিয়ে আমিই যাই। তা ঘর তালা মারা দেখে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা কাতরানির শব্দ পেলাম। প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। তাই ভালো করে কান পাতলাম। আর কোনো সন্দেহ রইলো না। ঘরের ভেতর থেকে একটা কাতরানিরই শব্দ আসছিল। তালা মারা দরজা টান দিয়ে যেটুকু ফাঁক হয় সে ফাঁকে যা দেখলাম তাতে চমকে উঠলাম স্যার। দেখলাম হাসান মণ্ডলা মেঝেয় পড়ে রক্তের বন্যার ভেতর শুয়ে কাৎরাচ্ছে। সবটা ব্যাপারই ভৌতিক মনে হলো। ঘর তালা মারা, এদিকে ঘরের ভেতর রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছে হাসান মণ্ডলা। আমার হাঁকডাকে লোকজন এসে জড়ো হলো। সবাই মিলে চিৎকার করে ডাকলাম হাসান মণ্ডলাকে। কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষে তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম পশ্চিমের দরজা হাঁ করে খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে, মেঝেয় অচেতন হয়ে রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছে হাসান মণ্ডলা। সৌভাগ্যক্রমে হোটেলে একজন ডাক্তার এসেছেন আজ দু'দিন হয়। তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন তাঁর কিছু করার নেই। He is dead.'

আইনুল হক কথা বলতে বলতে থেমে যায়। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখন বাজে আটটা পাঁচ। ঘটনাটা ঘটেছে এখন থেকে ধরুন দেড় ঘন্টা আগে। ডাক্তার হাসান মণ্ডলাকে মৃত বলে ঘোষণা করার পরই আমি পশ্চিমের দরজা বন্ধ করে সব লোকজন বের করে দিয়ে পাহারা বসিয়েছি। থানায় আগেই লোক পাঠিয়েছিলাম। দারোগা সাহেবের আসতে দেরি দেখে মুন্সিজীকে আবার পাঠিয়েছি। খোদা একি বিপাকে ফেললেন এইসব ভাবছিলাম, তখন স্যার আপনি এলেন। এ বোধহয় খোদারই

ইচ্ছা।'

আইনুল হক হাত কচলিয়ে করুণ হাসলো, 'নিরীহ লোকদের বাঁচাতে বোধহয় খোদা এখানে আপনাকে পাঠিয়েছেন স্যার! আমাদের একটু দেখবেন স্যার...ছাপোষা নিরীহ ভদ্র সন্তান স্যার...পেটের দায়ে হোটেলে চাকরি করতে এসেছি। দেখুন দেখি কি বিপদেই না জড়িয়ে পড়লাম...'

আইনুল হকের অবস্থা প্রায় কেঁদে ফেলার মতো। কামাল বলে, 'নির্দোষ লোকদের ভয় কি হক সাহেব। আপনি ব্যস্ত হবেন না। হাসান মণ্ডলার ব্যাপারে আমি নিজে জড়িত হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তা নিশ্চয়ই করবো।'

ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো আইনুল হক। কামাল পশ্চিমের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজার ঠিক নিচে থেকেই আরম্ভ হয়েছে বিশাল রাজা সাহেবের মাঠ। চারপাশে কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটি অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে রাজা সাহেবের মাঠে। একটা রহস্য যেন থমথম করছে চারদিকে। অভিজাত হোটেল তাজে আজকের সন্ধ্যা এমন ভাবে নামবে কে জানতো? বাইরে অন্ধকার রাত্রি, ঘরের ভেতর আলোর নিচে রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছে অতি শক্তিশালী, অতি ধুরন্ধর হাসান মণ্ডলা।

কামাল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো এমন সময় হুড়মুড় করে মোটা শরীর নিয়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকলো দারোগা সমশের শিকদার। সঙ্গে দু'জন পুলিস, একজন জমাদার। আইনুল হক যথারীতি তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান কামালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, প্রকাণ্ড থাবা তুলে তাকে বাধা দিয়ে সমশের শিকদার সবিস্ময়ে বললো, 'কামাল সাহেব না?'

'খুব অবাক হয়েছেন নিশ্চয় এখানে আমাকে দেখে?'

স্বভাব-সিদ্ধ প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে শিকদার বললো, 'অবাক হবো না, বলেন কি সাহেব? এতদিন কাগজে-পত্রে শার্লক হোমসদের কথা পড়েছি এখন সেটা দেখছি বাস্তবে একেবারে চোখের সামনে, যাকে বলে যথারীতি ঘটনাস্থলে, অবাক হবো না!'

কামাল হেসে ফেলে বলে, 'ঠাট্টা করছেন করুন! এখন আসুন এদিকে। দায়িত্ব বুঝে নিন।'

'তা তো বটেই, কথায় বলে পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তবে যাই বলেন, এ ব্যাপারে আপনার হেল্‌প কিন্তু আগে থেকেই চেয়ে রাখলাম।'

সমশের সিকদার এবার হাসান মণ্ডলাকে নিয়ে পড়ে। মৃতদেহ যথারীতি তদন্তের পর ঘর সার্চ করা হলো।

খাটের নিচে পাওয়া গেল একটা লাল টকটকে গোলাপ ফুল, বোধহয় ঘন্টা দুয়েকও হয়নি গাছ থেকে ছেঁড়া হয়েছে ফুলটা। এ ছাড়া পাওয়া গেল ইংরেজিতে 'এম' খোদাই

করা একটা কালো রঙের সিগারেট লাইটার। হাসান মওলার ডান হাত প্যান্টের পকেটে একটা ল্যুগার পিস্তল ধরে আছে। খুব সম্ভব আত্মরক্ষার জন্য প্যান্টের পকেট থেকে লুকানো পিস্তলটা বের করতে গিয়েছিল হাসান মওলা। কিন্তু তার আগেই আততায়ীর আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে সে। যদ্দুর মনে হয় শক্ত কোনো একটা হাতল দিয়ে আঘাত করা হয়েছে কপালের পাশটায়। সম্ভবতঃ আঘাতটা নাকেও লেগেছিল। প্রচুর রক্ত-ক্ষরণ হয়েছে শরীর থেকে। মেঝে ভিজিয়ে রক্তের ধারা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের চারদিকে।

ঘর সার্চ করার পর যথারীতি কয়েকজনের জবানবন্দী নেয়া হলো। প্রথমে সবটা ঘটনা খুলে বললো আইনুল হক। ঘটনার বিবরণ মোটামুটি এইরকম দাঁড়ালো, 'হাসান মওলা বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানিকপুর এসেছিল। যেদিন সে মানিকপুর আসে সেদিনই সন্ধ্যায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে আশেক মাহমুদের। দুজনের ভেতর কথাবার্তায় ঠিক হয় হাসান মওলা বিশেষ একটা গোপনীয় ব্যাপার চাপা দিয়ে রাখবে, বদলে হাসান মওলাকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দেবে মাহমুদ। হাসান মওলা লোকটা তেমন সুবিধের ছিলো না। তার চাল-চলন ও কথাবার্তা ছিলো সন্দেহজনক ও আপত্তিকর। আজ বিষ্যুদবার সন্ধ্যা সাতটায় মাহমুদের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার কথা ছিলো তার। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রাজা সাহেবের মাঠের দিকে সে বেড়াতে যায়। আইনুল হক হোটেলের বিল নিয়ে তার ঘরের সমুখে গিয়ে তালা মারা বন্ধ ঘর থেকে কাৎরানির শব্দ শুনতে পায়। তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে হাসান মওলাকে রক্তাক্ত মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া গেল। হোটেলে অবস্থানরত এক ডাক্তার তার চিকিৎসার ভার নেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হাসান মওলার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে হাসান মওলা কোনো কথা বলে যায়নি।'

আইনুল হকের জবানবন্দী শুনে গম্ভীর হয়ে ওঠে সমশের শিকদারের চোখ-মুখ। সে বলে, 'এইবার যে ডাক্তার হাসান মওলাকে attend করেছিলেন তাকে ডাকুন।'

ডাক্তারের নাম আবদুর রহিম তরফদার। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বছর খানেক আগে। তাঁর বাড়ি যশোহরে। তবে বর্তমানে ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। মানিকপুরে সস্ত্রীক এসেছেন চেঞ্জে।

'ডাক্তার সাহেব।'

সমশের শিকদার জেরা করতে শুরু করে, 'হাসান মওলার মুমূর্ষু অবস্থায় আপনি তার চিকিৎসা করেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, নাড়ী পরীক্ষার নাম যদি চিকিৎসা বলেন তাহলে তা করেছি।' ডাক্তার ম্লান হাসেন। বলেন, 'আমাকে কিছুই করতে হয়নি। খবর পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি এসে

দেখলাম হাসান মওলার তখনো একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। ভাবছি একটা কোরামিন ইনজেক্ট করবো, এই সময় হঠাৎ নাকের কাছটা জোরে একবার ফুলে উঠলো। এক ঝলক টাটকা রক্ত বেরিয়ে এলো নাক থেকে। নাড়ী ধরে বুঝলাম সব শেষ হয়ে গেছে।'

'কিসে হাসান মওলার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন?'

'আপনাদের ক্রিমিনলজি টার্মে সেটা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ধরতে গেলে এক নাড়ী টেপা ছাড়া আর কিছুই করিনি। সুতরাং টেকনিক্যালি কিছু বলতে যাওয়া এক্ষেত্রে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাইরে থেকে যদ্দুর মনে হয় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলেই হাসান মওলার মৃত্যু হয়েছে।'

'অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ, হুঁ!'

সমশের শিকদার কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলো। তারপর কামালকে বললো, 'আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন?'

'না।' পরের জনকে ডাকুন।

পরের ব্যক্তি মতিন, হোটেল তাজের বেয়ারা। সে যা বলে তার মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নেই। শুধু এটুকু জানা গেল হাসান মওলার দেখাশুনার জন্যে তাকে হোটেল কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করেছিল। প্রাণপণে কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছে সে। 'তার মতে হাসান মওলা অবশ্য গোঁয়ার ধরনের লোক ছিলো। তবে মাঝে মাঝে বয় বেয়ারাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করতো না সে। এই তো যেদিন হোটেল তাজে এলো সেদিনই মতিনকে সে একটা খামে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল চৌধুরী বাড়িতে মাহমুদ সাহেবের কাছে। এই সামান্য কাজটুকু করে দেবার জন্য বকশিশ মিলেছিল দশ টাকা।

পরের ব্যক্তি হোটেল তাজের কেয়ার টেকার মুন্সিজী। রবিউল্লার সঙ্গে তার চুক্তি থেকে শুরু করে আড়ি পেতে মাহমুদ ও হাসান মওলার কথাবার্তার সব ব্যাপারই সে খুলে বললো। সমশের শিকদার বললো, 'এখন আর কথা কি? কেসটা একেবারে পানির মতো সহজ এখন। যাও মুন্সি, তুমি এখন যেতে পারো।'

'দাঁড়াও।'

কামাল মুন্সির দিকে ফিরে তাকায়। বলে, 'মুন্সি, তোমার পায়ে কি হয়েছে?'

মুন্সি অম্লান বদনে বললো, 'হোঁচোট খেয়েছিলাম স্যার, তাইতে ডান পাটা একটু মচকে গেছে।'

'এই অঘ্রাণ মাসে হোঁচোট! তুমি নিশ্চয়ই খুব অসাবধানী মানুষ মুন্সি। তা এই হুঁশ নিয়ে তুমি বেলগাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিলে?'

'কি বললেন, ডাকাতি? ব্যাটা তাহলে ডাকাত। বলেন কি অ্যাঁ?'

সমশের শিকদার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মুন্সিজীর দিকে। দেখতে দেখতে ভয়ে,

আশঙ্কায় কালো হয়ে ওঠে মুন্সিজীর চোখ মুখ।

কামাল বলে, 'আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি মুন্সিজী। কি পুরোনো কথা মনে পড়ছে না?'

'মনে পড়বে না কেন হুজুর। কিন্তু দোহাই আল্লার, বিশ্বেস করুন, আমি ওসব হারাম ছেড়ে দিয়েছি। বেলগাঁয়ের ডাকাতির মামলায় সাত বছরের জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে মসজিদে গিয়ে তওবা করে ছেড়ে দিয়েছি ওসব শানতের কাজ। এখন আমি হালাল রুজি করি, হালাল খাই।'

'তা বটে। তবে এখনো মাঝে মাঝে পূর্ব দোষ রক্তের ভেতর চাঁড়া দিয়ে উঠে, তাই না? মিথ্যে কথা বলো না মুন্সি, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে বলো।'

মুন্সি চট করে জবাব দেয় না? মাথা নিচু করে গুম্ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। মনে মনে কি যেন ভাবলো সে। দেখতে দেখতে তার চোখে মুখে ফুটলো দৃঢ়তার ছাপ। বললো, 'হুজুর আমার গুনাহর অন্ত নেই। মসজিদের মাটি ছুঁয়ে তওবা করেছিলাম গুনাহর কাজ আর করবো না। কিন্তু লোভে পড়ে আমি আবার খারাপ কাজ করতে যাচ্ছিলাম। ডাকাতির নেশায় আবার আমাকে পেয়ে বসেছিল হুজুর। বিশ্বেস করুন, আর আমি মিথ্যে বলবো না। হ্যাঁ, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সাত নম্বর কেবিনে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো ঠিক করেছিলাম। এক লক্ষ টাকা জীবনে দেখিনি হুজুর? সেই টাকা কে না কে হাসান মণ্ডলা মানিকপুর থেকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক করেছিলাম, এটা হতে দেবো না। তা সাত নম্বর কেবিনে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। আমিও ঢুকলাম আর হাসান মণ্ডলাও পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।'

'তুমিও আর তাল সামলাতে পারোনি, পাশ ফিরতে গিয়েছো অমনি গাদা করে রাখা একরাশ পুরোনো আসবাবপত্র থেকে একটা টেবিল এসে পড়লো তোমার ডান পায়ে, তাই না মুন্সি?'

'হুজুর সবই জানেন।'

'আচ্ছা মুন্সি, একটা লোক পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছিল, তারপর একই রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিল, লোকটাকে তুমি দেখেছো?'

'দেখেছি হুজুর।'

'লোকটা কে?'

মুন্সি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর বললো, 'হুজুর, আপনি তো সবই জানেন। লোকটা মাহমুদ সাহেব।'

'মাহমুদ সাহেব!'

ঘরের মধ্যে সমবেত আর্তধ্বনি উঠেই মিলিয়ে গেল।. বিরাজ করতে থাকলো একটা অসহ্য নীরবতা।

নীরবতা ভঙ্গ করলো কামাল। বললো, 'শিকদার সাহেব, এখন আমাদের দরকার আরো তিন ব্যক্তির জবানবন্দী। আপাততঃ একজনকে মানিকপুরে পাওয়া যাবে না। রবিউল্লাহ আর মাহমুদ সাহেবকে এত্তেলা দিন। ওদের জবানবন্দী নেয়া প্রয়োজন।'

'আরো জবানবন্দী নিতে চান নিন, আসল ব্যাপার কিন্তু বেরিয়ে গেছে…'

শিকদার কৌতূহলী নেত্রে তাকায় কামালের দিকে, 'কি সায়েব বেরোয়নি?'

কামাল একটু মজা করার জন্য বললো, 'আপনি নিজে যখন চেপে ধরেছেন তখন বেরোবে না মানে?'

প্রশংসায় যথেষ্ট আনন্দ পায় শিকদার। হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দিয়ে তারপর একটু বিনয় করে বলে, 'না, না…এমন আর কি করলাম!' করলেন তো সায়েব আপনি–ই। তবে হ্যাঁ, আমি ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। বলতে পারেন বটে যে এসব খুন–খারাপীর তদন্তে এসে আমার মাথা খুলে যায়। ছোটো বেলা থেকেই আমার ব্রেন যাকে বলে mathematical. মেট্রিক পরীক্ষায় তো সায়েব মাত্র সতেরো নম্বরের জন্য লেটার পেলাম না।'

'খুবই আফসোসের কথা! আসুন আমরা বাকি কাজটুকু সেরে ফেলি।'

'চলুন, চলুন।'

সমশের শিকদার বিপুল বপুটি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরে পাহারা বসাবার ব্যবস্থা হয়। আইনুল হকের অনুরোধে ওরা সবাই গিয়ে বসে বসবার ঘরে। চা নিয়ে আসে বেয়ারা মতিন। চায়ে চুমুক দিয়ে সমশের শিকদার মাত্র সিগারেটটি ধরিয়েছে এমন সময় ঘরে এসে ঢোকে রবিউল্লাহ আর মাহমুদ।

'আপনারা এসেছেন ভালই হয়েছে, বসুন।'

সমশের শিকদার মাথা নাড়ে, 'আমি এক্ষুণি আপনাদের জন্যে লোক পাঠাতে যাচ্ছিলাম।'

'তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আমরা…'

মাহমুদ তিক্ত হাসি হাসলো, 'আমি আর রবিউল্লাহ সাহেব খবরটা শুনে নিজেরাই এসেছি।'

'ভালো। আপনাদের কর্তব্য পরায়ণতায় আমাদের অসীম বিশ্বাস। তা মাহমুদ সাহেব, ইনি (কামালকে দেখিয়ে) আপনাকে কতগুলি প্রশ্ন করবেন। আশা করি যথাযথ জবাব দিতে আপত্তি নেই আপনার।'

'আগে তো প্রশ্নের ধরনটা শুনি, তারপর আপত্তি আছে কি নেই বোঝা যাবে।'

মাহমুদ ও রবিউল্লাহ দুজনেই বসলো। কামালের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে রবিউল্লাহর দিকে ফিরে তাকালো।

'রবিউল্লাহ সাহেব।'

'বলুন…'

'আপনি হাসান মওলার পেছনে মুন্সিজীকে লাগিয়েছিলেন এটা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, সত্য।'

'কেন জানতে পারি?'

'তা নিশ্চয়ই পারেন। এ ব্যাপারে ধরুন লুকোলুকির কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। হ্যাঁ, মুন্সিজীকে আমিই হাসান মওলার খবরাখবর নেয়ার জন্যে বলেছিলাম। হাসান মওলার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা রাস্তায়! উনি আমাকে হোটেল তাজের পথ কোনটা জিজ্ঞেস করলেন, আমি পথ বলে দিলাম। তারপর উনি মিসেস সুলতানা পারভিন কোথায় আছে, জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন যে তাতে ধরুন আমার একটু সন্দেহ হয়। আমি কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করি। কিন্তু লোকটা এমন অভদ্র যে আমার কথার জবাব পর্যন্ত দিলো না। আমার তখন ধারণা হয় লোকটা নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলবে মানিকপুরে এসেছে। তখন আমি হোটেল তাজে আসি। ম্যানেজার আইনুল হক জানালেন লোকটার নাম হাসান মওলা, বাড়ি মেহগনি রোড, ময়মনসিংহ—পেশা ব্যবসা। আমি ম্যানেজারকে সন্দেহের কথা বলায় তিনিই ধরুন গে আপনার হাসান মওলার খোঁজ খবর নিতে মুন্সিজীকে পেছনে লাগিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, লাগিয়েছিলাম,' আইনুল হক জবাব দেয়, 'হোটেলের চাকরিতে ব্যবসাগত কারণে ছোটখাট গোয়েন্দাগিরি আমাদের করতেই হয়। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে যাবে কে জানতো স্যার?'

কামাল আর প্রশ্ন করলো না রবিউল্লাহকে, শুধু জিজ্ঞেস করলো, 'আজ সন্ধ্যে ছ'টা থেকে এতক্ষণ নিশ্চয়ই বাড়িতে ছিলেন?'

'জ্বি না। আমি ফার্মের হিসাব পত্র দেখছিলাম এতক্ষণ। হাসান মওলার মৃত্যুর খবরটা রটে গেছে বাইরে। শুনে আর থাকতে পারিনি, চলে এসেছি।'

কামাল মৃদু হাসলো। বললো, 'হাসান মওলার মৃত্যুর ঘটনা শুনে আপনিও নিশ্চয়ই স্থির থাকতে পারেননি মাহমুদ সাহেব, ছুটে এসেছেন দেখতে, তাই না?'

'ঠিক তাই। আপনারা যা খুশি ভাবুন, ইডিয়েটটা মরেছে শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি।'

'ইডিয়েটটা কিন্তু মরেনি, তাকে মারা হয়েছে।'

একটু বিষণ্ন ভাব ধারণ করে মাহমুদ। বলে, 'হ্যাঁ, ঐ যা একটু দুঃখের ব্যাপার। তা ওকে মারলো কে?'

'আপনি মেরেছেন,' মাহমুদের উদ্ধত ভঙ্গি দেখে রাগে আর থাকতে না পেরে হুঙ্কার ছাড়ে সমশের শিকদার, 'ইট ইজ ইউ, আপনি!'

কঠোর হাসি হাসে মাহমুদ। বলে, 'বুঝে শুনে কথা বলুন ইন্সপেক্টর। আমি হাসান মওলাকে মারতে যাবো কেন শুনি?'

কামাল বলে, 'কেন মারতে যাবেন সে কথা এখন থাক। আচ্ছা মাহমুদ সাহেব, হাসান মওলা মানিকপুরে কেন এসেছিলেন বলতে পারেন?'

'অন্ততঃ একটা কারণ বলতে পারি। হাসান মওলা মনিকপুর এসেছিল ভাঁওতা দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে।'

'আপনি টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছিলাম। লোকটা ছিলো অতি ধুরন্ধর। সে আমাদের পারিবারিক সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে সম্মান রক্ষার তাগিদে টাকা দেয়ার অঙ্গীকার আমাকে করতেই হলো।'

'তা টাকা আপনি দিয়েছেন?'

'না। এখন ভাবছি আমি ভাগ্যবান। টাকা দেবার আগেই ধুরন্ধর হাসান মওলার মৃত্যু হয়েছে।'

কামাল একটু হাসলো মাহমুদের কথায়। বললো, 'সন্ধ্যার পর এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন জানতে পারি মাহমুদ সাহেব?'

'আমি বাড়িতেই ছিলাম, আবার কোথায় থাকবো?'

'বাড়ি থেকে এই সময়ের মধ্যে একবারও বেরোননি?'

'জ্বি না।'

'অস্বীকার করছেন? বেশ…'

কামাল হঠাৎ বের করে দেখায় কালো রঙের সিগারেট লাইটারটা। বলে, 'এম' মনোগ্রাম করা লাইটারটা কার মাহমুদ সাহেব, আপনার না?'

'আরে, আরে…'

মাহমুদ যেন ভয়ানক অবাক হয় লাইটারটা দেখে। বলে, 'এ দেখছি আমারই লাইটার। কোথায় পেয়েছেন?'

'কোথায় পেয়েছি তা যথাসময়েই আপনাকে বলা হবে। তাহলে মাহমুদ সাহেব, এটা আপনার জিনিস?'

'জ্বি! দিন পাঁচেক আগে ওটা চুরি গিয়েছিল। কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

'আপনি খুব মনভুলো মানুষ দেখছি।'

কামালের ঠাট্টায় চেঁচিয়ে ওঠে মাহমুদ, 'কি বললেন?'

'মাহমুদ সাহেব, মিথ্যেই আপনি লুকোবার চেষ্টা করছেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সোয়া সাতটার মধ্যে আপনি হাসান মণ্ডলার ঘরে এসেছিলেন।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে মাহমুদ। বলে, 'আপনি দেখছি সিরিয়াস লোক সাহেব!' আরে হ্যাঁ, একটা কথা ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি আজ সাড়ে ছ'টার সময় হাসান মণ্ডলার ঘরে গিয়েছিলাম বটে। কিন্তু বাইরে থেকে হাসান মণ্ডলার ঘর তালা বন্ধ ছিলো বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই ফিরে এসেছিলাম।

'সামনের দরজা তালা মারা দেখে বুঝি পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন?'

এবারে একটু যেন চমকে ওঠে মাহমুদ. কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয়। তার চোখ মুখ কঠোর ভাব ধারণ করে। বলে, 'যা খুশি ভাবুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার যা বলার ছিলো বলেছি। কথা মতো টাকা দিতে গিয়েছিলাম হাসান মণ্ডলাকে। দরজায় তালা মারা দেখে ফিরে এসেছিলাম। ব্যাস, এর বেশি কিছু আমার বলার নেই।'

মাহমুদের পরে আরো দু'একজনের জবানবন্দী নেয়া হলো। হোটেলের এখানে ওখানে তখন লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে চারদিকে। বারান্দার ভিড় ঠেলে মৃতদেহের কাছে এগোচ্ছিলো কামাল, সমশের শিকদার ও তার দলবল। হঠাৎ সামনে দেখা গেল অপরিচিত এক মূর্তি। পরনে কালো রঙের সার্জের স্যুট, হাতে ছড়ি, মাথায় জিন্নাহ টুপি। লোকটা লম্বা চওড়া। প্রকাণ্ড নাকের নিচে ছাঁটা পুরু গোফ। বয়েস ষাটের উপর হবে, কিন্তু শরীর বেশ শক্ত সমর্থ।

'আমি আটটা ত্রিশের গাড়িতে মানিকপুরে এসেছি।' লোকটা কামাল ও সমশের শিকদারের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমার জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলাম এখানে। আমার বহুকালের পুরোনো বন্ধু। বন্ধু চিঠিতে জানিয়েছিলেন তিনি মানিকপুর হোটেল তাজের আট নম্বর কেবিনে অবস্থান করছেন। হোটেলে এসে শুনছি আট নম্বর কেবিনে যিনি থাকতেন তিনি নাকি কিছুক্ষণ আগে রহস্যজনক ভাবে খুন হয়েছেন। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করবেন। আমি এসব কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না।'

সমশের শিকদার বললো, 'আপনার বন্ধুকে দেখে আপনি চিনতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই পারবো! একদিন দু'দিনের বন্ধুত্ব তো নয় যে কিছুদিনের অদেখায় চেহারা ভুলে যাবো। ক্যাম্প জীবনের বন্ধুত্ব সে কি ভুলবার?'

'আসুন আমাদের সঙ্গে...'

সমশের শিকদার আহ্বান জানায় অপরিচিত বৃদ্ধকে। ঘরের দরজায় পাহারা দিচ্ছে বন্দুকধারী দুজন সিপাই। ঘরের ভিতর ফ্যাকাসে আলো জ্বলছে। কালচে রক্তের উপর পড়ে আছে হাসান মণ্ডলার মৃতদেহ।

মৃতদেহ দেখেই সভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসে বৃদ্ধ। গলা চিরে বেরিয়ে আসে একটা তীব্র আর্তনাদ, '**My God!**' এ যে দেখছি আমার সেই বন্ধু, তৈমুর মীর্ধা!

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কুয়াশা-৬

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

মানিকপুরের বিখ্যাত ধনপতি চৌধুরী আলী নকীব রহস্যজনক ভাবে এক সংবর্ধনা সভায় অদৃশ্য আততায়ীর হাতে খুন হন। ঘটনাচক্রে শহীদ খান সেখানে উপস্থিত ছিলো। অন্ধকার কক্ষে চৌধুরী আলী নকীব যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করছিলেন তখন শহীদ একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে পালাতে দেখে। সে ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, কুয়াশা। শহীদ খান কুয়াশাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কিন্তু খুনী কুয়াশার যতো প্রতিভাই থাকুক, তাকে সে ক্ষমা করতে পারে না। চৌধুরী আলী নকীবের হত্যা রহস্য ভেদ করার ভার পড়ে শহীদ খান ও কামালের উপর। শহীদের নির্দেশে সুলতানা পারভিনের প্রথম স্বামী তৈমুর মীর্ধার ব্যাপারে তদন্তের জন্য কামাল পশ্চিম পাকিস্তানে গেল। তদন্ত শেষে তার ডাক পড়লো মানিকপুরে। মানিকপুরে হাসান মওলা নামে কে একজন তৈমুর মীর্ধার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে গোপনে টাকা বাগাতে চেষ্টা করছে সুলতানা পারভিনের ভাই মাহমুদের কাছ থেকে। কামাল বুঝলো হাসান মওলাই হচ্ছে মানিকপুর হত্যা রহস্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে ধরতে পারলেই সব রহস্যের সমাধান হয়। মানিকপুর এসে হোটেল তাজে উঠলো কামাল। হাসান মওলা হোটেল তাজেই আস্তানা গেড়েছে। হোটেল তাজে পৌঁছেই সে ম্যানেজার আইনুল হকের কাছে হাসান মওলার খোঁজ করলো। আইনুল হক জানালো অল্প কিছুক্ষণ আগে হাসান মওলাকে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কামাল চমকে উঠলো। তার সব ভরসা নিরর্থক মনে হলো। হাসান মওলার ঘরে থানার ও. সি. মি. শিকদারের সঙ্গে দেখা হলো। হাসান মওলার ঘর সার্চ করে, 'এম' মনোগ্রাম করা একটা সিগারেট লাইটার ও একটা সদ্য ছেঁড়া গোলাপ ফুল পাওয়া গেল। সারা হোটেল ভয়ে, আশঙ্কায় থম্ থম্ করছে। ঠিক এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো এক আগন্তুক। প্রৌঢ় ব্যক্তি। মৃত হাসান মওলাকে দেখে সে ভয়ে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বললো, 'আরে, এই যে দেখছি তৈমুর মীর্ধা!'

কামাল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে। পরনে কালো সার্জের স্যুট, মাথায় জিন্নাহ টুপি। বয়স ষাটের কম হবে না। শরীর স্থূলকায়। চোখ হিংস্র

শ্বাপদের মতো জ্বলছে।

'আমি বলছি এই লোকটা তৈমুর মীর্ধা। হাসান মওলা আপনারা কাকে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

দারোগা শমসের শিকদার বললো, 'যাকে আপনি তৈমুর মীর্ধা বলছেন তাকেই আমরা হাসান মওলা বলে চিনি। লোকটা নিজেই ঐ নামে এসে হোটেলে উঠেছে।'

আগন্তুক বৃদ্ধ বললো, 'দেখুন, তা হতে পারে। বিশেষ কারণে হয়তো নাম পাল্টাবার দরকার পড়েছিল।'

কামাল বললো, 'তৈমুর মীর্ধা আপনার কে হতো?'

'বন্ধু।' আমরা এক সঙ্গে অনেকদিন এক জায়গায় ছিলাম। পরে তৈমুর মীর্ধা গেল নিরুদ্দেশ হয়ে, আর আমি…'

লোকটা কথা শেষ না করে হাসলো। কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার আবার হিস্ট্রী আছে। ধৈর্য ধরুন, আমি সব খুলে বলছি।'

শমসের শিকদার বললো, 'হ্যাঁ, সব কথা তো বলতেই হবে। হিস্ট্রী বলার আগে আপনার নামটা বলুন।'

'আমার নাম বদরুদ্দিন হোসেন, মেজর বদরুদ্দিন হোসেন। ইণ্ডিয়ান আর্মির 'বি' কোম্পানির মেজর ছিলাম আমি। বছর পাঁচ–ছয় হলো রিটায়ার করেছি। তৈমুর মীর্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় লাহোরে…'

নাম শুনে কামাল বিস্মিত হলো। শহীদের কাছে নামটা ইতিপূর্বে সে শুনেছে। শহীদের বর্ণনা সত্যি হলে মেজর বদরুদ্দিন একজন ছা'পোষা নিরীহ ভদ্রলোক। তার পেনসনের টাকা জুয়াচুরি করে মেরে দিয়েছিল পুরানো দোস্ত লেঃ কর্নেল আনসারী। এই নিয়ে মেজরের দুঃখ আর ক্ষোভের অন্ত নেই। প্রায়ই আনসারীকে মারধোর করার প্ল্যান আঁটে মেজর এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মাপ করে দিয়ে ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরে। এহেন মেজর বদরুদ্দিন হঠাৎ মানিকপুরে কেন?

শমসের শিকদার মেজর বদরুদ্দিনের জবানবন্দী নোট করে নিতে লাগলো আর কামাল ভাবতে লাগলো শহীদের কথা। হাসান মওলার মৃতদেহের কাছে মেজর বদরুদ্দিনের রহস্যময় উপস্থিতির কথা শহীদের জানা দরকার।

কিন্তু এই রাতে বুরুজ মিঞাকে কি খোঁজ করে পাওয়া যাবে? কামাল ঘড়ির দিকে তাকায়। তখন রাত আটটা। ঘরের মেঝেয় রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে হাসান মওলা। মাহমুদকে ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করতে মানিকপুর এসেছিল হাসান মওলা। তার এই পরিণতি হবে কে জানতো? হাসান মওলাকে কে খুন করতে পারে? মাহমুদ? তাহলে কি আগন্তুক বৃদ্ধের কথাই সত্যি? হাসান মওলা তাহলে তৈমুর মীর্ধা? না, সবটা ব্যাপার গুলিয়ে যাচ্ছে। শহীদকে সব কথা বলা দরকার।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দুই

ঘন্টা দুয়েক পরে হোটেল থেকে বেরোতে পারলো কামাল। শমসের শিকদার সকলের জবানবন্দী নিয়ে লাশসহ থানায় চলে গেছে। মেজর বদরুদ্দিনকে নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত হোটেল তাজে অবস্থান করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মেজর বদরুদ্দিন সানন্দে রাজি হয়েছেন। কামালের ঘরের দক্ষিণহাতি বারান্দা পার হলেই মেজর বদরুদ্দিনের ঘর। জবানবন্দী নেয়ার ঝামেলা চুকে যাবার পর কামাল রাতের খাবার খেয়ে নিলো। ম্যানেজার আইনুল হককে 'ঘুম আসছে না···একটু পায়চারি করে আসি', বলে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। বুরুজ আলী ঠিক কোথায় থাকে তা সে জানে না। তবে শহীদ যা বর্ণনা দিয়েছিল তাতে জায়গাটা চিনতে হয়তো অসুবিধা হবে না। দেখা যাক।

কামাল রাস্তায় নেমে হাসপাতালের দিকে হাঁটতে লাগলো।

রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। সন্ধ্যার দিকে বাতাস ছিলো মিষ্টি আর উষ্ণ। যতো রাত বাড়ছে ততো শীত নামছে বাতাসে। চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ী মাটির গন্ধ পেলো কামাল। জঙ্গলের ভিতর একটা তক্ষক সাপের ডাক শোনা গেল।

রাস্তায় লোকজন নেই। দু'পাশে নিঝঝুম বাড়িঘর। মাথার ওপর আকাশ। তারা মিট মিট করছে। বহুদূরে একটা আগুনের শিখা জ্বলছে লকলকে জিহ্বার মতো। কামাল বুঝলো বুনো পাহাড়ী লোকেরা আগুন দিয়ে জঙ্গল সাফ করছে।

কামাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখলো একটা জটাধারী প্রকাণ্ড লোক দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। কামালের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

রিভলভারটা ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করে আনতে এক মুহূর্ত লাগলো কামালের। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো উত্তেজনায়, 'কে ওখানে?'

লোকটা হঠাৎ ঘুরেই দৌড় দিলো জঙ্গলের ভিতর। হতবাক কামাল না পারলো গুলি চালাতে, না পারলো লোকটার পিছু নিতে। সে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তক্ষক সাপটা আবার ডেকে উঠলো কাছেই কোনো গাছের গুঁড়ি থেকে।

মানিকপুরের রহস্যময় নাটকের নতুন অধ্যায় তাহলে শুরু হয়ে গেছে? কামাল সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো, 'প্রথমে হল-ভর্তি অভ্যর্থনা সভায় অদ্ভুত ভাবে খুন করা হলো চৌধুরী আলী নকীবকে। এর কিছুদিন পর সুলতানা পারভিনের প্রথম স্বামী তৈমুর মীর্ধাকে খুঁজে দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়ে শহীদের কাছে গেলেন

বেগম রশিদ। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রহস্যজনক ভাবে মানিকপুরে আবির্ভাব ঘটলো হাসান মওলার। তাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করলো কে বা কারা, আর এই খুনের বিস্ময় কাটতে না কাটতে মঞ্চে উপস্থিত হলেন মেজর বদরুদ্দিন। তিনি জানালেন হাসান মওলা আর কেউ নয় স্বয়ং তৈমুর মীর্ধা। মানিকপুর হত্যারহস্যের নাটক এখন নতুন অঙ্কে প্রবেশ করেছে। এখন পদে পদে আততায়ীর ভয়। হত্যার আশঙ্কা। হুমকি।

কামাল রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালো। বড় রাস্তা থেকে একটা ছোটো পথ ধরে কিছুদূর এগোলেই হাসপাতাল। বুরুজ মিঞা এখানেই কিছুক্ষণ আগে নেমে গিয়েছিল। সে সরু পথটা ধরে এগোলো। এদিকে বাড়িঘর প্রায় নেই। চারদিকে শিশু, মহুয়া আর গজারী গাছ। হাওয়া ঢেউয়ের মতো কল কল করছে। চারপাশে ফিসফিস শব্দ। একটা কালো পেঁচা পাখা ঝাপ্টে হঠাৎ উড়ে গেল এক গাছ থেকে অন্য গাছে। জঙ্গলের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়ে বহুদূরের একটা আলো দেখা গেল।

কামাল বুঝলো ওটাই হাসপাতাল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সে সামনে এগোতে লাগলো। জটাধারী লোকটা কে হতে পারে? সে ভাবলো। পাগল, না মানিকপুর রহস্যের কোনো একটা নতুন গুটি?

আলো লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো কামাল। কিছুদূর যাবার পর কোথাও আর আলোটা দেখা গেল না। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কামাল বুঝলো সামনের সারি সারি একতলা বাড়িগুলি হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টার। পার হলে একটা খেলার মাঠ আছে। সেই মাঠের অপর পারে হাসপাতাল। বুরুজ মিঞা স্টাফ কোয়ার্টারের কেরানী জহিরউদ্দিনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। দিনের বেলায় মানিকপুর বাজারে তারের বেহালা বিক্রি করে। রাতেরবেলা জহিরউদ্দিনের বাড়িতে এসে ঘুমায়। জহিরউদ্দিনের বাসা কোনটা এখন জানা দরকার।

কামাল অন্ধকার শাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছিল, এই সময় গাছের উপর কি একটা শব্দ হলো। কামাল বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। গাছের উপর থেকে গম্ভীর গলায় শহীদ বললো, 'গুলি করিস না কামাল। মহুয়া বিধবা হয়ে যাবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কামাল। পরিহাসের গলায় বলে, 'গাছের উপর কি করছিস শহীদ?'

'তারের বেহালা বিক্রি করছি। কেমন হলো?' শহীদ নেমে আসে গাছের উপর থেকে। বলে, 'তোকে প্রথমটা চিনতে কষ্ট হচ্ছিলো! ঠ্যাং কাঁপছে দেখে বুঝলাম লোকটা তুই।'

'বাজে বকবি না বলে রাখলাম। ঠ্যাং কাঁপছে তুই অন্ধকারে বুঝলি কি করে?'

কামাল রাগ দেখায়। শহীদ হেসে বলে, 'কপাল জোরে বেঁচে গেছিস। আমার হাতেও পিস্তল ছিলো। চিনতে ভুল করলেই হয়েছিল আর কি! যাক গে···আসল কথা

বল্। রাতেরবেলা হোটেল ছেড়ে এসেছিস কেন?'

কামাল হাসান মণ্ডলার খুন এবং মেজর বদরুদ্দিনের আবির্ভাবের কথা খুলে বললো। শুনে গম্ভীর হয়ে গেল শহীদ। বললো, 'হু…।'

কামাল বলে, 'আমার মনে হয় মেজর বদরুদ্দিনের কথাই ঠিক। লোকটা হাসান মণ্ডলা নয়, তৈমুর মীর্ধা।'

শহীদ বলে, 'কিন্তু তুই যে বলছিলি তৈমুর মীর্ধা মৃত?'

কামাল বলে, 'পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তৈমুর মীর্ধার সম্পর্কে যে তদন্ত চালিয়েছিলাম তাতে তৈমুর মীর্ধাকে মৃত না বলে উপায় নেই। 'ডেথ রেজিস্টারে' তৈমুর মীর্ধার মৃত্যুর কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে।'

'তাহলে?'

'আমার মনে হয় তৈমুর মীর্ধা নিজেকে মৃত বলে প্রমাণ করেছিল। নিজেকে মৃত বলে প্রমাণ করতে যাওয়ার পিছনে একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং সেটাই আমাদের বের করতে হবে।'

শহীদ কিছু বললো না। কয়েক মুহূর্ত শুধু নিশ্চুপ হয়ে রইলো। কামাল বললো, 'ব্যাপারটা তোকে জানাবার জরুরী প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছি তোর খোঁজে। তুই গাছের উপর উঠে কি করছিলি?'

শহীদ বললো, 'কুয়াশা।'

'কুয়াশা? কোথায়?'

শহীদ হাসলো। বললো, 'আয় আমার সঙ্গে। কুয়াশা ঠিক কোথায় বাস করে তার হদিস আমি এখনো জানি না। শিগগিরই জানতে পারবো।'

দুই বন্ধু নিঃশব্দে এগোতে লাগলো। শাল আর মহুয়ার স্বল্প পরিসর জঙ্গল পার হয়ে পড়লো রাস্তা। ঝোপের ভিতর থেকে শহীদ টেনে বের করলো একটা বাইসাইকেল।…

কামালকে বললো, 'তুই পেছনে উঠ্।'

পাতাবাহার রোড ধরে নির্জন রাস্তায় বাইকটা এগিয়ে চললো। সামনেই হোটেল তাজ। ওরা রাজা সাহেবের মাঠের দিকে একটা ছোটো পথ ধরলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই খোয়া ওঠা ইঁটের পথ ছেড়ে তারা পড়লো ঘাসে ছাওয়া বন্ধুর মাঠে। যতদূর চোখ যায় আবছা অন্ধকার। মাঠের দিগন্তে নেমে এসেছে তারা জ্বলা আকাশ। বিরাট মাঠের বুকে থম থম করছে হাজার হাজার বছরের নির্জনতা। যতদূর চোখ যায় আবছা অন্ধকার। খোলা হাওয়া বইছে।

কামাল বললো, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

শহীদ হাসলো শুধু। জবাব দিলো না।

অনেকদূর যাওয়ার পর দেখা গেল একটা বুক সমান উঁচু মাটির টিলা। আশেপাশে

হোগ্‌লা আর কাঁটামেদির জঙ্গল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে। কোথাও জল পড়ার শব্দ শোনা গেল।

টিলার কাছে থামলো শহীদ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বেশ খানিকটা দূরে ভোজবাজির মতো জ্বলে উঠলো একটা আলো। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো একটা কালোছায়া। আলোর মশাল হাতে নিয়ে কালোছায়াটা এক পা দু'পা করে এগোতে লাগলো পীরগঞ্জের দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল কামালের। সে বিস্ফারিত চোখে অন্ধকারে ঢাকা কুয়াশার মূর্তিটা দেখতে লাগলো। তার চোখ সন্দেহে ভরে উঠলো। ফিসফিস করে বললো, 'শহীদ, এ কিছুতেই কুয়াশা হতে পারে না।'

'কেন?'

'কুয়াশার পা তো খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। আর এজন্যে আমরাই দায়ী। এই লোকটা দিব্যি সটান পায়ে হাঁটছে, এ কিছুতেই কুয়াশা হতে পারে না।'

শহীদ বললো, 'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। আমার ভুল ভেঙে গেছে। সামনের ঐ মশালধারী মূর্তিটা যে কুয়াশা তা একটু পরে তুই–ও বুঝতে পারবি।'

শহীদের ইঙ্গিত কিছুই বুঝলো না কামাল। সে বললো, 'আলো হাতে করে লোকটা কোথায় যায়?'

'জানি না।'

'রোজ রাতে এরকম হয়?'

'প্রায়ই হয়। আমি হাসপাতালের কাছে কড়ুই গাছটার মগ্‌ডালে এজন্যেই উঠেছিলাম কামাল। গাছের উপর থেকে ছায়ামূর্তিটা দেখা যায় না। আলোটা স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায় রোজ রাতেই দেখি আলোটা সামনের ঐ ঢিবি থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়…কিছুদূর পীরগঞ্জের টিলার দিকে এগোয়। কিছুদূর যাবার পর নিভে যায়। এ এক দারুণ রহস্য। হয়তো এই রহস্য উদ্ধার করতে পারলেই মানিকপুর হত্যারহস্য ভেদ করা যাবে।'

'কিন্তু লোকটা যে কুয়াশা তা কি করে জান্‌লি? এমনও তো হতে পারে…'

কামালের কথা মাঝ পথে থাক্‌তেই বাতিটা হঠাৎ নিভে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাতের নির্জনতা ভেদ করে বাতাসে বেজে উঠলো সরোদের গম্ভীর সুর।

কামাল অস্ফুট গলায় বললো, 'কুয়াশা।'

শহীদ হাসলো শুধু। বললো, 'কুয়াশাই মানিকপুরে আমাকে টেনে এনেছে কামাল। কুয়াশার আইন–বিরোধী জীবন আমি খতম করতে চাই। কুয়াশাকে আমি ভালবাসি। শ্রদ্ধা করি। একটা প্রতিভা এইভাবে নষ্ট হচ্ছে দেখে দুঃখ পাই। কিন্তু কামাল, কর্তব্যবোধ এই ভালবাসা আর শ্রদ্ধার অনেক উর্ধ্বে। কুয়াশাকে আমি ছাড়বো না।'

কামালের হাত চলে গিয়েছিল পকেটে লুকানো রিভলভারটার দিকে। শহীদ বললো, 'কুয়াশাকে এভাবে ধরার চেষ্টা নিরেট বোকামী হবে কামাল। চল্ এবার ফিরি...'

কামাল বললো, 'কিন্তু...'

শহীদ হাসলো। বললো, 'কাছে পেয়েও কুয়াশাকে ছেড়ে দিলাম কেন?' এ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রথম রাতে আমিও কুয়াশার পিছনে ধাওয়া করেছিলাম। পিস্তল ছুঁড়েছিলাম। কুয়াশাকে ধরতে পারিনি। কুয়াশা ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছিল। সে ঘটনার কথা ভাবলে এখনো লজ্জা পাই।'

সাইকেলটা রাজা সাহেবের মাঠ ধরে এগোতে লাগলো হোটেল তাজের দিকে। হোটেল তাজের কাছে এসে কামাল চলে গেল হোটেলের দিকে আর শহীদ এগিয়ে চললো সামনে।

তখন রাত দুটো।

তিন

পরদিন সকাল দশটায় হোটেলে বুরুজ মিঞার আবির্ভাব ঘটলো। হোটেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা পুরানো হিন্দী গানের গৎ বাজাচ্ছিল। এই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো মতিন। বললো, 'বুরুজ মিঞা, আমাকে বাজনা শিখিয়ে দিতে পারবে?'

'আহা ঢং দেখে আর বাঁচি না...' ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় মুন্সিজী। সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মতিনের উদ্দেশ্যে সে বলে, 'পেটে ভাত জোটে না শালা পিয়ন কাঁহেকা, তিনি বাজনা শিখবেন!'

'শিখবো।'

মতিন গম্ভীর চালে বলে, 'আমার সখ হয়েছে আমি শিখবো। তোমার তাতে কি হে বাপু?'

'আমি ম্যানেজার সাহেবকে বলে দেবো।'

'ম্যানেজার সাহেবকে আমি নিজেই বলবো।'

'বটে?'

দ্বিতীয় কিস্তি দাঁত খিঁচুনী লাগায় মুন্সি। চারদিক একবার ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'বলি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হচ্ছে? জানিস আমি তোর বস'।

'কচু।'

মতিন মাটিতে থুথু ফেলে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এই শালা মুন্সি, তুই আমার কচু।'

মুন্সি বুঝলো তার চালে একটু ভুল হয়ে গেছে। বস কথাটা বলা ঠিক হয়নি। নিজের পজিশন রাখার জন্যে সে ভারিক্কিরকমের একটা গলাকাশি দিলো। বললো, 'তুই আমার কাছে মাপ চা কইলাম মতিন!'

মতিন বেশ খেপে গেছে। সে বললো, 'তোমার পাছায় গুণে গুণে তিনটা লাথি লাগাবো শালা বেঈমান…'

'কি হচ্ছে শুনি?'

বলতে বলতে আইনুল হক ও কামাল সেখানে উপস্থিত হয়। কথাটা আইনুল হকের। তাকে দেখে এবং তার কথা শুনে মতিন, মুন্সিজী দু'জনেই পানি হয়ে যায়। মুন্সিজী বলে, 'ইয়ে স্যার, বুরুজ মিঞা…'

আইনুল হক এদের ঝগড়া শুনেছিল। ধমক দিয়ে বললো, 'কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।'

মতিন, মুন্সিজী দু'জনেই মাথা নিচু করে চলে যায়।

আইনুল হক বুরুজ মিঞার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি কি চাও?'

'বেহালা বেচতে এসেছিলাম স্যার। আপনাদের বেয়ারা মতিন মিঞা বলছিল সে বেহালা কিনবে। তা মতিন মিঞা যখন কিনলো না তখন আমি চলি স্যার। আদাব স্যার…'

'দাঁড়াও হে,' কামাল কৌতূহলী ভাব দেখিয়ে বললো, 'আমি একটা বেহালা কিনবো। কতো দাম একটা বেহালার।'

'দাম তো স্যার লাখ টাকা। এক লক্ষ এক টাকা মাত্র।…'

বুরুজ মিঞা দাঁত বের করে হাসলো। বরুজ মিঞার কাছ থেকে নিলে দাম একটু কম পড়বে। আট আনা পিস।

'তুমি দেখছি বেশ রসিক লোক।'

কামাল হাসলো। বললো, 'ভালো দেখে একটা বেহালা দাও। এই যে পয়সা।'

পয়সা ট্যাকে গুঁজে রেখে একটা বেহালা বের করে কামালের হাতে দিলো বুরুজ মিঞা। বললো, 'খুব ভালো দেখেই দিলাম স্যার। মাথার দিকটা ঘুরালেই যন্ত্রটা টান হবে। আচ্ছা, আদাব স্যার, চলি।'

বুরুজ মিঞা চলে গেল। বেহালা হাতে আইনুল হকের সাথে হোটেলের চারদিক ঘুরে বেড়ালো কামাল। ঘুরে ঘুরে কামালকে সব দেখালো আইনুল হক। বকবক করার দোষ তার আছে। কথা একবার শুরু করলে শেষ করার নাম নেই। অতি কষ্টে তার হাত

থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঘরে এলো কামাল। দরজা বন্ধ করে বেহালার মাথাটা খুললো। বেরিয়ে এলো দু'টুকরো কাগজ। একটা কাগজে লেখাঃ শাহের বানু, মাতৃসদন, ঢাকা।

আর একটা কাগজের টুকরোয় শহীদ লিখেছে, 'আমি আজ রাতে ঢাকা ফিরে যাচ্ছি। বুরুজ মিঞার কাজ শেষ। এইবার শহীদ খানের প্রবেশ লাভ ঘটবে মঞ্চে। চৌধুরী আলী নকিবের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার যে ভুল ধারণা হয়েছিল তা এখন আর নেই। মানিকপুরে এসে সব রহস্যই অবগত হয়েছি। শুধু কুয়াশা আর শাহের বানুর রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। শাহের বানুর ঠিকানা লেখা এই কাগজটা আমি পেয়েছি চৌধুরী আলী নকিবের বাড়িতে, মাহমুদের দেরাজে। হ্যাঁ, রাতে চুরি করে মাহমুদের ঘরে ঢুকেছিলাম। যাহোক, আজ রাতে আমি চলে যাচ্ছি। কখন আবার মানিকপুরে ফিরছি তা যথাসময় জানতে পারবি। তুই মেজর বদরুদ্দিন আর মাহমুদের উপর লক্ষ্য রাখিস। এক কাজ করতে পারিস। বেগম রশিদকে দিয়ে একটা পার্টির ব্যবস্থা কর তাঁর বাড়িতে। মেজর বদরুদ্দিন আর মাহমুদকে দাওয়াত দে। সামনাসামনি এরা একে অন্যের উপর কি ভাব পোষণ করে তা লক্ষ্য কর।

কামাল, কুয়াশা এখনো রহস্যময় হয়ে রইলো। কিন্তু শহীদ খান পরাজয় স্বীকার করেনি আজ পর্যন্ত। ওকে আমি ধরবই। তুই সাবধান থাকিস। শেষ বারের মতো বলছি। মেজর বদরুদ্দিনের উপর কড়া নজর দিস। মেজর বদরুদ্দিন এখন মানিকপুর হত্যা রহস্যের সবচে বড় গুটি।

ইতি—
শহীদ,

চার

বেগম রশিদের চিঠি পড়া মাত্র শেষ করছে কামাল, নাটকীয় ভাবে ঘরে ঢুকলো মেজর বদরুদ্দিন।

'ডিসটার্ব করলাম বোধহয়।'

মেজর বদরুদ্দিন বিনীতভাবে বলে, 'নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছেন এখন।'

'না, না…এমন…কিছু ব্যস্ত নয়। একটা চিঠি পড়ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা রশিদ সাহেবের বাড়িতে চা পানের দাওয়াত।'

'আরে আমারও তো সেই ব্যাপার। একটু আগে লোক মারফত দাওয়াতের চিঠি পেয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই ভদ্রলোককে চেনেন?'

'জ্বি হ্যাঁ।'

'আমি চিনি না।'

হাঃ হাঃ করে হাসে মেজর বদরুদ্দিন, 'দাওয়াত পেয়ে আমি তো দারুণ অবাক হয়ে গেছি সায়েব। চিনি না, জানি না, দাওয়াত···একি কাণ্ড। তা আপনি কখন যাচ্ছেন?'

'পাঁচটার দিকে।'

'আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে যাবো। অবশ্য আপনার যদি অসুবিধে না হয়···'

'কিছুমাত্র অসুবিধে নেই। চলুন, তাহলে একই সঙ্গে যাওয়া যাবে।'

বিকেল পাঁচটায় হোটেল থেকে এক সঙ্গে বেরোলো কামাল আর মেজর বদরুদ্দিন। মেজর বদরুদ্দিনকে কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগছে। পরনে সার্জের স্যুট। মাথায় জিন্নাহ টুপি।

পথে নেমে মেজর বদরুদ্দিন কি একটা প্রসঙ্গ ধরে ক্যাম্প জীবনের গল্প বলতে শুরু করেছে। কথায় কথায় উঠলো তৈমুর মীর্ধার কথা। মেজর বদরুদ্দিন বলে, 'তৈমুরের মতো এমন দিল দরিয়া মানুষ আমি খুব কম দেখেছি কামাল সাহেব। দোষের মধ্যে একটু খেয়ালী ছিলো এই যা। ভালো কথা, তৈমুর মীর্ধার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কি পাওয়া গেছে?'

'দু' একদিনে মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

'আরো দু' একদিন? বলেন কি?'

মেজর বদরুদ্দিন ক্ষোভ প্রকাশ করে। আপন মনে বলে, 'আরো দু' একদিন। তাহলে মানিকপুর থাকতে হচ্ছে আমাকে। হুঁ!'

কামাল বলে, 'মানিকপুর বুঝি এই প্রথম এলেন আপনি?'

'এবং এই শেষ। এখন এই সান্দাদের বেহেশ্‌ত থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।'

মেজর বদরুদ্দিন আপন মনে বিড়বিড় করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় কামাল। মানিকপুরের নাটকীয় ঘটনায় মেজর বদরুদ্দিন অন্যতম রহস্যময় চরিত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাসান মণ্ডলার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আজ নিয়ে চারদিন আগে। এ ক'দিন বুড়ো মেজর বদরুদ্দিন মানিকপুরে আছে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে হাসান মণ্ডলা নামে কথিত তৈমুর মীর্ধার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বুড়ো মানিকপুরেই থাকবে। উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে এবং সেটা কি ধরনের তা বুড়োর ভাবগতিক বা চলাফেরা থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। সারাদিন হোটেল থেকে এক পা বেরোবে না বুড়ো। হয় নিজের ঘরে না হয় রিসেপশনে বসে থাকবে। শুধু বসে থাকলে কথা ছিলো। বুড়ো সর্বক্ষণ বকর বকর করে চলেছে। সারাদিনের মধ্যে হোটেলের বাসিন্দারা বুড়োর কাছ থেকে রেহাই পায় বিকেল পাঁচটার দিকে। বুড়ো তখন তালি

দেয়া সার্জের স্যুট পরে মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ চড়িয়ে হাতে ছড়ি নিয়ে কড়া সিগারেট ফুঁক্তে ফুঁক্তে বেড়াতে বেরোয়। রাজা সাহেবের মাঠে অথবা শাল বনে বেড়াতে যায়। একদিন গিয়েছিল কাপড়ের কল দেখতে। বেড়িয়ে বুড়ো ফেরে রাত আটটার দিকে। আবার শুরু হয় বুড়োর বকবকানি। হোটেলের লোকেরা এরই মধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছে বুড়োর উপরে।

শহীদের চিঠির কথা মনে পড়লো কামালের। মেজর বদরুদ্দিনের উপর নজর রাখতে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছে শহীদ। কামাল অবশ্য গোড়া থেকেই মেজর বদরুদ্দিনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। গতকাল বিকাল পাঁচটায় বেরিয়ে মেজর বদরুদ্দিন যে রাত এগারোটায় লুকিয়ে হোটেলে ফিরেছে সে খবরও সে জানে। মেজর বদরুদ্দিন মানিকপুর হত্যা রহস্যের অন্যতম গুটি, এতে সন্দেহ নেই। তার ভূমিকা কি সেটাই এখন জানা দরকার।

রশিদ সাহেবের বাড়িটা পাতাবাহার রোডের ডান ধারে। ছোটো একতলা বাড়ি। চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন। লনে চেয়ার পেতে বসার জায়গা করা হয়েছে। কামাল যথারীতি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো মেজর বদরুদ্দিনের।

রশিদ সাহেব বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মেজর সাহেব। আপনার বন্ধু তৈমুর মীর্ধার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছেন?'

'আঘাত পেয়েছি বৈকি। পুরোনো বন্ধুর মৃত্যুতে আঘাত পাওয়ার কথা কি আর বলতে হয়?' কিন্তু হত্যাকারী যদি সমুচিত শাস্তি পায় তাহলে আঘাতের বেদনা কতকটা ভুলতে পারবো।

মেজর বদরুদ্দিন ও রশিদ সাহেব আলাপে আলাপে রীতিমত জমে গেলেন। কামাল সরে গেল বাঁ পাশে। লম্বা একটা টেবিলের এককোণে বসেছে রাবেয়া সৈয়দ, ডাঃ চৌধুরী আর ওদের একটু দূরে শাহেলি।

ডাঃ চৌধুরী কামালকে দেখে শুষ্ক হাসি হাসলেন। বললেন, 'এই যে আসুন।'

বেগম রশিদ কোথেকে উদিত হলো এই সময়। পিছনে রবিউল্লাহ। প্রথাগত ভাবে সকলের সঙ্গে পরিচিতির পালা চুকিয়ে নিয়ে বললো, 'সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি মাত্র। এখুনি চা দেয়ার কথা বলতাম। কিন্তু কেউ কেউ আবার বড় বাড়ির মাহমুদ সাহেব আর সুলতানা পারভিনের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা এলেই…

রাবেয়া সৈয়দ মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওদের বুঝি বলা হয়েছে?'

'আপনার যেমন কথা.'

বেগম রশিদ হাসে, 'সবাইকে ডেকেছি আর বড় বাড়ির গিন্নিকে ডাকবো না তা কি হয়? চা খাওয়া এমন আর কি, আসল কথা তো সকলের সঙ্গে…'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাসতে থাকে বেগম রশিদ। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো রবিউল্লাহ। সে এইসব কথাবার্তা শুনছিল কিনা বলা মুস্কিল। সে তাকিয়েছিল শাহেলির দিকে। শাহেলিও সেটা বুঝতে পেরেছিল। সে একবার রবিউল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হয়ে উঠলো।

রবিউল্লাহ শাহেলির পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলো। শাহেলি মৃদু কণ্ঠে বললো, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

'না, এমন কিছু না। আমি ভাবছিলাম টাকা দিইনি বলে তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করেছো?'

শাহেলি একটু হাসলো। বললো, 'আমি রাগ করেছি তোমাকে কে বললো?'

'তা ধরোগে তোমার কে বলবে? আমি নিজেই অনুমান করছি।'

'তুমি একটা বুদ্ধু!'

'কি বললে?'

রবিউল্লাহ্ প্রথমটা ধরতে না পেরে হকচকিয়ে গেল। শাহেলি লাল হয়ে উঠে বললো, 'কিছু বলিনি বাপু। সবাই চোরা চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার লজ্জা লাগছে, তুমি এখান থেকে যাও…'

রবিউল্লাহ্ বললো, 'তোমার কাছ থেকে সরে যেতে ধরোগে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু তুমি বলছো যখন অগত্যা যাই।'

রবিউল্লাহ্ একটু হাসলো। উঠে কামালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কামাল লক্ষ্য না করে পারলো না যে রাবেয়া সৈয়দের তীব্র ভ্রূকুটি হঠাৎ গিয়ে বিঁধলো রবিউল্লাহ্‌র উপর, আর সেই সঙ্গে কেমন যেন থমকে গেল রবিউল্লাহ।

'হা, হা।'

অদূরে গোল হয়ে বসা লোকগুলির ভিতর বসে প্রাণ খুলে হাসছিল মেজর বদরুদ্দিন, 'আমি কি বিশ্বেস করি জানেন? বললে তো ফাঁকা গালগল্প মনে করবেন। ভাববেন চান্স পেয়েছি আর অমনি বাণী ছাড়ছি। কিন্তু For God's sake, বিশ্বেস করুন গালগল্প ছাড়ছি না। মিলিটারীতে ঢুকেছিলাম আর্লি টুয়েন্টিতে, রিটায়ার করেছি সেই কবে, এখন বয়স হতে চললো ষাটের উপর। এখনো আমার সেই এক কথা সায়েব। খান, দান, ফুর্তি করেন। আমার কাছে life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. কি বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি? তাহলে শুনন লেঃ কর্নেল আনসারীর কথা। শালা ছিলো আমার দোস্ত মানুষ।'

অম্লান বদনে বলে চলে মেজর বদরুদ্দিন, 'রিটায়ার করেছিলাম প্রায় একই সময়। এক টেবিলের ইয়ার তো, একদিন মওকা বুঝে বেসামাল অবস্থায় একটা দস্তখতের জোরে আমার পেনশানের বেবাক টাকা মেরে দিলো। তাকে খুন করা উচিত ছিলো আমার, কি বলেন? কিন্তু দোস্ত বহুত চালাক মানুষ, করেছে কি আমার মতো আরো কয়েকজনের টাকা মেরে দিয়ে একদম বার্মা মুল্লুকে ভাগোলবা। প্ল্যান প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা ছিল বোধহয়।

'আমি এদিকে আঙুল চুষি, বার্মা মুল্লুকে আমার দোস্ত লেঃ কর্নেল আনসারী enjoy করছে life. Drinking life to the lees. হা হা, কি মজা, তাই না...'

প্রচণ্ড হয়ে ফেটে পড়ে মেজর বদরুদ্দিনের হাসি। হাসির ভিতর গেট দিয়ে লনের দিকে এগিয়ে আসে মাহমুদ। কিন্তু মেজর বদরুদ্দিন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। বলে, 'আমি কিন্তু টাকা হারিয়ে ভেঙে পড়িনি। সামান্য ক'টি টাকার জন্যে বুঝি হা-পিত্যেস করে মরে যাবো। ছোঃ, মেজর বদরুদ্দিন সে ধাতের লোকই না। Chances are frequent, হাল ছেড়ে দেয় যে সে বোকা। আমি আর যা হই বোকা নই। Foolishness I hate most.'

মাহমুদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো মেজর বদরুদ্দিনের দিকে। এই কথায় কেন যেন মুচকে হাসলো সে।

'মেজর সাহেব,'

রশিদ সাহেব মাহমুদকে দেখিয়ে বলেন, 'ইনি হলেন মিসেস চৌধুরী অর্থাৎ মিসেস সুলতানা পারভিনের বড় ভাই মি. মাহমুদ। আর মাহমুদ সাহেব, ইনি মেজর বদরুদ্দিন, আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়ান আর্মির রিটায়ার্ড মেজর।'

দুজনেই দুজনকে আদাব দেয়। গৎ বাঁধা বুলি দিয়ে কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কামালের মনে হলো মেজর বদরুদ্দিনের প্রসন্ন চোখ দুটি হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেছে আর মাহমুদের ঠোঁটে ও চোখে অতি সূক্ষ্ম একটা ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মেজর বদরুদ্দিন বলে, 'আমি আপনাকে দু'দিন রাজা সাহেবের মাঠে গাড়ি করে বেড়াতে দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি আপনাকে। আপনি বোধহয় হাসান মণ্ডলা যেদিন মারা গেল সেদিনই মানিকপুরে এসেছিলেন?'

'জ্বি হাঁ। আপনারা যাকে হাসান মওলা বলছেন তিনি আসলে স্কোয়াড্রন লীডার মি. তৈমুর মীর্ধা। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন। কিন্তু বয়সের অমিল সত্ত্বেও আমরা ছিলাম যাকে বলে অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'মেজর সাহেব, আপনার বক্তব্যে কিছু ত্রুটি আছে। হয় আপনার মাথায় ছিট আছে, না হয় আপনি…'

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো মাহমুদ। তারপর আগের চেয়েও তীব্র স্বরে বললো, 'মিথ্যে কথা বলছেন।'

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন মেজর, 'Shut up. ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে শিখুন মাহমুদ সাহেব, হ্যাঁ…ভালো হবে না বলে দিচ্ছি…'

মাহমুদ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'Be ready for tye consequence Major. প্রতিফলের জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

পার্টির উপস্থিত সকলে এই নাটকীয় ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়ে। সবাই হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। রশিদ সাহেব বলেন, 'আহ্…দয়া করে উত্তেজিত হবেন না মাহমুদ সাহেব…'

সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বেগম রশিদ। অপ্রীতিকর ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে যেন অনুযোগের কণ্ঠে মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কই সুলতানাকে নিয়ে এলে না যে?'

'সুলতানা অসুস্থ।'

'অসুস্থ, বলো কি?'

বেগম রশিদ খবরটাকে বেশি রকম মর্যাদা দিতে চেষ্টা করে। অদূরে মাথা নিচু করে বসেছিলেন ডা. চৌধুরী। তিনি মাথা তুলে বলেন, 'It was just a headache. আমি কালই ওষুধ দিয়ে এসেছিলাম। সুলতানা কি সেরে ওঠেনি?'

মাহমুদ স্থির গলায় বলে, '…আপনারা যা ভাবছেন তা না। সুলতানার সামান্য একটু মাথা ধরেছে, ইচ্ছে করলেই সে আসতে পারতো। তা মাথা ধরাটা যদি বেড়ে যায়, এই ভয়ে সে আসেনি…'

'ওঃ, তাই বলো, আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' বেগম রশিদ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এতক্ষণে ভালো করে তাকায় সকলের দিকে। কামালকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কতকটা আনুষ্ঠানিক ভাবে বলে, 'আপনারা আমাদের এই সম্মানিত মেহমানকে আশা করি সবাই চেনেন। ইনি কামাল আহমেদ, বিখ্যাত গোয়েন্দা শহীদ খানের বন্ধু। এঁরই সম্মানে আজ এই সামান্য চায়ের আয়োজন করেছি।'

ইতিমধ্যে টেবিলে নাস্তা দেয়া শুরু হয়েছে। রাবেয়া সৈয়দ গিয়ে বসেছেন বড় টেবিলটায় যেখানে মেজর বদরুদ্দিন ও রশিদ সাহেব বসেছেন। এপাশে আর একটা টেবিলে শাহেলির পাশে জায়গা করে নিয়েছে মাহমুদ, মাহমুদের পাশে বসেছেন গম্ভীর

মুখ ডা. চৌধুরী। বেচারা রবিউল্লাহ্ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো মাহমুদ ও শাহেলির দিকে, তারপর কি ভেবে কিছুদূরে আলাদা একটা টেবিলে মুখ গোমরা করে গিয়ে বসলো।

'রবিউল্লাহ্,' বেগম রশিদ হাঁক দেয়, 'তুমি বাবা এদিকটায় (শাহেলির বাম পার্শ্ব দেখিয়ে) এসে বসলেই পারো।'

'তা ধরুন গে আপনার, দরকার কি?'

বিরক্তি চাপতে পারে না রবিউল্লাহ্, বলে, 'দিব্যি আছি। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

'আপনার কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?' মাহমুদ কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করে শাহেলিকে।

'হাঁ হচ্ছে,' স্পষ্ট গলায় একটুও দ্বিধা না করে জবাব দেয় শাহেলি। বলে; 'কিন্তু বলে লাভ কি? অসুবিধে হচ্ছে বললেই কি আপনি অন্যত্র সরে বসবেন?'

'তা বসবো না। আসলে ইচ্ছে করেই আপনার কাছে এসে বসেছি। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি।'

শাহেলি হতবাক হয়ে তাকায়। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি শক্তিশালী। নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগলো শাহেলির। একবার সে উঠে গিয়ে ডা. চৌধুরীর পাশে বসবে ভাবলো। কিন্তু তার হাত-পা অসাড় হয়ে রইলো। উঠতে পারলো না।

চায়ে চুমুক দেয় মাহমুদ। আস্তে আস্তে বলে, 'আপনি আমাকে ঘৃণা করেন তাই না?'

শাহেলি এই কথার জবাব দিলো না।

'ভেবেছেন আমি একটা কপালগুণে বড়লোক মহিলার বর্বর বড় ভাই, তাই না?'

মাহমুদ হাসে। বলে, 'আপনি ঠিকই ভেবেছেন। আমি করিনি এমন অন্যায় নেই, কিন্তু মজা কি জানেন? আমার অন্যায় ধরার মতো একটি লোকও আজ পর্যন্ত পাইনি। চিরকালই আমি বিজয়ী। বিশ্বেস হয় না বুঝি?'

শাহেলি বললো, 'আমাকে এগুলো বলে লাভ?'

'লাভ আবার কি। তবে একটা উদ্দেশ্য হয়তো আছে। সেটা আশা করি আপনি বুঝেছেন!'

'না। উদ্দেশ্য আমি বুঝিনি, বুঝতে চাইও না।' শাহেলি কেমন যেন একটু হাসলো। উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। সোজা গিয়ে ইচ্ছে করেই বসলো রবিউল্লাহর টেবিলে তার পাশের চেয়ারে।'

এই সবই লক্ষ্য করছিল কামাল। এতক্ষণ সে বেগম রশিদের সঙ্গে কিছুদূরের একটা টেবিলে বসেছিল। সে দেখলো শাহেলি উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদের চোখ-মুখ হিংসা ও রাগে ধ্বক ধ্বক করে উঠলো। মাহমুদ অত্যন্ত ধূর্ত ও কৌশলী। মুহূর্তেই সে চোখ মুখের অভিব্যক্তি চাপা দিয়ে এমন সহজ ভাবে একটু সরে গিয়ে ডা. চৌধুরীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো যে কামাল মনে মনে তার শক্তির প্রশংসা না করে পারলো না।

পাশের টেবিল থেকে মেজর বদরুদ্দিনের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিলো। বুড়ো হা হা করে হাসছিল আর বলছিল, 'কি জিজ্ঞেস করলেন মিসেস চৌধুরী (রাবেয়া সৈয়দ]) আমার বন্ধু মি. তৈমুর মীর্ধা কেন মানিকপুরে এসেছিল? খুব মজার প্রশ্ন করেছেন যাহোক। তৈমুর মীর্ধা ঠিক কেন মানিকপুরে এসেছিল তা অবশ্য আমার জানার কথা নয়, কারণ আমার সঙ্গে তৈমুর মীর্ধার দেখাই হয়নি। কিন্তু দেখা না হলেই কি? কেন তৈমুর মীর্ধা মানিকপুরে এসেছিল তা বোঝা কি অতোই অসম্ভব? শেক্সপিয়ারের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে নেই, 'To be or not to be that is the question.'

মেজর বদরুদ্দিন হা হা শব্দে হাসতে লাগলো।

পাঁচ

মাহমুদ ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে উঠলো। হাতে তার মদের গ্লাস। টেবিলের উপর একটা শ্যাম্পেনের বোতল। বোতলের অর্ধেকটা খালি। পাশে বসে আছে সুলতানা পারভিন। তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। সুলতানা পারভিন বললো, 'আর খেয়ো না মাহমুদ।'

মাহমুদ মানা শুনলো না। এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে দিলো। চোখে মুখে ফুটে উঠলো অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া। ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, 'তুমি খামোখা চিন্তা করছো পারভিন।' মদ খেলে আমার কিচ্ছু হয় না। ওসব কথা থাক। তুমি বরং গল্পটা শোনো…'

পারভিন আস্তে আস্তে বললো, 'বেশ, বলো।' মাহমুদ খুশি হয়ে একটা চাপড় লাগায় সুলতানা পারভিনের কাঁধে। বলে, 'গুড গার্ল।' মন্তব্য শুনে সুলতানা পারভিনের কোনো ভাবান্তর হলো না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা নিয়ে সে বসে রইলো মাহমুদের পাশে। সুলতানা পারভিনের পরনে বিচিত্র পোশাক। হাত কাটা ব্লাউজের উপর হালকা সুর্মা রঙের পাতলা জামদানী শাড়ি। নিচের অন্তর্বাস নেই। পাতলা শাড়ির আড়ালে তার সুপুষ্ট জঙ্ঘানিতম্ব আর বক্ষদেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

মাহমুদ বললো, 'হাসান মওলাকে ভয় করেছিলাম। শালা হারামী ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চেয়েছিল। শালা কুত্তার বাচ্চা খুন হয়েছে, ভালো হয়েছে।'

মাহমুদ একচোট হাসলো, 'আমার সাথে যে লাগতে আসবে তারই এই দশা হবে। হাসান মওলা মরেছে, এখন পাল্লা দিতে এসেছে মেজর বদরুদ্দিন। এই শুয়োর যে কোত্থেকে এলো বুঝতে পারছি না। এই শালাও আমাকে জ্বালাতে শুরু করেছে। শালাকে পাঁচদিনের মধ্যে আমি নিজের হাতে খুন করবো।'

সুলতানা পারভিন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসে রইলো। মাহমুদ তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এরপর ধরবো কুয়াশাকে। কুয়াশা ভেবেছে ভয় দেখিয়ে কেল্লাফতে করবে। তার ভুলও ভেঙে দেবো আমি...'

সুলতানা পারভিন বললো, 'কুয়াশা কে?'

'কুয়াশা কে তুমি জানো না? ভারি মজার কথা কিন্তু।' মাহমুদ হাসতে লাগলো, 'কুয়াশার কথা তোমাকে এর আগেও বলেছি। কুয়াশা হলো একটা ভয়ঙ্কর ডাকাত... একটা হীন...'

এই সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো একটা দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি, সারা গা ভারি ওভারকোটে ঢাকা। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। মাহমুদ লাফিয়ে উঠে পকেটের পিস্তলে হাত দিলো। লোকটা শান্তভাবে বললো, 'পিস্তল বের করার চেষ্টা করো না মাহমুদ। সেটা তোমার পক্ষে বোকামি হবে।'

মাহমুদ দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ দমন করলো। খালি হাত বের করে আনলো পকেট থেকে। বললো, 'তুমি কি চাও? এতো রাতে আমার বাড়িতে এসেছো কেন?'

'কেন এসেছি তুমি ভালো করেই জানো।' লোকটা স্থির গলায় বললো, 'তোমার পাপের শাস্তি দেয়ার জন্যে শহীদ খানই যথেষ্ট। সে ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা নেই। আমি এসেছি টাকার জন্যে।'

'টাকা, কিসের টাকা, কার টাকা?'

ছায়ামূর্তি গম্ভীর গলায় বললো, 'টাকার উপর কারো স্থায়ী অধিকারের ছাপ থাকে না মাহমুদ। কাল যে টাকা চৌধুরী আলী নকীবের ছিলো আজ সে টাকা তোমার হাতের মুঠোয়। সেই টাকা এখন আমার হবে। চৌধুরী আলী নকীবের সব টাকা আমার চাই, মাহমুদ।'

মাহমুদ তিক্ত হাসলো। বললো, 'তাহলে তোমাকে ব্যাঙ্ক লুট করতেই হবে কুয়াশা। আলী নকীবের সব টাকা ব্যাঙ্কে আছে।'

কয়াশা বললো, 'আমি জানি। ব্যাঙ্ক লুট করার ঝামেলা আমি নিতে চাই না। আমি

তোমার হাত দিয়ে সেই টাকাটা চাই। তুমি এক সপ্তাহের ভেতর সব টাকার কারেন্সী নোট নিয়ে আসবে।'

মাহমুদ বললো, 'ভয় দেখিয়ে হাসান মওলাও আমার উপর ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। সে কথা ভুলে যেয়ো না কুয়াশা।'

'আমি ব্ল্যাকমেল করতে চাই না। আমি টাকা চাই এবং সেটা এক সপ্তাহের ভেতর। এর অন্যথা হলে মানিকপুরের লোকেরা শোবার ঘরে তোমার লাশ দেখতে পাবে এক সপ্তাহ পরেই।'

কুয়াশা একটু থেমে বললো, 'আমার প্রচুর টাকা দরকার। আমি মানুষকে অমর করতে চাই। পৃথিবী থেকে দুঃখ আর জরা দূর করতে চাই। পিরামিডের কোটি কোটি টাকা পেয়েও টাকার প্রয়োজন আমার মেটেনি। আরো টাকা চাই। টাকার জন্যে দরকার হলে দুনিয়ার সব ধনীর ভাণ্ডার লুটতেও আমি প্রস্তুত।'

সুলতানা পারভিন অবাক হয়ে দেখছিল কুয়াশাকে। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখে শাণিত আলো। মোটা ভ্রূরুর উপর আবছা সাদা রঙের ছোপ লেগেছে। কুয়াশার গলার স্বরে কেমন একটা খস্‌খসে আবিষ্টতা।

মাহমুদ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কুয়াশা পিস্তল উদ্যত রেখে পিছু হটতে লাগলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে কুয়াশা হাসলো। বললো, 'মাহমুদ, আমার হাতে যা দেখছো এটা একটা খেলনা পিস্তল। পিস্তলটা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মিড্‌নাইট প্রেজেন্টেশান। এই নাও...'

কুয়াশা পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলো মাহমুদের দিকে। পর মুহূর্তে মাহমুদের হাতের পিস্তল গর্জে উঠলো কুয়াশার দিকে। একটা ভরাট, মিষ্টি হাসি কেঁপে কেঁপে উঠে হঠাৎ ভোজবাজির মতো যেন দেয়ালে মিশে গেল।

মাহমুদ অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে ফুঁসতে লাগলো।

ছয়

ঘরে বসে রিপোর্ট লিখছিল কামাল। মতিন এসে খবর দিলো থানার ও. সি. সমসের শিকদার তার অপেক্ষায় বসে আছেন রিসেপশান ঘরে। গল্প করছে ম্যানেজার আইনুল হকের সঙ্গে।

'আপনি তো চা খেতে গেলেন বেগম রশিদের বাড়ি,' সমসের শিকদার স্বভাবসিদ্ধ ভারিক্কি চালে বলে, 'এদিকে আমার অবস্থা ফাটো ফাটো। ভাবছি কালই হাসান মওলার খুনের চার্জশীট দাখিল করবো ওপরে।'

'বেশ তো করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করবো।'

'তা তো করবেনই, করতেই হবে। কিন্তু এদিকে নতুন খবর। হেড অফিস থেকে লিখে পাঠিয়েছে আই. বি. ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা মি. সিম্পসন নাকি মানিকপুর আসছেন। আদেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে যেন যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হয়।'

শিকদারকে ভরসা দিয়ে কামাল বলে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শিকদার সাহেব। মি. সিম্পসন নিশ্চয়ই আমাদের উপকার বই অপকারে আসবেন না।'

'তা তো বটেই, তবে কি জানেন ওপরওয়ালাদের আবার high sensitive মেজাজ। পান থেকে চুন খসলে রক্ষা নেই সায়েব! ভাবছি শেষ রক্ষা করতে গিয়ে না বেইজ্জতী হই। যাকগে আপনার রিপোর্টের কদ্দূর তাই বলুন।'

'আমার রিপোর্ট মোটামুটি তৈরি আছে। আগামীকাল রিপোর্টের একটা কপি আপনাকে দিতে পারবো আশা করি।'

'বেশ তাই দেবেন। আমি সায়েব পষ্ট কথার মানুষ। হাসান মণ্ডলার খুনের ব্যাপারে আপনার ওপর ষোলোআনা ভরসা করে আছি। আপনি যা বলবেন তার ওপর ভিত্তি করেই ফাইন্যাল চার্জশীট দেবো। তা ব্যাপার কি কামাল সাহেব, শুনলাম বেগম রশিদ নাকি জবর একটা টি-পার্টি দিয়েছেন আপনার সম্মানে?'

'আমার সম্মানে দিয়েছেন বটে। তবে পার্টিটা উনি এক রকম আমার কথায়ই দিয়েছেন। মাহমুদ আর মেজর বদরুদ্দিনের মধ্যে একই পরিবেশে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা চাক্ষুস দেখাই ছিলো আমাদের উদ্দেশ্য।'

'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই তাহলে দেখেছেন বলুন? আপনাদের কথাই সায়েব আলাদা! আমরা situation tackle করি লাঠি দিয়ে, আর আপনারা করেন মস্তিষ্ক দিয়ে। না, না…বিনয় প্রকাশ করবেন না কামাল সাহেব। যা সত্যি আমি তা-ই বলছি। আমি সায়েব পষ্ট কথার মানুষ। আমার মধ্যে কোনো পাক-চক্কর পাবেন না, হ্যাঁ।'

সমসের শিকদার তার বিপুল বপুটি নিয়ে নড়েচড়ে বসে। আইনুল হক এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে বলে, 'চা আসছে, স্যার। চা তাহলে এখানেই দিতে বলি…'

'না, না…এ আপনার ভারি অন্যায় হক সাহেব,' সমসের শিকদার প্রায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'যখনই আসি তখনই চা-টার ঝামেলা করবেন এ অন্যায় সহ্য করা যায় না। তবে হ্যাঁ, আপনার হোটেলের চায়ের নাম আছে বটে! আপনাদের কি বলে ঐ রসমালাইটা। আহা, যেমন মিঠেকড়া তেমনি নরম!'

'রসমালাই দিতে বলেছি, স্যার! আর ঘিয়ে ভেজে সিঙ্গাড়া বানিয়েছে হোটেলের বয়রা। ভিতরে দিয়েছে কুচি কুচি মাংসের কাবাব। সঙ্গে আলু আর মটরশুটি। চলবে

তো, স্যার?'

'শুধু মুখে মুখে আর বলবেন না সায়েব।'

সমসের শিকদার প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। বলে, 'মুখে বলবেন না, কাজে দেখান। বাঙালীর ঐ এক দোষ। শুধু কথা বলে...'

হক সাহেব তাকায় কেয়ারটেকার মুন্সিজীর দিকে। মুন্সি বলে, 'আসছে, মতিন নিয়ে আসছে...'

'নিয়ে আসছে' শুনে সোফায় জুৎ হয়ে বসে সমসের শিকদার। মুন্সিজীর দিকে এতক্ষণে নজর যায়। স্বভাব-সিদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে বলে, 'তুমি সেই জেলখাটা ডাকাতির আসামী মুন্সি না?' হুঁ...জেল থেকে বেরিয়ে নামের বাহার তো খুব খুলেছো! তা মুন্সি নামটা তোমাকে কে দিলো বাপু? Self-styled মুন্সি নাকি, অ্যাঁ? ব্যাটা দেখি কথাও বলে না!'

'জেল থেকে বেরিয়ে খুব নামাজ পড়তাম কিনা স্যার, নামাজে একেবারে মশগুল হয়ে থাকতাম...তাই...'

মুন্সি কৈফিয়ত দেয়, 'সবাই সেই থেকে মুন্সি বলে ডাকতে শুরু করেছে...'

'হুঁ!'

সমসের শিকদার দারুণ রকম গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'তা ভেক যা-ই ধরো না কেন বাপু, লাভ হবে না কিছু। আমি হলাম গিয়ে যাকে বলে এ লাইনের পাকা লোক। একটু এদিক-ওদিক করেছো তো রক্ষে নেই, একদম catch করে ফেলবো।'

বেয়ারা মতিন ট্রেতে করে খাবার নিয়ে ঢোকে। দু'টো প্লেট সাজিয়ে একটা কামালের সামনে আর একটা সমসের শিকদারের সামনে রাখে। লোলুপ দৃষ্টিতে প্লেটের দিকে তাকিয়ে সমসের শিকদার তাড়া দেয় কামালকে, 'কই সাহেব বিসমিল্লাহ করেন...'

'হ্যাঁ, শুরু করুন।'

কামাল সায় দেয়।

ম্যানেজার আইনুল হক বলে, 'আমি তাহলে সবাইকে বলে দিই স্যার যে চা-টা'র পর আপনি সবার সঙ্গে মিট করছেন?'

গোটা তিন রসমালাই চামচে করে গালে ফেলতে যাচ্ছিলো সমসের শিকদার, বাধা পেয়ে থমকে গেল, হুঙ্কার ছেড়ে বললো, 'আমি এখন একদম কথা বলতে পারবো না। আমার একটা principle আছে বুঝলেন? কাজের সময় কাজই করি। আর...'

পরের কথাগুলো রসমালাইয়ের নরম ছানা আর রসে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে মুখের

ভিতর জড়িয়ে গেল। কিছু বোঝা গেল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সমসের শিকাদর দুই খিলি পানে আধ শিশি কড়া জর্দা মিশিয়ে গালে ফেললো। পান চিবুতে চিবুতে ঢেকুর উঠতে লাগলো তার। জানালার ধারে গিয়ে বার দুই পিক ফেলে পানটাকে মুখের ভিতর ধাতস্থ করলো শিকদার। কামালকে বললো, 'রাতে আর জবানবন্দীর হাঙ্গামা নিলাম না, কি বলেন!'

'ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ সায়েব, খুব টায়ার্ড হয়ে আছি। তার ওপর সন্ধ্যেবেলা যখন শুনলাম, রশিদ সাহেব একটা জবর টি-পার্টি দিয়েছেন অথচ আমাকে ডাকেননি তখন মিথ্যে বলবো না সাহেব, তখন একেবারে আঁতে ঘা লেগেছিল। যাকগে, হক সাহেবের রসমালাই আর সিঙ্গাড়া দিয়ে শূন্যস্থান অনেকটা পূরণ করা গেল। কী বলেন হক সাহেব, অ্যাঁ?'

সমসের শিকদার গলা খুলে হাসতে লাগলো আর হাসির বিকট আওয়াজে গম্‌গম্‌ করে উঠলো ঘরের ভিতরটা। গোটা দুই ঢেকুর উঠলো শিকদারের। বিপুল ভুঁড়ি বাগিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে শিকদার বলে, 'তাহলে আজ উঠি। ভালো কথা, হক সাহেব, সেদিন আপনার হোটেলে যে সব লোকের জবানবন্দী নেয়া হলো, তাদের কাউকে আমার অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বেন না...'

'আমি সবাইকে ঘটনার রাতেই আপনার আদেশ জানিয়ে দিয়েছি, স্যার...'

'ঠিক হ্যায়, চলি, ইয়া মালেক...'

সমসের শিকদার কামালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। রিসেপশান থেকে কামাল নিজের ঘরে আসে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছিল ঘরে। কামাল উত্তর দিকের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ প্রায় চমকে ওঠে। জানালার বাইরে রাজা সাহেবের ধূ ধূ করা মাঠ। চারিদিকে আচ্ছন্ন অন্ধকারে ঢাকা। উপরের নগ্ন আকাশে কোটি কোটি তারার আলোময় চোখ। তারার অস্পষ্ট আলোয় কামাল দেখলো হোটেলের অনতিদূরে রাজা সাহেবের মাঠে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি মূর্তি। একজনকে চিনলো কামাল—মেজর বদরুদ্দিন। আর একজনকে চিনতে পারলো না। গা ঢাকা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। কথা বলতে বলতে ওরা কাছে এগিয়ে এলো। অচেনা লোকটা বললো, 'যা বললাম তা না করলে বিপদ হবে ভাইজান।'

অসহায়ের মতো মেজর বদরুদ্দিন বললো, 'কিন্তু...'

'চুপ করুন!'

অচেনা লোকটা চাপা গলায় বলে উঠলো। গলাটা যেন চেনা চেনা লাগলো। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই ধরতে পারলো না কামাল।

লোকটা বললো, 'অনেকদূর এগিয়েছি। আর পিছন ফিরলে আপনিও মরবেন,

আমিও মরবো। যান···আমি চলি।'

লোকটা হন্ হন্ করে মাঠের দিকে চলে যায়। মাথার চুল ধরে উদভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মেজর।

কিছুক্ষণ পর গা ঢাকা দিয়ে পিছনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। রিসেপশানে বুড়োর হা হা হাসি আর কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল একটু বাদেই।

রিসেপশানে যাবে বলে একবার ভাবলো কামাল। পরক্ষণেই মনে হলো মেজর বদরুদ্দিন যেমন ধূর্ত আর ধড়িবাজ তাতে সামনাসামনি কথাবার্তার ফাঁক ধরে কিছু আদায় করার চেষ্টা অপচেষ্টা বই কিছু নয়। কি করবে ভাবছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো আইনুল হক।

'স্যার।'

'কি ব্যাপার হক সাহেব?'

'রিসেপশানে একবারটি আসুন, স্যার। মেজর সাহেব কেমন যেন পাগলামি করছেন। তার কথাবার্তা আর হাসির ধরন আমার ভালো ঠেকছে না, স্যার।'

'চলুন দেখি···'

রিসেপশানে এসে কামাল দেখলো জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসেছে মেজর বদরুদ্দিন। সামনের টেবিলে তার ছড়ি ও টুপি রাখা। অনর্গল কথা বলছে মেজর বদরুদ্দিন। ঘরে দু'একজন নতুন বোর্ডার ছাড়াও আছে বেয়ারা মতিন, মুন্সিজী ও ডাক্তার রহিম। আপন মনে কথা বলে চলেছে মেজর বদরুদ্দিন। কখনো হা হা করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ছে, কখনো মেজাজ গরম করে চিৎকার ছাড়ছে।

'আমি ভেবেছো ওকে ছেড়ে দেবো? কভি নেহি। কভি নেহি। ও আমার সর্বনাশ করেছে, আমাকে পথের ভিখারী করেছে। শালাকে আমি খুন করবো। দাঁড়াও, কালই আমি বার্মা যাবো। পাসপোর্ট নেই তো কি হয়েছে? ইণ্ডিয়ান আর্মির 'বি' কোম্পানীর মেজর বদরুদ্দিনের পাসপোর্ট লাগে না। পাসপোর্ট ছাড়াই আমি বার্মা যাবো।'

আইনুল হক কাছে গিয়ে বিনীত ভাবে বলে, 'মেজর সাহেব, আপনার ঘরে চলুন···'

'আমার ঘর, yon mean my room?'

ভ্রূ কুঁচকে তাকায় মেজর বদরুদ্দিন। হা হা করে হাসে। বলে, 'আমার আবার ঘর কোথায় হে। ঘর নেই। NO room. no shelter. তুমি বাপু কানের কাছে অমন গুন্‌গুন্ করো না···ভালো হবে না কিন্তু!'

বৃদ্ধ ডাক্তার রহিম এতক্ষণে বলে, 'মেজর সাহেব নিশ্চয় কোনো একটা Pressure এ ভুগছেন। আপনারা অনুমতি করেন তো এঁকে আমি দেখতে পারি···'

'তাহলে তো স্যার ভালোই হয়।'

ম্যানেজার আইনুল হক কৃতার্থ কণ্ঠে বলে, 'কী যে বিপদে পড়েছি স্যার।' অ্যাদ্দিন ধরে হোটেলে চাকরি করছি, এমন বিপদে আর কখনো পড়িনি। এই সেদিন হাসান মওলা খুন হলো হোটেলে, তারই জের কাটেনি এখনো। আবার শুরু হয়েছে নতুন ঝামেলা।'

আইনুল হক সাতিশয় বিরক্ত। তার চোখ পড়ে মুন্সিজী আর মতিনের দিকে। মতিন যেন মেজর সাহেবের কথাগুলো গিলছি।

আইনুল হক ধমক দিয়ে ওঠে। বলে, 'মতিন তুমি তোমার কাজে যাও। মুন্সি তুমিও যাও এখন। এগারো আর বারো নম্বরে একটা ফ্যামিলি এসে উঠেছে। ওদিকে নজর দাও গিয়ে।'

মতিন আর মুন্সিজী তাড়াতাড়ি রিসেপশান থেকে রেরিয়ে যায়। মেজর বদরুদ্দিন খুব মনযোগ দিয়ে আইনুলের ধমক মেশানো কথাগুলো শুনলো। তার চোখ–মুখ আহত অপমানে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বলে, 'ইউ। মেজর বদরুদ্দিন থাকতে এই মাঠে কমাণ্ড দেবার তুমি কে? ভালো হবে না বলছি…'

কথাগুলি গায়ে মাখায় না ম্যানেজার আইনুল হক। কামালের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'দেখলেন ে। স্যার। একদম বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। কই ডাক্তার সাহেব…একটু দেখবেন বলেছিলেন…'

ডাক্তার রহিম মেজর বদরুদ্দিনকে পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ওঠে মেজর বদরুদ্দিন, 'I say stop! Do'nt proceed. ভালো হবে না কিন্তু।'

ডাক্তার রহিম চিৎকার শুনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই থ।

এক ধমকে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে মেজর বদরুদ্দিন ভারি খুশি। উঠে দাঁড়িয়ে কমাণ্ড দেয়ার ভঙ্গিতে মিলিটারী কায়দায় বলে, 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট্ ইজ!'

'আমি বলছিলাম কি স্যার…'

ম্যানেজার আইনুল হক আবেদন করার ভঙ্গিতে বলতে যায় মেজর বদরুদ্দিনকে। মেজর বদরুদ্দিন হা হা করে হেসে বলে, 'তুমি বলছিলে? তুমি আবার কি বলবে হে? তুমি তো একটা লেন্স কর্পোরেল মাত্র। কোম্পানি এটেনশান!'

মেজর বদরুদ্দিন হুকুম ছাড়ে। তার চোখ পড়ে ডাক্তার রহিমের দিকে। একটু এগিয়ে এসে উপরওয়ালার ভঙ্গিতে সৌজন্যের সঙ্গে বলে, 'You need'nt worry my dear. আপনার ভয় কি? আপনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। এখন মেজর ডেজিগ্নেট। Be cheerful man!'

ম্যানেজার আইনুল হক কি বলতে যাচ্ছিলো। মেজর বদরুদ্দিন খেপাটে গলায় হুকুম দেয়, ' You! Do'nt move.'

আইনুলক হক আর কথা বলতে সাহস করে না। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকায় কামালের দিকে। ভাবখানা, দেখলেন তো স্যার, কি ন্যাংটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

'কোম্পানি!'

মেজর বদরুদ্দিন স্থিরভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'আমি কাল ভোর বেলা বার্মা যাচ্ছি। লে. কর্নেল সিদ্দিকীকে আমি দেখে ছাড়বো। আমার অবর্তমানে Major designate রহিম কোম্পানির চার্জে থাকবে। অলরাইট?'

কামাল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সবটা ঘটনাই অবিশ্বাস্য ঠেক্‌ছে। এই তো বিকেল পাঁচটায় মেজর বদরুদ্দিন টি–পার্টিতে গেল বেগম রশিদের বাড়ি। দিব্যি সুস্থ সমর্থ মানুষ। একটু আগেও রাজা সাহেবের মাঠে কার সঙ্গে কথা বলছিল অন্ধকারে। মাঠ থেকে হোটেলে ফিরেই, অন্ধকার থেকে আলোতে এসেই হঠাৎ কেন ভোল পাল্টালো মেজর সাহেব?

এটা কি পাগলামি না পাগলামির অভিনয়? কিংবা নতুন কোনো রহস্যের সূচনা?

বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কামাল। মেজর বদরুদ্দিন উৎফুল্ল কণ্ঠে ঘোষণা করলো, 'ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দাও হে। আমি এখন বিশ্রাম করবো। I will take rest now, শুনেছো?'

ম্যানেজার আইনুল হক কামালের মতোই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল কতক্ষণ। 'ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দাও হে' বলেই মেজর সাহেব যখন রিসেপশানের এক ঘর লোকের সামনে আনন্দে উদ্বাহু নৃত্য করতে শুরু করলো তখন তার চেতনা ফিরলো।

গুরুবন্ত সিং ও মুন্সিজীর সহায়তায় মেজরকে তার নিজের ঘরে নিয়ে আসা হলো। প্রায় জোর করে খানিকটা দুধ খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। দুধের সঙ্গে কামালের নির্দেশে পরিমিত ঘুমের ঔষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার রহিম। কিছুক্ষণ বিছানায় দাপাদাপি করে, হোটেলের সকলকে 'কোর্ট মার্শালের' ভয় দেখিয়ে মেজর বদরুদ্দিন কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

নিজের ঘরে এসে শ্রান্ত কামাল বিছানায় গা এলিয়ে দিলো।

হোটেলের পেটা ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে।

সাত

আরো একটা রাত কাটলো মানিকপুরে।

সকাল এগারোটায় হোটেল তাজে নিজের ঘরে বসে গত অসমাপ্ত ডায়েরীর শেষ কটা লাইন লিখছিল কামাল।

'আমার কোনো সন্দেহ নেই হাসান মওলাকে মাহমুদ-ই হত্যা করেছে। যথাযোগ্য প্রমাণের অপেক্ষায় এতদিন তাকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত ছিলাম। মেজর বদরুদ্দিনের আকস্মিক অপ্রকৃতিস্থতা দেখে বুঝতে পারছি মাহমুদকে বাইরে রাখার অর্থ নতুন বিপদ ডেকে আনা। তাকে শিগগির গ্রেপ্তার করাই সঙ্গত। হাসান মওলাকে খুন করার যে অভিযোগ মাহমুদের বিরুদ্ধে উথাপিত হচ্ছে সেই অভিযোগ প্রমাণের এক নম্বর সাক্ষী হোটেল তাজের কেয়ারটেকার মুন্সিজী। দ্বিতীয় প্রমাণ এম মনোগ্রাম করা সিগারেট লাইটার, যা অকুস্থলে পাওয়া গেছে, মাহমুদ নিজেও যার মালিকানা নিজের মুখে স্বীকার করেছে। তৃতীয় প্রমাণ…'

মনোযোগের সঙ্গে লিখছিল কামাল। হঠাৎ ভেজানো দরজা খুলে যে লোকটা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো সে।

'আরে শহীদ…What surprise…কখন এসেছিস?'

'কখন এসেছি?' শুনে তুই যে রাগ করবি। বলবো কিনা ভাবছি!

'হেঁয়ালি রাখ। কখন এসেছিস তাই বল।'

'বলছি। কিন্তু তোর ভদ্রতা জ্ঞান দেখছি একেবারে লোপ পেয়েছে! বসতেও বললি না পর্যন্ত।'

শহীদ মৃদু হেসে খাটের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলো। একটা সিগারেট ধরালো। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'আমি মানিকপুরে এসে পৌঁছেছি সকাল সাতটা বিশের গাড়িতে। আর এতেই অবাক হচ্ছিস? শোন্ আগে। সাতটা বিশে মানিকপুরে এসে থানায় গিয়েছি প্রথম। মি. শিকদারের আইডেনটিটি কার্ড দেখাতেই ভদ্রলোক ভুঁড়ি সামলে এমন একখানা স্যালুট ঝাড়লো যে দাপটে মনে হচ্ছিলো মা ধরিত্রী কেঁপে উঠলেন। তা মি. শিকদার তার প্রমোশনের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস বোঝা গেল। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের মি. সিম্পসনের বন্ধু জেনে খাতির-যত্নের চূড়ান্ত করলেন ভদ্রলোক। এই আধা শহর আধা গ্রাম মানিকপুরে তিনি আমাকে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ফাইন কোয়ালিটির কফি পর্যন্ত খাওয়ালেন। মি. শিকদারের প্রমোশন রুখে কে…'

'বাজে কথা রেখে ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো।'

'আহা অস্থির হচ্ছিস কেন?' মানিকপুরে এসে পৌছেছি সকাল সাড়ে সাতটায়। এই সময় তোর ঘুমই ভাঙে না সাধারণতঃ, তাই ভাবলাম তোকে ডিসটার্ব না করে মি. শিকদারের সঙ্গে বরং প্রাতঃভ্রমণটা সেরে নেয়া যাক।'

'প্রাতঃভ্রমণ?'

'প্রাতঃভ্রমণ অবশ্য তখন ঠিক বলা যায় না। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোতে বেরোতে সোয়া আটটা বেজে গেল। কিন্তু সময়টা শীতের শুরু তো। বেরিয়ে মোটামুটি Morning walk-এর আমেজই পাওয়া গেল। তা ঘুরতে ঘুরতে মানিকপুরের চৌধুরী পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাতের পালাটা চুকিয়ে এলাম। মি. শিকদার ছিলেন সঙ্গে। তিনিই সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম গেলাম সুলতানা পারভিনের ওখানে। সুলতানা পারভিন, মাহমুদ দু'জনের সঙ্গেই দেখা হলো। তোর কথাই ঠিক দোস্ত। মাহমুদ লোকটা ভারি জটিল আর গোঁয়ার-গোবিন্দ। তবে লোক ভালো সুলতানা পারভিন। তোর জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি মহিলা আমার দিকে বার বার তাকিয়ে মিষ্টি হাসছিল। দেখতে মহিলা বেশ সুন্দরী।'

কামাল আর থাকতে না পেরে অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'বাঁকা টানটা রেখে দয়া করে একটু সোজাসুজি কথা বলবি শহীদ? Sometimes you talk simply nonsense!'

'এবং বুঝতে হবে তখনই আমি সিরিয়াসলি কথা বলছি...'

শহীদ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ে। বলে, 'সে যা-ই হোক। আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত মি. শিকদারের সঙ্গে একে একে সুলতানা পারভিন, মাহমুদ, মর্জিনা বানু, শাহেলি, রাবেয়া সৈয়দ, ডা. চৌধুরী ও রবিউল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা করেছি।

কামাল হাসে, 'তোর চেহারা দেখে কেউ সন্দেহ করেনি?'

'সন্দেহ করেছে। মানিকপুর থানার ও. সি. শিকদার সাহেব আমার ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি সুস্থ কি না তা সন্দেহ করেছেন। মুখে কিছু বলেননি বটে, তবে আমি বুঝেছি।'

দু'জন খুব হাসলো। শহীদ বললো, 'বুরুজ মিঞাকে যে একমাত্র চিনতে পেরেছে সে হলো কুয়াশা। আর কেউ চেনেনি।'

কামাল বললো, 'ভালো কথা, বেগম রশিদের সাথে দেখা করিসনি?'

'না প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'মানিকপুরে নেমেই তদন্তের প্রথম পর্যায় তাহলে শেষ করে এসেছিস?'

'মোটেই না। আমি সবে তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছি। আমি কাদের ওপর তদন্ত

করতে যাচ্ছি শুনবি?'

'কাদের ওপরে?'

'গুরুত্ব অনুযায়ী নামগুলো সাজিয়ে বলছি, শোন—এক হোটেল তাজের বেয়ারা মতিন, দুই কেয়ারটেকার মুন্সিজী, তিন এক্কা গাড়ির গাড়োয়ান খাঁসাব…তারপর একে একে রাবেয়া সৈয়দ, শাহেলী, মাহমুদ, সুলতানা পারভিন, রবিউল্লাহ, মেজর বদরুদ্দিন ও মি. রশিদ।

'বলিস কিরে? আমার রিপোর্ট তাহলে স্থগিত রাখতে হয়?'

'তুই রিপোর্ট তৈরি করেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ। এই দ্যাখ, পড়…শেষটুকু অবশ্য তৈরি হয়নি। কিন্তু বুঝতে কিছুই অসুবিধে হবে না।'

'পড়ছি। ইতিমধ্যে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে আয় দোস্ত। মি. শিকদার বোধহয় রিসেপশানে অপেক্ষা করছেন। তার চা-টা-ও পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।'

'আমি দেখছি। তুই কাগজ ক'খানা দেখে ফ্যাল।'

কামাল বেরিয়ে যায়। জানালার ফাঁক দিয়ে পুড়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় শহীদ। টেবিলের উপর রাখা কাগজ ক'খানা টেনে নেয়। হাসান মণ্ডলার খুনের তদন্তের উপর কামালের রিপোর্ট। মনোযোগ দিয়ে রিপোর্টটা পড়ে শহীদ। পড়তে পড়তে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে। কপালের বলিরেখায় ফুটে ওঠে চিন্তার ছাপ।

চায়ের কথা বলে এসে কামাল ঢোকে ঘরে। শহীদ তখন রিপোর্ট পড়া শেষ করে নতুন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানছে।

'দেখা শেষ?'

'হ্যাঁ। তোর রিপোর্ট আমার যথেষ্ট কাজে লাগবে।'

'আমার রিপোর্ট সম্বন্ধে তোর মন্তব্যটা আরো পরিষ্কার হলে ভালো হতো শহীদ।'

'শেষ মন্তব্যের সময় কি এসে গেছে কামাল? আমার বিশ্বাস বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তাতে হাসান মণ্ডলার মৃত্যুর ব্যাপারে মাহমুদকে অভিযুক্ত না করে গত্যন্তর নেই এবং কার্যতঃ তুই তা-ই করেছিস।'

'অর্থাৎ মাহমুদ দোষী মনে হলেও আসলে সে তা নয়?'

'আমি কোনো মন্তব্যই করতে চাই না এখন। শুধু একটা কথা বলতে চাই, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়েছে। ভালো কথা, মেজর বদরুদ্দিন এখনো হোটেলেই অবস্থান করছেন তো?'

'হুঁ।'

কামাল সবিস্তারে বেগম রশিদের পার্টিতে যোগ দেয়া থেকে শুরু করে রাজা সাহেবের মাঠে সন্ধ্যার পর অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির সঙ্গে মেজর বদরুদ্দিনের রহস্যময় সাক্ষাৎ ও মাঠ থেকে ফিরে নাটকীয় ভাবে তার হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ার কাহিনী খুলে বললো।

শহীদ সব শুনে চুপ করে রইলো। অনেকক্ষণ কথা বললো না। বহুক্ষণ পর বললো, 'আমি দেখা করতে চাই মেজর বদরুদ্দিনের সঙ্গে।'

চা নিয়ে বেয়ারা ভিতরে ঢুকলো। শহীদ চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে বললো, 'তোর রিপোর্ট তুলে রাখ কামাল। আমার সঙ্গে এক্ষুণি বেরোতে হবে। আর হাসান মণ্ডলার ছবি তুলে রেখেছিস লিখেছিলি। কই দেখি ছবিটা?'

আট

চা খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে রিসেপশানে এলো শহীদ। থানার দারোগা মি. শিকদারের সঙ্গে দু'একটা দরকারি কথা সেরে তাকে বিদায় দিয়ে কামাল ও ম্যানেজার আইনুল হকসহ সে ঢুকলো মেজর বদরুদ্দিনের ঘরে।

'কি, আমাকে চিনতে পারছেন?'

'চিনতে পারবো না মানে?'

মেজর বদরুদ্দিনের চোখে ধমকের আগুন ফোটে। বলে, 'আপনি তো ক্যাপ্টেন হালিম। তা আমার কাছে এসেছেন কেন? রিপোর্ট করতে?' অ্যাটেনশান প্লিজ। একমাস ছুটিতে গিয়ে দেখছি অফিশিয়েল কায়দা–কানুন সব ভুলে বসে আছেন।

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো মেজর বদরুদ্দিনের দিকে। হা হা করে হেসে উঠলো মেজর। বললো, 'কি হলো ক্যাপ্টেন হালিম, নিজের বস্‌কে চিনতে পারছেন না? না, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি!'

মেজর বদরুদ্দিন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা লম্বা করে বিছানায় বসে আছে। পরনে গত রাতের পোশাক। দাড়ি কামানো হয়নি দু'দিন ধরে। উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে চেহারা।

শহীদ আবার বলে, 'আমাকে চিনতে পারছেন না মেজর সাহেব?' আমি শহীদ। একটু ভালো রকম চিন্তা করে দেখুন তো কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল?

This is intolerble.

মেজর বদরুদ্দিন চেঁচিয়ে ওঠে রাগে, অভিমানে, 'subordinate হয়ে এ রকম কুৎসিত ব্যবহার করবে এ সহ্য করা একেবারে অসম্ভব! I say get out!'

মৃদু হাসলো শহীদ। বললো, 'আপনি খুব চালাক মানুষ মেজর সাহেব। কিন্তু এযাত্রা খুব বোকামি করে বসেছেন। অলরাইট। বিশ্রাম করুন আপনি।'

সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পিছনে কামাল ও ম্যানেজার আইনুল হক।

'হক সাহেব,'

ম্যানেজারকে ডাক দেয় শহীদ।

'বলুন স্যার।'

'আপনার বেয়ারা মতিনকে বলুন এখানে একটু আসতে। আপনার হোটেলটা ভারি সুন্দর। হোটেলটা ঘুরে ফিরে দেখবো।'

কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না আইনুল হক। বিনীত কণ্ঠে বলে, 'এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো শহীদ ও কামাল। তখন রোদের ঝিলিমিলি লেগেছে বাগানের কামরাঙা গাছের মাথায়। সুন্দর, উজ্জ্বল দিন।

কিছুক্ষণ বাদেই মতিন এলো। ছোটোখাটো, শক্ত-সমর্থ মানুষটা। কপালের বাঁ পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ।

'তোমার নাম মতিন?'

'জ্বি, হুজুর।'

'তোমাকে নিয়ে আমরা হোটেলটা ঘুরে ফিরে দেখতে যাচ্ছি।'

'চলুন হুজুর। হোটেল দেখতে অনেকেই আসেন। আপনার সঙ্গের এই হুজুর তো (কামালকে দেখিয়ে) অনেকবারই এসেছেন।'

বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে হোটেলটা দেখে হঠাৎ কি যেন মনে পড়লো শহীদের। বললো, 'মতিন, কামাল সাহেবের ঘরে আমার হাতবাক্সটা আছে। হাতবাক্স খুলে আমার ক্যামেরাটা এনে দিতে পারবে? এই নাও চাবি...'

কামালের ঘরের চাবি ইচ্ছা করেই শহীদ নিয়ে রেখেছিল নিজের হাতে। চাবিটা সে মতিনের হাতে দেয়। চাবি নিয়ে চলে যায় মতিন।

'তোর কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝতে পারছি না শহীদ।'

'বুঝতে ঠিক পারবি। চল এগোই। আচ্ছা কামাল, সামনের ঐ লোকটা কে বল্ তো, কেয়ারটেকার মুন্সিজী না?'

'ঠিক ধরেছিস! ডাকবো ওকে?'

'হ্যাঁ ডাক।'

কামালের ডাকে কাছে এসে দাঁড়ায় মুন্সিজী। শহীদ বলে, 'এই দুপুর বারোটায় তুমি কোথায় গিয়েছিলে মুন্সিজী?'

মাঠের দিক দেখিয়ে মুন্সি বলে, 'ওই দিকে হুজুর।'

'ওই দিকে যাওনি, তুমি গিয়েছিলে পাতাবাহার রোড পার হয়ে রবিউল্লাহ্ সাহেবের ফার্মে, তাই না?'

'না হুজুর, ওখানে আমি যাইনি।' মুন্সি অস্বীকার করে।

'মানুষের স্বভাব কখনো বদলায় না, জানিস কামাল?' কামালের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে বলে শহীদ। তাকায় মুন্সিজীর দিকে। বলে, 'আচ্ছা মুন্সি, রবিউল্লাহ্ সাহেব প্রায়ই হাসান মণ্ডলার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাই না?'

'প্রায় কিনা জানি না হুজুর। তবে একদিন দেখা করতে এসেছিলেন।' মুন্সিজী এবারে অনেকটা ভয়ে ভয়ে বলে।

'কখন এসেছিলেন?'

'তখন অনুমান রাত ন'টা।'

'হুঁ। ইদানীং মেজর সাহেবের সঙ্গে গোপনে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করছেন, ঠিক না?'

মুন্সি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বলে, 'হ্যাঁ, হুজুর।'

'কেন বলতে পারবে?'

'না হুজুর।'

'তুমি এসব কথা পুলিসের কাছে বলোনি কেন?'

মুন্সিজী চুপ করে থাকে। ইতিমধ্যে ক্যামেরা নিয়ে ফিরে আসে মতিন। বলে, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি হুজুর।'

'ঠিক আছে।'

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় শহীদ। মুন্সিজীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আচ্ছা, তুমি এবারে যেতে পারো।'

শহীদ ও কামালের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুন্সিজী। বোধহয় কাকুতি-মিনতির সঙ্গে কিছু বলতেও যাচ্ছিলো। তার বলার আগেই শহীদ বলে উঠলো, 'তুমি যে নিরপরাধ তা আমি জানি মুন্সি। তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু সাবধান, কাউকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যে কথা বলতে যেয়ো না। তাহলে নিজেই শক্ত বিপদে পড়বে, বলে রাখলাম। মতিন, এখন আমরা একটু বেরোচ্ছি। তুমি যেতে পারো।'

পাতাবাহার রোডের দিকে হাঁটতে লাগলো দু'জনে। কামাল বললো, 'মনে হচ্ছে ঘটনার সব রহস্যই তোর জানা…'

'সে জন্যে সবচে' বেশি প্রশংসার দাবি করতে পারে কে জানিস?'

'না।'

'এজন্যে প্রশংসার দাবিদার তুই। আর আমার কমনসেন্স।'

শহীদ হাসে, 'তোর চোখ আর আমার মন দুটোই ঠিক ঠিক কাজে লেগেছে।'

'তাহলে তুই রহস্য উদ্ধার করেছিস?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা Hypothesis মাত্র, অনুমান। প্রমাণপত্র সংগ্রহের পর বলা যাবে আমি হাসান মওলার মৃত্যু রহস্য ভেদ করতে পেরেছি কিনা। মতিন ও মুন্সিজীর জবানবন্দী পেয়ে গেছি। এখন চল এক্কা গাড়ির গাড়োয়ান খাঁসাবের কাছে। আমি জানি কামাল, গাড়োয়ান খাঁসাবের কাছ থেকে যে জবানবন্দী পাবো তা শুনে চমকে উঠবি তুই।'

'বটে?'

'দেখিস।'

একটা রিক্শা করে স্টেশনে গেল ওরা। খাঁসাবকে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না। একটা জামগাছের তলায় গাড়ি রেখে ঘোড়াকে দানা খাওয়াচ্ছিল খাঁসাব। আর দুপুর একটা পঁয়ত্রিশের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিল। কামাল ও শহীদকে দেখে মুখ তুলে তাকালো সে। তারপর বললো, 'কি স্যার, গাড়ি লাগবো?'

'না গাড়ি লাগবে না। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম খাঁসাব।'

একটু অপ্রতিভ হয়ে খাঁসাব বলে, 'তা কন হুজুর, কি কইবেন।'

'আচ্ছা খাঁসাব, ধরো একটা মানুষ মারা পড়েছে তোমাদের মানিকপুরে। মানুষটা কিসে মারা পড়লো সেটা বের করার ব্যাপারে যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, তুমি সাহায্য করবে না?'

'করুম না মানে। একশোবার করুম হুজুর। কন, কি লাগবো···কইয়া ফালান।'

খাঁসাব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বললো, 'কোন্ খুনের কথা কইতেছেন হুজুর? আমাগো মানিকপুরের হোটেলে যে খুনটা অইয়া গেছে হেই ঘটনার কথা কইতেছেন?'

'খাঁসাব তুমি ঠিক ধরেছো। হোটেল তাজে যে মানুষটা মরেছে বিষ্যুদবার রাতে তার কথাই বলছি।'

'হ হুজুর। খুন রাইতে হইছে, আমরা গিয়ে শুনছি শুক্কুর বার বিয়ালে।'

'হ্যাঁ, শুক্রবার সকালে সেটা তুমি শুনেছো। আচ্ছা খাঁসাব, বিষ্যুদবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটার সময় একজন লোক তোমার গাড়িতে চড়ে এবং তোমাকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বকশিশ দিয়েছিল, মনে পড়ে তোমার?'

খাঁসাব হাঁ করে থাকে কিছুক্ষণ। বোধহয় বিষ্যুদবার রাতের খুনের সঙ্গে এই ঘটনার সম্বন্ধ আছে ভেবে বিস্মিত হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, 'হুজুর,

মাত্র তো ছ'সাত দিন আগের ঘটনা। মনে থাকবো না কেন?'

'যে লোকটা তোমার গাড়িতে চড়ে স্টেশনে এসেছিল তাকে চেনো তুমি?'

গাড়োয়ান কথা বললো না। চুপ করে রইলো। শহীদ বললো, 'পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে সেই লোকটা কাউকে কিছু বলতে মানা করে গিয়েছিল তোমাকে। তাই না খাঁসাব?'

'হ হুজুর।'

'দেখো খাঁসাব, এটা খুন খারাপির ব্যাপার। তুমি যদি ঐ লোকটার নাম আমাদের না বলো তাহলে কিছুতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয় না। তুমিও হয়তো হাঙ্গামায় পড়বে।'

'হাঙ্গামারে এই খাঁসাব ডরায় না হুজুর!'

গাড়োয়ানের চোখ-মুখ উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে থাকে, 'কিন্তুক কথা অইলো আমি তেনার নাম না কইলে আমার ধর্ম নষ্ট অইবো। হুজুর, ধর্ম নষ্ট করবার পারুম না আমি! যে লোকটা আমার গাড়িতে কইর‍্যা আইছিল তেনার নাম রশিদ সায়েব, চৌধুরী বাড়ির রশিদ সায়েব গো হুজুর।'

'রশিদ চৌধুরী?'

কামালের মুখে আর কথা সরে না।

মৃদু হাসে শহীদ। বলে, 'খাঁসাব, এই কথা তুমি পুলিসের কাছে বলতে পারবে?'

'পারুম হুজুর। রশিদ সায়েবেরে মান্যি-গন্যি করি। তয় তেনি যদি খুন কইর‍্যা ছাপাইয়া ফাল্‌তে চান, তাইলে তারে ছাড়ুম ক্যান? খোদার রাজত্বে ইনসাফ কি উইঠ্যা যাইবো হুজুর?' পুলিসের কাছে কমু হুজুর, দরকার অইলে হাকিমের কাছেও কমু।

গাড়োয়ান খাঁসাবের জবানবন্দী নিয়ে শহীদ ও কামাল আবার রিক্‌শা নিলো। পাতাবাহার রোড ধরে রিক্‌শা এগিয়ে চললো কলোনি পার হয়ে সামনে। ডা. চৌধুরীর বাড়ির কাছে এসে রিক্‌শা থেকে নামলো ওরা। কামাল বললো, 'এখানে নামলি যে?'

'চল্ গলাটা ভিজিয়ে নিই এই বাড়িতে। ডা. চৌধুরীর ড্রয়িংরুমটাও ঘুরে যাবো এই অবসরে।'

কামাল শহীদের চালচলন কিছু বুঝতে পারলো না। সে সজাগ কৌতূহলে অনুসরণ করলো তাকে।

একটা চাকর দেখতে পেয়ে ড্রয়িংরুমে এনে বসালো ওদের। তারপর বেগম সাহেবাকে খবর দিতে ভিতরে চলে গেল। একটা সোফায় আরাম করে বসে শহীদ বললো, 'সিগারেট চলবে?'

'দে।'

একটা সিগারেট কামালকে দিয়ে নিজে আর একটা ধরালো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'মানিকপুরের চৌধুরীরা খুব acoomplished. কি বলিস? যে বাড়িতেই গিয়েছি, সেখানেই অভ্যর্থনার সাড়া পড়ে গেছে। দেখা যাক দ্বিতীয় কিস্তিতে রাবেয়া সৈয়দ কি রকম ব্যবহার করেন।'

খবর পেয়ে রাবেয়া সৈয়দ এলেন স্বভাবসিদ্ধ স্থির শান্ত মুখে। দুধ সাদা শাড়ির উপর পাতলা খয়েরী রঙের চাদর জড়ানো। গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই। নিরাভরণ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। দেখলেই সম্ভ্রান্ত বলে চেনা যায়।

'এবারে সত্যি সত্যি বিরক্ত করতে এলাম মিসেস চৌধুরী। সকালবেলা বলেছিলেন চা খেতে, খাইনি। তাই পুরো দেড় ঘন্টা মানিকপুরে ঘুরে ঘুরে আকণ্ঠ তৃষ্ণা জোগাড় করে নিয়ে এসেছি।'

শহীদের কথায় মিষ্টি হাসলেন রাবেয়া সৈয়দ। বললেন, 'আমি চায়ের কথা বলেই এসেছি।'

'অনেক ধন্যবাদ। ডা. চৌধুরী নিশ্চয়ই চেম্বারে?'

'জ্বি, হাঁ, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন।'

'Excuse me.'

শহীদ হঠাৎ এগিয়ে যায় দেয়ালের দিকে। দেয়ালে টাঙানো আছে পাশাপাশি দুটো অয়েল-পেন্টিং। একটা রাবেয়া সৈয়দের। কাছে গিয়ে দুটো ছবিই দেখে শহীদ। রাবেয়া সৈয়দের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই ছবিটা আপনার, তাই না মিসেস চৌধুরী?'

'জ্বি, ছবিটা আমারই। ডা. চৌধুরীর এক বোন পো, নাম বললে হয়তো চিনবেন, কাওসার আহমদ, সে-ই আমার ছবিটা এঁকেছিল।'

'ছবিটা কতো বছর আগের?'

'অন্ততঃ দশ বছর আগের।'

রাবেয়া সৈয়দ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আর কেন যেন চোখ-মুখ শুকিয়ে আসছিল তাঁর।

শহীদ বললো, 'ছবিটা ভারি সুন্দর আঁকা হয়েছে। কিছু যদি মনে না করেন তাহলে এই অয়েল-পেন্টিংটার একটা ফটো তুলে নিই।'

'না, এতে মনে করার কি আছে...'

অস্ফুট গলায় বলেন রাবেয়া সৈয়দ। কামাল অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো দেখতে দেখতে রাবেয়া সৈয়দের চোখ-মুখ হতাশা আর ক্ষোভের ছায়ায় ভরে গেছে।

'আমার হাতে যে ক্যামেরাটা দেখছেন, এর নাম M3 লাইকা। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ক্যামেরার মধ্যে এটা একটা। আপনার অয়েল-পেন্টিং-এর প্রতিটি রেখা এই

ক্যামেরায় উঠে আসবে।'

শহীদ ক্যামেরাটা হাতে নিতে নিতে বললো। কেন যেন একটু হাসলো। বললো, 'পাশের এই অয়েল-পেন্টিংটা নিশ্চয়ই আপনার বাবার?'

'জ্বি। কি করে বুঝলেন আপনি?'

'আপনার বাবার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে আপনার চেহারার। অবশ্য বংশগত ব্যাপারে এটা খুবই স্বাভাবিক। একই বংশের লোকদের চেহারায় কোনো না কোনো দিক দিয়ে মিল থাকেই। কি বলেন?

ফ্ল্যাশ-বাল্‌বের আলোটা জ্বলে ওঠে মুহূর্তে। শহীদ ছবি তুলে নেয়। রাবেয়া সৈয়দের মুখ থমথম করছে। কেউ কোনো কথা বলে না। চাকর এসে চা দিয়ে যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে শহীদ বলে, 'চমৎকার চা। যেমন সুন্দর রং তেমনি গন্ধ।'

রাবেয়া সৈয়দ কোনো জবাব দিলেন না।

শহীদ বললো, 'খুব একটা odd সময়ে এসে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিসেস চৌধুরী। এইবার একটা সাংসারিক ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

'আমি শুনেছি আপনি একটা পুরানো জীপ গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কিনতে চান। আমি এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ধন্যবাদ। সাহায্যের কোনো প্রয়োজন হবে না। একটা পুরানো জীপ গাড়ি অবশ্য আমার আছে। কিন্তু সেটা একেবারেই পুরানো, অচল। ওটা বিক্রি করার কথা কখনো ভাবিনি। বিক্রি করার ইচ্ছেও নেই।'

'তাহলে তো কথাই নেই।'

শহীদ চুপ করে যায়। রাবেয়া সৈয়দ হঠাৎ বলেন, 'আপনি ক'দ্দিন মানিকপুরে আছেন?'

'সেটা নির্ভর করে আপনার উপর।'

রাবেয়া সৈয়দ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, 'মানে?'

'মানেটা খুব সহজ মিসেস চৌধুরী। সেটা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা এখন উঠছি। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একদিন আমার এখানে, মানে হোটেল তাজে আসছেন?'

'অসম্ভব। চুলোয় যাক আপনার শয়তানী। আমি কখনো যাবো না আপনার ওখানে।'

'সে যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছে। তবে আমি আপনার জন্যে ঠিক অপেক্ষা করবো।'

শহীদ উঠে দাঁড়ায়। দেয়ালে টাঙানো রাবেয়া সৈয়দ ও তার বাবার অয়েল-টেন্টিংটার দিকে আর একবার চোখ তুলে তাকায়। তারপর আদাব জানিয়ে বের হয়ে আসে রাবেয়া সৈয়দের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম থেকে।

পথে নেমে কামাল বলে, 'এবার?'

শহীদ হাসে। বলে, 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি কামাল। আজ দুপুর বেলা মর্জিনা বানুর বাড়িতে আমাদের দু'জনের দাওয়াত।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ। শাহেলি মেয়েটা আচার ব্যবহারে এমন ভদ্র যে রবিউল্লাহর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে না থাকলে তোর জন্যে তাকে মনোনীত করতাম।'

'চুপ কর তো শহীদ। আসলে মতলবটা খুলে বল।'

'মতলব কিছুই না। শাহেলিকে নিজেই যেচে বলেছিলাম তোমাদের বাড়িতে আজ দুপুরবেলা চাট্টে ডাল-ভাত খাবো। তো মেয়েটা হেসে ফেললো। বললো ঠিক আছে আসবেন। খেতে হবে কিন্তু ডাল-ভাতই।'

কামাল শহীদের দিকে তাকিয়ে কি যেন অনুসন্ধান করে। যে শহীদ তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সে শহীদ মানিকপুর হত্যা রহস্য ভেদ করতে এসে কেমন যেন বদলে গেছে। তার চলাফেরা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মানিকপুরে দীর্ঘদিন বুরুজ মিঞার ছদ্মবেশে থাকতে থাকতে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

শহীদ হাসে। 'কি দেখছিস অমন করে?'

'তোকে দেখছি। তুই বদলে গেছিস দোস্ত।'

শহীদ বললো, 'ভুল বললি কামাল। মানুষ কখনো বদলায় না। কুয়াশা বদলাবে না, না আমিও না, শাহেলিও না।'

'মানে?'

'মানেটা পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই। হাসান মওলা যে রাতে মারা যায় সে রাতে প্রায় একই উদ্দেশ্যে দু'জন মানিকপুরে এসেছিল। তার মধ্যে একজন তুই।'

'তাহলে আর একজন কে?'

'মেজর বদরুদ্দিন। একই গাড়িতে করে তোরা মানিকপুর এসেছিলি। তুই বুরুজ মিঞার সন্ধানে গেলি, মেজর বদরুদ্দিন গেল ষ্টেশনের উত্তর দিকে কামিনী গাছের নিচে। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বোধহয় অপেক্ষা করলো একজনের জন্যে। যে কোনো কারণেই হোক সেই লোকটা আসতে পারেনি। তখন মেজর বদরুদ্দিন নিজেই হোটেল তাজে চলে যায়। মেজর বদরুদ্দিন অত্যন্ত চতুর লোক। হোটেলে গিয়ে

যখন শুনলেন হাসান মওলা আর নেই, মারা গেছে, তখন তিনি সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন।'

'মেজর বদরুদ্দিনের এ ব্যাপারে কি স্বার্থ থাকতে পারে?'

'সেটাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষ সিদ্ধান্তে এখনো এসে পৌঁছইনি। তবে যদ্দুর মনে হয় আলি নকিবের লক্ষ লক্ষ টাকাই এসব রহস্যের পিছনে কাজ করছে। অবশ্য শাহেলির কথা আলাদা...'

'মানে?'

'মানে যদ্দুর মনে হয় একমাত্র শাহেলির সঙ্গেই চৌধুরী আলী নকীবের টাকার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'মানিকপুর হত্যা রহস্যের পেছনে তাহলে সবটাই রূপোর ঝলক!'

শহীদ বললো, 'বলা শক্ত। আরো কিছুদিন যাক। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নতুন কিছু বলতে পারবো।'

'আমার কিন্তু ধারণা ব্যাপারটা একেবারেই সাদামাটা।'

কামাল বললো, 'ঘটনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট-ই বোঝা যায় মাহমুদই খুন করেছে হাসান মওলাকে।'

চোখ নাচিয়ে কৌতুকের স্বরে শহীদ বলে, 'ভালো! তাহলে চৌধুরী আলী নকীবকে কে খুন করেছে?'

'কুয়াশা। হয়তো আলী নকীবের টাকার উপর লোভ পড়েছিল কুয়াশার...'

শহীদ গম্ভীর হয়ে পড়ে। বলে, 'কিন্তু টাকার জন্যে খুন করা কুয়াশার ধর্ম নয়। এই ব্যাপারটাই গোলমেলে লাগছে। যাকগে...দেখা যাক কি দাঁড়ায় ব্যাপারটা।'

শহীদ ম্লান হাসলো। সামনে মর্জিনা বানুর বাড়ি। বাড়ির সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল শাহেলি।

বোধহয় শহীদের জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

নয়

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় পাতা চেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো শহীদ ও কামাল। মর্জিনা বানু ইনিয়ে বিনিয়ে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলতে লাগলেন। সেই সঙ্গে বড় কর্তা চৌধুরী আলী নকীব বেঁচে থাকাকালীন মানিকপুরে চৌধুরীদের কি শান-শওকত আর ইজ্জত ছিলো তারও জারী গাইলেন।

শহীদ রীতিমত মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। এক সময় সে বলে উঠলো, 'সুলতানা পারভিনই তাহলে আপনাদের সব দুর্দশার মূল কারণ, কি বলেন?'

'সে আর বলতে বাবা! রাক্ষুসী মানিকপুরে এসে মানিকপুরের চৌধুরীদের সাজানো সংসার যেন তছনছ করে দিলো।'

'আঃ আম্মা, কি যা-তা বকছো...'

শাহেলি বিরক্ত হয়ে বাধা দেয়। বলে, 'এসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ।'

মর্জিনা বানু বিড়বিড় করেন। বলেন, 'লাভ-লোকসানের তুই কি বুঝবি শাহেলি! তোর বয়স কম। রক্ত তাজা। ঐ রাক্ষুসী আমাদের কি সব সর্বনাশ করেছে তা তুই বুঝবি না মা!'

শাহেলি আর কথা বাড়ায় না। কামাল লক্ষ্য করে সুলতানা পারভিনের কথায় মর্জিনা বানুর চোখ দুটি যেন হিংস্র বাঘিনীর মতো জ্বলে উঠলো।

শহীদ বললো, 'চৌধুরী আলী নকীবের খুনের ব্যাপারে আপনার কাকে সন্দেহ হয় মিসেস চৌধুরী।'

মর্জিনা বানু বলেন, 'কাকে আবার? মাহমুদকে। ওটা একটা দাগী ডাকাত বাবা। ওর চোখ দুটি দেখে বুঝতে পারো না ও একটা খুনী?'

শহীদ আর কথা বাড়ায় না। চৌধুরী পরিবারের সবাই সুলতানা পারভিন আর তার বড় ভাই মাহমুদের উপর দারুণ খেপে আছে। অবশ্য খেপে যাওয়া স্বাভাবিক। সুলতানাকে বিয়ে করে চৌধুরী আলী নকীব সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলেন। বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি উইল করে দিয়েছেন সুলতানা পারভিনের নামে। এই ক্ষতি চৌধুরীদের পক্ষে দুর্বহ। সে কিছুক্ষণ এটা ওটা নিয়ে কথা বললো। তারপর উঠে পড়লো।

'এবারে আমরা উঠি মিসেস চৌধুরী। অনেক দিন পরে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ রইলো।'

'তাহলেই দেখুন,'

শাহেলি হাসলো, 'ডাল-ভাতই খেতে চেয়েছিলেন, ডাল-ভাতের কি গুণ।'

'এবার তো ডাল-ভাতই খেয়ে গেলাম, আর ক'দিন পর পোলাও কোর্মা খেতে আসবো।'

কামাল বেশ গম্ভীর চালে বলে, 'তারিখটা কিন্তু জানাতে ভুলবেন না।'

শাহেলি বুঝলো কামাল তার আসন্ন বিয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একটু লজ্জিত হেসে চুপ করে রইলো।

হোটেলে ফিরে এলো শহীদ ও কামাল। ম্যানেজার আইনুল হক শহীদের নির্দেশ

মতো কামালের ঘরেই আর একখানা খাট ফেলে শহীদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। ঘরে ঢুকেই প্রথমে কামাল জুতো জোড়া পা থেকে একরকম খামচিয়ে নামালো। তারপর নিজের বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে পড়লো। বললো, 'চুলোয় যাক হাসান মওলা আর রহস্য। **Now I am the king of my sweet bed.** শহীদ, আমি একটু চোখ বুজলাম।'

শহীদ কোনো জবাব দিলো না। ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে হাত-বাক্সটা খুলেছিল। হাত-বাক্সের ভেতরটা ভালরকম পরখ করে একটা গভীর আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে। সে দেখলো হাত-বাক্সটার পাশেই টেবিলের উপর কয়েকখানা পাঁচ টাকা আর একটাকার নোট যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি আছে। একটা পয়সাও খোয়া যায়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো শহীদ। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানে।

তারপর সে কামালের দিকে তাকায়। কামালের তখন নাক ঢাকছে। একটু হাসলো শহীদ। কামালের স্বভাবটাই অমনি আয়েশী ধরনের। আগের তুলনায় এখন আরাম আয়েশ অনেক কমে এসেছে কামালের, তবে ভরপেট খাওয়ার পর নরম বিছানায় দিবা নিদ্রার অভ্যেসটা কামাল এখনো ছাড়তে পারেনি।

কামালকে না জাগিয়ে শহীদ তার নোটবুকে প্রয়োজনীয় দু'একটা কথা টুকে নিচ্ছিলো, এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলো। শহীদ লেখা বন্ধ করে ছোটো নোট খাতাটা পকেটে পুরলো। তারপর গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

বাইরে ভগ্নদূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইনুল হক। বললো, 'অসময়ে ডিসটার্ব করতে এলাম স্যার।'

'বলুন কি ব্যাপার?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার স্যার!' মেজর সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শহীদ একটুও অবাক হলো না। বললো, 'কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'লাঞ্চের আগে থেকে স্যার। তার ঘরের পিছনের দরজা খোলা। আমি এতক্ষণ রিসেপশানে ব্যস্ত ছিলাম। লাঞ্চের সময় খাবার দিতে গিয়ে জানা গেল মেজর সাহেব নেই।'

শহীদ হাসলো, 'দিনে দুপুরে মানুষ ডাকাতি? কি আর করবেন? থানায় একটা রিপোর্ট দিয়ে রাখুন।'

'রাখবো স্যার। থানায় যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আগে আপনাদের পরামর্শ নিই তারপর যা করতে বলেন তাই করবো। স্যার, আর একটা খবর। রিসেপশানে মাহমুদ সাহেব আপনার জন্যে বসে আছেন।'

'বসতে বলুন, আমি আসছি।'

আইনুল হক চলে যায়। শহীদ পরনের কাপড় ছেড়ে এক প্রস্থ নতুন কাপড় পরে নেয়। মানিকপুরের সব ঘটনাই এখন রহস্যের বৃত্তে একে একে দেখা দিচ্ছে। মেজর বদরুদ্দিন দিনে দুপুরে নিখোঁজ হলো, আর সেই খবর দিয়ে গেল কিনা ম্যানেজার আইনুল হক! লোকটা হোটেলের চাকরি করছে বটে কিন্তু চালকের হাঁড়ি। খবরটা দিতে এসে ভাব দেখালো যেন এই ব্যাপারে কিছুই সে জানতো না!

শহীদ মনে মনে হাসলো। সব অবস্থায়ই মানুষ একটা বন্ধন স্বীকার করে নেয়। কোথাকার কে এক বিদেশী আইনুল হক, মানিকপুরে এসে সে পর্যন্ত আবেগের বন্ধনে আটকা পড়লো। জড়িয়ে পড়লো মানিকপুর হত্যারহস্যের কেন্দ্রীয় ঘটনায়।

হাত ঘড়িতে সময় দেখলো। চারটে বাজে। একটা কাগজে লিখলো, 'কামাল, তুই ঘুমোচ্ছিস দেখে একাই বেরোলাম। মানিকপুর চষে বেড়াবো যতোটা সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্ভব। তুই সাড়ে সাতটায় থানায় আসবি। সাড়ে সাতটার মধ্যে আমি থানায় ফিরে আসবো। ইতি—শহীদ।'

কাগজটা সে কামালের টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে তার প্রিয় কোল্ট গভর্নমেন্ট অটোমেটিক ·455 ক্যালিবার পিস্তলটা নিতে সে ভুললো না।

রিসেপশানে এসে দেখলো মাহমুদ অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। তার চোখ—মুখ রাগে লাল। শহীদকে দেখে পায়চারি থামিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। বিনা ভূমিকায় বলে, 'আপনার কাছে এসেছি মি. শহীদ, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

শহীদ বললো, 'বলুন কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

'আমার ছোটো বোন মিসেস সুলতানা পারভিন চৌধুরী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনতিবিলম্বে তার ভালো চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে নিয়ে আমি আপাততঃ ঢাকা যেতে চাই। দরকার হলে ঢাকা থেকে অন্যত্র।'

'বেশ তো যান না। আপনাদের বাধা দিচ্ছে কে?'

'বাধা দিচ্ছে কে? তা বটে। বলেছেন ভালো, বাধা দিচ্ছে কে। বাইরে থেকে বলা সহজ বটে যে আমাদের কেউ বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ধরুন এই মুহূর্তে আমরা যদি মানিকপুর ত্যাগ করি তাহলে হাসান মওলার খুনের ব্যাপারে সব সন্দেহই কি আমাদের উপর গিয়ে পড়বে না?'

শহীদ বললো, 'সে সন্দেহ মানিকপুর থাকলেও আপনাদের ওপর পড়তে পারে। এবং সম্ভবতঃ পড়েছেও। কিন্তু লোকের সন্দেহের এতো পরোয়া কেন আপনার মাহমুদ সাহেব?'

'সে আপনি বুঝবেন না। গরীব ছিলাম, ডাকাতি করে বেড়াতাম আফ্রিকায়, সেই বোধহয় ছিলো ভালো। লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে সুখ গেছে, শান্তি গেছে, স্বস্তিটুকু পর্যন্ত নেই। মানিকপুরের ঐ সব mean minded চৌধুরীরা আর আপনাদের ঐ বোকার ধাড়ী পুলিসগুলো মিলে জীবন একেবারে বিষময় করে তুলেছে।'

'জীবন আবার সুখময় করে তুলুন না। আপনাকে বাধা দিচ্ছে কে?'

'আবার বলছেন বাধা দিচ্ছে কে? ধরুন যদি বলি বাধা দিচ্ছে আপনাদের ঐ বুদ্ধির ঢেঁকি পুলিসের দারোগা, বাধা দিচ্ছে ডা. চৌধুরী...'

'ডা. চৌধুরী?'

চকিত হয় শহীদ। বলে, 'তিনি কিভাবে বাধা দিচ্ছেন?'

'কিছু না। তিনি আমার বোন সুলতানার চিকিৎসক হিসেবে আছেন কিছুদিন ধরে। প্রথম দিকে সুলতানার সর্দি মতো হয়েছিল, তা ধারে কাছে তেমন কেউ ছিলো না বলে ডাক্তার চৌধুরীকে কল্ দেয়া হয়। তিনি চিকিৎসার ভার নেয়ার পর সামান্য সর্দিটাই বেড়ে গিয়ে এমন স্টেজে পৌঁছেছে যে এখন সুলতানার অসুখটা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সুলতানাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবার কথা সেদিন বললাম ডা. চৌধুরীকে। ডা. চৌধুরী সরাসরি কি মন্তব্য করলেন জানেন? বললেন রোগী এখন তাঁর হেফাজতে আছে। তার শক্তিতে যখন কুলোবে না তখন তিনি নিজেই চিকিৎসার জন্যে সুলতানাকে অন্যত্র পাঠাবার উপদেশ দেবেন।'

'অর্থাৎ ডা. চৌধুরী আপনার বোন মিসেস চৌধুরীকে অন্যত্র পাঠাবার অনুমতি দেননি?'

'না দেননি। এদিকে সুলতানার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাইরে থেকে ঠিক হয়তো বোঝা যাবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে...'

'তা বেশ, আপনার অবস্থা বুঝলাম। এখন আপনি আমার কাছে কোন্ ধরনের সাহায্য চান?'

'ডা. চৌধুরীকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। ওঁর কথা বাদ দিন। আমি শুধু চাই পুলিসের অনুমতি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন মি. শহীদ।'

'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন মাহমুদ সাহেব। আমি পুলিসের লোক নই। অনুমতি দেওয়ারও মালিক নই। পুলিসকে যতখানি influence করতে পারি তা আপনার কাজে আসবে না। আপনি বরং ডা. চৌধুরীর চিকিৎসার উপরেই আপনার বোনকে রাখুন।'

'আপনি বলছেন মি. শহীদ?'

শহীদ একটু হেসে বললো, 'মনে হচ্ছে আমার কথার খুব মূল্য দেবেন আপনি?'

'Absolutely. বিশ্বেস করুন, আপনার একটা কথার দাম আমার কাছে অনেক।'

'বটে।'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। আচ্ছা সুলতানাকে নিয়ে চিকিৎকার জন্যে অনত্র যাওয়া এখনকার মতো তাহলে স্থগিত রাখলাম মি. শহীদ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে স্পষ্টই বলে যাই, I do'nt belive Chowdhuries of manikpur—মানিকপুরের চৌধুরীদের আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। ডা. চৌধুরীকে তো নয়-ই। ডা. চৌধুরী আর তার স্ত্রী রাবেয়া সৈয়দ শয়তানের ভিতর ধাড়ী শয়তান, পাজীর ভিতর বড় পাজী। আচ্ছা আসি তাহলে…'

'আসুন।'

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় মাহমুদ। বলে, 'এ ব্যাপারে আপনার কাছেই কেন এসেছিলাম জানেন?'

'না।'

মাহমুদ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'কারণটা আমিও জানি না। বোধহয় মনে হয়েছিল যে আপনি আর দশটা লোক থেকে একটু পৃথক। আপনি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো বুঝবেন। তাই এসেছিলাম। আচ্ছা, আসি এখন।'

মাহমুদ চলে যায়। বাইরে একটা মিলিটারী ট্রায়াম্প মোটর সাইকেলের বিকট গর্জন শোনা যায়। মোটর সাইকেলটা রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকে পাতাবাহার রোড ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় রাস্তার বাঁকে।

মাহমুদ চলে যাবার পর ঘরে ঢুকলো আইনুল হক। ভীতসন্ত্রস্ত চেহারা। শহীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মাহমুদ সাহেব চলে গেছেন স্যার?'

মৃদু হেসে শহীদ বলে, 'ঐ লোকটাকে আপনারা সবাই খুব ভয় করেন, তাই না হক সাহেব?'

'করি স্যার, মিথ্যে বলবো না, করি। এই মাহমুদ সাহেব ছ'সাত মাস হয়েছে মানিকপুরে এসেছে, এরই মধ্যে চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে স্যার। লোকটা একেবারে যাকে বলে…'

বলেই আইনুল হক থেমে যায়। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'থাক, স্যার বলবো না। দেয়ালেরও কান আছে। আমরা হলাম গরীব ছাপোষা লোক। পেটের দায়ে বিদেশ বিভুঁই-এ চাকরি করতে এসে শেষে কি প্রাণটা দেবো?'

শহীদ কোনো কথা বলে না। রিসেপশান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। ছোটো কাঁকর ঢালা একটা পথ বাগানের ভিতর দিয়ে গেট পর্যন্ত গেছে। বাঁ'দিকে শুরু হয়েছে

প্রকাণ্ড রাজা সাহেবের মাঠ। ঢালু মাঠের দিগন্তে দেখা যাচ্ছে পীরগঞ্জের টিলা। গেটের ডান পাশে পাতাবাহার রোডের শুরু। রাস্তাটা থানা, হাসপাতাল, শাল মহুয়ার অরণ্য পার হয়ে চলে গেছে চৌধুরী কলোনীর দিকে। কলোনী থেকে রাস্তাটা স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তার পাশেই পড়েছে মানিকপুরের বিখ্যাত চৌধুরীদের বাড়িগুলো। প্রথমে পড়ে চৌধুরী রশিদের বাড়ি। তারপর ডা. চৌধুরীর বাড়ি, তারপর মর্জিনা বানুর বাড়ি। মর্জিনা বানুর খুব নিকটেই রয়েছে চৌধুরী আলী নকীবের চৌধুরী কুটীর। রবিউল্লাহর বাড়ি পড়েছে সর্বদক্ষিণে।

শহীদ পাতাবাহার রোড থেকে নেমে একটা সরু গলির পথ ধরলো। দু'পাশে কাঠের ও টিনের বাড়ি, শাল, কড়ুই ও বদ্দিরাজ গাছ। মাঝে মাঝে দোকানপাট। রাস্তা ভর্তি লাল ধুলো উড়িয়ে দু'একটা রিক্শা বা গরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে। কিছুদূর যেতেই বাঁয়ে পড়লো হাসপাতাল। হাসপাতাল পার হয়ে পড়লো একটা ছোট ফাঁকা মাঠ। চারপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। মাঠের ওপারে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে একটা পাকা দালানের কিয়দংশ নজরে পড়লো। আসলে শহীদ হোটেল তাজ থেকে রবিউল্লাহর ফার্মের ভিতরকার সংক্ষিপ্ততম রাস্তাটা কি হতে পারে জানার জন্যে বেরিয়েছিল। হঠাৎ মাঠের ওপারে চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা নতুন ঝকঝকে মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। শহীদ গাড়িটা চিনতে পারলো। মাহমুদের গাড়ি। সে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দালানটার দিকে।

দালানটা দেখে চিনলো শহীদ। সালু কাপড় দিয়ে ঘেরাও করা পাকা কবর দেখা যায় উঠানে। পাকা স্তম্ভের উপর অনেকগুলো লাল নিশান উড়ছে। এটা পীরের দরগা। পীরের দরগায় মাহমুদ কি করতে এসেছে ভাবছে শহীদ ঠিক এসময় দরগার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সুলতানা পারভিন।

শহীদকে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

সঙ্গের ড্রাইভার সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, 'কি হয়েছে মাঈজি?'

সুলতানা পারভিন কোনো জবাব দিলো না। সম্মোহিতের মতো সে এগিয়ে গেল শহীদের দিকে। ভয়ে তার চোখ কাঁপছে। ঠোঁট নীল। ফিসফিস করে বললো, 'আমি হজরত পীর বাবাজীর দোয়া পেয়ে গেছি। আর আমাকে কিছু করতে পারবে না।

শহীদ মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলো। স্থিরভাবে বললো, 'তার চেয়ে সব কথা আমাকে আপনি খুলে বলুন মিসেস চৌধুরী।'

'বোধহয় সেই ভালো হয়,'

হঠাৎ সুলতানা পারভিনকে দারুণ ক্লান্ত মনে হলো। বললো, 'আমি আর কিছুতেই পারছি না। সব কথা আমার বুকে চেপে আছে। আমি এসব থেকে মুক্তি পেতে চাই।

শুনবেন আপনি আমার কথাগুলো?'

শহীদ বললো, 'আপনি যদি বলেন নিশ্চয়ই শুনবো।'

'হ্যাঁ বলবো। আপনাকেই বলবো। আপনি কাল আমার ওখানে আসুন। কিন্তু…'

'বলুন…'

দু'হাতে মুখ ঢাকলো সুলতানা পারভিন। ফুঁপিয়ে উঠলো। বললো, 'কিন্তু সব কথা শোনার পর আপনারা যদি আমাকে জেলে পাঠান? যদি শাস্তি দেন?'

'জেল থেকে বাঁচার ঐ একটাই উপায় এখনো খোলা আছে মিসেস চৌধুরী। সব স্বীকার করলে আপনাকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে। নতুবা সব ব্যাপার যখনই হোক আমরা জানবোই। তখন আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

ড্রাইভার নিবিষ্ট মনে কি যেন শুনছিল। সে এবারে তাড়া দিয়ে বলে, 'গাড়িতে গিয়ে বসুন মাঈজি। সাঁঝ হয়ে আসছে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সুলতানা পারভিন।

শহীদ বললো, 'কাল ন'টার ভিতর আপনার ওখানে আমি যাবো মিসেস চৌধুরী।'

'আসুন।'

ভাঙা গলায় বললো সুলতানা পারভিন। আস্তে আস্তে গাড়িতে গিয়ে বসলো। গাড়ি গর্জন তুলে স্টার্ট নিলো। মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল মানিকপুর। শহীদ এগিয়ে চললো সামনে। কিছুদূর গিয়ে পড়লো একটা বাঁশবন। বাতাস হিস্ হিস্ শব্দ তুলছে বাঁশবনের পাতায় পাতায়। কি একটা রহস্য যেন থম্থম্ করছে চারদিকে। শহীদ বুঝলো মানিকপুরের বসতি এখানেই শেষ হয়ে গেছে। বাঁশবন পেরোতেই পড়লো মাঠ। রবিউল্লাহর ফার্ম। মাঠের পুবধারে রবিউল্লাহর খামার-বাড়িতে আলো জ্বলছে। শহীদ অনুমান করলো হোটেল তাজ থেকে হাঁটা পথে খামার বাড়ি পৌঁছতে পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগবে।

খামার-বাড়ির বাইরে উঠোনে পা দিয়েই ঘরের ভিতর দু'জন মানুষের গলার স্বর শুনলো শহীদ। একজনকে সে চিনলো। রবিউল্লাহ। রবিউল্লাহ্ বলছিল, 'তোমাদের অতো চিন্তা ভাবনার দরকার কি বাপু? কাজ ধরো গে তোমরা…আমি করবো। তোমরা পারো সাহায্য করো, না পারো…'

আর একজন নিচু গলায় অনেকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললো, 'আগে তো ভয় পাই নাই মামু। কিন্তুক এখন…'

'চুপ করো, কথা বলো না…যতো সব উজবুক!'

রবিউল্লাহ্ ধমক দিলো। ব্যাপারটা কদ্দুর গড়ায় শোনার জন্যে উদগ্রীব ছিলো

শহীদ। আবদুল তখন আখ খেত থেকে খামার বাড়িতে ফিরছিল।

'কেডা গো, হ্যা?'

আবদুল চেঁচিয়ে উঠে, 'ঐহানে খাড়ায়ে আছে কেডা?'

মুহূর্তেই ঘরের ভিতরকার কথাবার্তা থেমে যায়। কে একজন যেন চকিতে সরে গেল পিছনে।

আর লুকিয়ে থাকার অর্থ হয় না। শহীদ বললো, 'আমার নাম শহীদ খান, রবিউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এসেছি।'

মুহূর্তেই খুলে যায় ঘরের দরজা। এক ঝলক আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইরের অন্ধকারে। রবিউল্লাহ বেরিয়ে এসে বলে, 'মি. শহীদ? কি আশ্চর্য, বাইরে কেন? দয়া করে যখন এসেছেন তখন ধরুন গে আপনার বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, ভিতরে আসুন।'

শহীদ ভিতরে ঢুকলো। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে ষণ্ডামার্কা একটা জোয়ান লোক। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারপাশ ঘিরে কয়েকখানা কাঠের চেয়ার। বাঁ'দিকে মস্ত বড় দু'টো খোলা শেল্‌ফ। একই সারিতে একটা আলমারী। ঘরের এক কোণে একটা তক্তপোষ। তক্তপোষের উপর নতুন এক প্রস্থ বিছানা পাতা।

শহীদ বলে, 'ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'না, না…ডিসটার্ব কিসের?'

রবিউল্লাহ অমায়িক হাসলো, 'আমার এই লোকটাকে নিয়ে খুব মুস্কিলে পড়েছি। ভাবছি নতুন একটা ব্যবসায়ে হাত দেবো। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছে সিজন নাকি খুব খারাপ যাচ্ছে এখন। তা যাকগে এসব। অসময়ে গরীবের এই ফার্মে হঠাৎ পদধূলি যে?'

'রাত্রিবেলা নিশ্চয় আপনার ফার্ম দেখতে আসিনি! শহীদ রহস্য করে বলে, এসেছিলাম একজন মানুষের খোঁজে।'

'মানুষের খোঁজে? আমার এখানে? বলেন কি?'

'ঠিকই বলছি। মানুষটা খুব খেল দেখাচ্ছে মানিকপুরে। যাকগে…ঐ লোকটার খোঁজ আমি আগেই পেয়ে গেছি রবিউল্লাহ সাহেব। আপনার এখানে এসেছিলাম just for a strolling. একটু ঘুরতে ফিরতে। তা আপনি বুঝি রাত্রিবেলা এখানেই আজকাল থাকতে শুরু করেছেন রবিউল্লাহ সাহেব? তক্তপোষে নতুন বিছানা পাতা দেখছি।

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায় রবিউল্লাহর মুখ। আমতা আমতা করে বলে, 'ফার্মের হিসাব-পত্র দেখতে দেখতে আজকাল অনেক রাত হয়ে যায়। তাই অনেক

সময় এখানেই চাট্টি খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'তাই!'

শহীদ একটু হাসে। কথা বাড়ায় না। রবিউল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। চায়ের অর্ডার দিয়ে সে রীতিমত আলাপ ফেঁদে বসলো শহীদের সঙ্গে। রবিউল্লাহ ব্যবসা বোঝে ও মানুষ চেনে। শহীদ মনে মনে তার সঙ্গে তুলনা করলো মাহমুদ, ডা. চৌধুরী ও রশিদ সাহেবের। না, রবিউল্লাহর সঙ্গে এদের কারো তুলনা চলতে পারে না। এক হিসাবে রবিউল্লাহ অদ্বিতীয়।

ঘড়ি দেখে উঠলো শহীদ। রবিউল্লাহ প্রায় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো তাকে। রাস্তায় উঠে শহীদ আবার একা। আকাশে লক্ষ তারার দীপালী। আশেপাশে দোকান-পাটের আলো। এখানে ওখানে আলোছায়া।

আশ্চর্য এক সুন্দর অথচ রহস্যময় রাত নেমেছে মানিকপুরে। শহীদ থানায় ফিরলো কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। দেখলো কামাল আগেই ওখানে এসে পৌঁছেছে। মুখোমুখি চেয়ারে বসে গল্প করছে শিকদারের সঙ্গে।

শহীদকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় মি. শিকদার। শহীদ বলে, 'খানিকটা চক্কর মেরে এলাম আপনার এলাকায় মি. শিকদার।'

'আপনি বেরিয়েছেন তা শুনেছি স্যার। আমরা এখানে বসে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

শহীদ একটা চেয়ার টেনে বসে। শিকদারও আসন নেয়। শহীদ বলে, 'মানিকপুর বাসস্ট্যাণ্ড আর রেলওয়ে স্টেশনে আজ রাতেরবেলা ক'জন লোক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে শিকদার সাহেব।'

'রাখবো স্যার।'

'অঙ্কন বিদ্যায় আমি খুব পারদর্শী নই। তবু কাজ চালাবার মতো একটা লোকের চেহারা এঁকে দিচ্ছি...'

শহীদ হাসে, 'এই লোকটার কতগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দিচ্ছি কাগজে। আপনি যাদের পাঠাবেন তাদের এই ছবিটা দেখাবেন। এই লোকটাকে ধরতে হবে। Please mind it, এই লোকটাকে ধরতে পারলেই আমাদের পঁচাত্তর ভাগ কাজ শেষ।'

'লোকটা বুঝি মানিকপুর থেকে আজ রাতে ভাগছে স্যার?'

'ঠিক তাই। দাঁড়ান ছবিটা এঁকে দিচ্ছি...'

দশ

শহীদ, কামাল থানা থেকে যখন ফিরলো তখন রাত ন'টা। রিসেপশানে গম্ভীর মুখে বসেছিল ম্যানেজার আইনুল হক। তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। শহীদ বললো, 'হক সাহেব নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন?'

'কি করে জানলেন স্যার...একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে হক সাহেবের চেহারায়। বলে, 'সন্ধ্যার দিকে বড় বাড়ি থেকে কালু পিয়ন এসেছিল স্যার।'

'বড় বাড়ি মানে চৌধুরী আলী নকীবের বাড়ি।' শহীদ বললো, 'কি ব্যাপার?'

'মাহমুদ সাহেব একটা চিঠি পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে। এই যে স্যার চিঠি।'

একটা সাদা খাম শহীদের দিকে এগিয়ে দেয় হক সাহেব। চাপা গলায় বলে, 'কথায় বলে শয়তানকে নাকি আজরাইলও ভয় পায়। কি না কি আছে চিঠিতে, আমি তো ভয়ে কাবু হয়ে আছি সেই থেকে।'

শহীদ হাসে একটুখানি। কামাল বলে, 'মেজর সাহেবের কোনো খোঁজ মিললো হক সাহেব?'

কপাল দেখায় হক সাহেব, 'না, স্যার। দুর্ভোগ আছে ললাটে, পোয়াতেই হবে। ভাবছি কদ্দিনে এই মানিকপুর ছেড়ে বেরোতে পারবো।'

ঘরে এসে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে শহীদ। সংক্ষিপ্ত চিঠি। মাহমুদ লিখেছেঃ প্রিয় শহীদ সাহেব, কামাল সাহেব...হীন দস্যু কুয়াশার কথা নতুন করে আপনাদের কাছে আশা করি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কুয়াশা আজ আমার বাড়ি লুট করতে আসবে। আমি উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করেছি বটে, নিজেও সবদিক দিয়ে সতর্ক হয়ে আছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিছুতেই ভরসা পাচ্ছি না। কুয়াশা আমাকে সাত দিনের সময় দিয়েছিল। আজ শেষ দিন। আমার বিশ্বাস কুয়াশা আজই তার কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করবে। কুয়াশার কথা আর কাজে অমিল কখনো দেখিনি। আপনাদের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করি। পুলিসের ওপর আমার আস্থা নেই। এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানাইনি। আশা করি এই সংকটে একটা হীন দস্যুর হাত থেকে আমাকে আপনারা রক্ষা করার জন্য দয়া করে এগিয়ে আসবেন।

ইতি বিনীত,
মাহমুদ।

'চোরের ওপর বাটপার লেগেছে।' কামাল হাসে।

শহীদ হাসে না। বলে, 'আমার কিন্তু অবাক লাগছে কুয়াশার কাণ্ডকারখানা

দেখে।'

'কি রকম?'

'কুয়াশাকে আমরা দু'জনেই চিনি। কুয়াশা ছিঁচকে ডাকাত নয়। এভাবে ওয়ার্নিং দিয়ে টাকা লুটের পরিকল্পনাও তার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক। তাহলে ব্যাপারটা কি?'

'এমনও হতে পারে কুয়াশার সঙ্গে মানিকপুর হত্যা রহস্যের কোনো সম্পর্ক নেই।'

কামাল বললো, 'হয়তো মানিকপুরে কুয়াশার অবস্থান একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'না, তা হতে পারে না। মানিকপুরকে কেন্দ্র করে কোনো একটা প্ল্যান কুয়াশার নিশ্চয় ছিলো। তোকে তো বলেছি চৌধুরী আলী নকীব যে রাতে খুন হন সে রাতে কুয়াশাকে আমি নাভানা ক্লাব থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কুয়াশার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সে মানিকপুরের কোথাও আত্মগোপন করে আছে। রাজা সাহেবের মাঠের শেষ মাথায় পীরগঞ্জের টিলার কাছে রোজ রাতে মশালের আলো আর সরোদের বাজনার একটা অর্থ রয়েছে।'

শহীদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কামাল বলে, 'কুয়াশা সত্যি রহস্যময়।' A misguided genius.

শহীদ বলে, 'কিন্তু এই কথার পরেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না কামাল।'

'কি করতে হবে আদেশ করুন গুরুদেব।'

'আপাততঃ ডিনার। তারপর...'

খাবারের নামে অতি উৎসাহী কামাল বাধা দিয়ে বলে, 'আহা, পরের কথা পরে। আগে তো খাই। পরে দেখা যাবে কি করা দরকার। চল...'

পীরগঞ্জের টিলার কাছে একটা আলোছায়া মূর্তি দাঁড়িয়েছিল। এখানে ওখানে ঘন কাঁটামেদি আর বাবলা গাছের ঝোপ, চারদিকে ঝিঁঝি ডাকছে। উপরের আকাশে অজস্র রূপালী তারা জ্বলছে। হাওয়ার গায়ে শীতের চাবুক। লোকটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। হাতের ঘড়ি দেখলো।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো একটা দীর্ঘদেহ আলখেল্লাধারী লোক।

'কে, মান্নান?'

'হুঁ।'

'কাজ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'বেশ। সবদিকে লক্ষ্য রেখো।'

প্রথমোক্ত আবছায়া মূর্তিটা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। একটা ঝোপের কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কি একটা সঙ্কেত শোনার চেষ্টা করলো যেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা যার নাম মান্নান, উল্টোদিকের একটা পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

স্থির কালো ছায়ামূর্তিটা কান পেতে রইলো কিছু একটা শব্দ শোনার জন্য।

একটা ঠুক ঠুক ক্ষীণ শব্দ। কান খাড়া করলো মাহমুদ। শব্দটা বহুদিন সে শুনেছে। শব্দটা কিসের?

সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। চারদিকে দরজা জানালা বন্ধ। উপরের ভেন্টিলেটারের সামান্য আলোবাতাসের পথটাও বন্ধ করে দেয়া আছে। ঘরে শক্তিশালী বিজলি বাতি জ্বল্‌ছে। মাহমুদের হাতের মুঠোয় গুলি ভরা পিস্তল। আজকের প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। অন্যমনস্ক হলে আজ চলবে না। কুয়াশা যদি কথামত আজ আসে তাহলে তার রক্ষা নেই। মাহমুদের হাতে তার নিস্তার নেই।

মাহমুদ পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। সে কি ভয় পেয়েছে? হ্যাঁ, ভয় পেয়েছে বৈ কি। কুয়াশাকে ভালো করেই সে জানে। ফাল্‌তু কথা বলার লোক কুয়াশা নয়, যা বলে তা করবেই।

উঃ, কি প্রচণ্ড লোভ লোকটার। মাহমুদ ক্ষোভে আর আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপলো। কুয়াশা তাকে পথের ভিখিরি করে দিতে চায়। বলিহারী লোকটার সতর্কদৃষ্টি। ব্যাঙ্ক থেকে সে যে টাকা তুলে এনে ঘরের সিন্দুকে রেখেছে তা কুয়াশা জানলো কি করে? লোকটা কি যাদুমন্ত্র জানে? আশ্চর্য!

দু'কোটি টাকা মূল্যের জিনিস ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চায় কুয়াশা, ব্যাপারটা আশ্চর্য বৈ কি। মাহমুদ হাসলো। কুয়াশার লোভ প্রচণ্ড। লোভের খেসারত হয়তো আজই তাকে দিতে হবে। যে টাকা মাহমুদ সংগ্রহ করেছে অতো পরিকল্পনার পর সে টাকা এক বাজিতে লুট করে নিতে চায় কুয়াশা। ভেবেছে, মাহমুদ একটা ভীরুর হদ্দ…টাকা চাইতেই দিয়ে দেবে। হাঃ হাঃ…

মাহমুদ হাসতে লাগলো। একটা আলমারীর তাক থেকে মদের বোতল বার করলো। নির্জলা মদ গলায় ঢেলে দিলো অসঙ্কোচে। বুক জ্বলে উঠলো। রক্তের ভিতর লাগলো আনন্দের উত্তেজনা। এবসার্ড, এবসার্ড। মাহমুদ পায়চারি করতে লাগলো। হাসতে লাগলো। সুলতানাকে এ সময় ডেকে আন্‌লে কি রকম হয়?

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোচ্ছিল মাহমুদ। ঠিক তখন শোনা গেল শব্দটা। দেয়ালের কোথাও টুক্ টুক্ শব্দ। পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে সে ফিরে দাঁড়ায়। সারা ঘর উজ্জ্বল আলোয় প্লাবিত। কেউ নেই। সন্দেহ ব্যাপারটা ভারি জঘন্য। মাহমুদ হাসলো।

আজকাল সে কি দুর্বল হয়ে পড়েছে? না, না…ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আসলে সংসারে বাঁচতে গেলে শুধু দৈহিক বল দিয়ে হয় না। এর সঙ্গে চাই বুদ্ধির প্যাঁচ। চাই কূটনীতি। দৈহিক বলের সঙ্গে কূটনীতি মেশালে একেবারে সোনায় সোহাগা। এই যেমন একটা জাল ফেলেছি মানিকপুরের চৌধুরী আলী নকীবের উপর। শুধু একটা পিস্তলের জোরে কি সব বাগানো যেতো? যেতো না। প্রয়োজন ছিলো বুদ্ধির। প্রয়োজন ছিলো বলেই অনেক সহ্য করেছে মাহমুদ। কুয়াশাকে সহ্য করেছে। সুলতানাকে সহ্য করেছে। সব কিছুর গোড়া হলো প্রয়োজন। যখন যা প্রয়োজন তখন তা করতে হবে, থামলে চলবে না। ভড়কে গেলে চল্‌বে না। স্নেহ, মায়া, মমতা, মনুষ্যত্ব এসবের পরোয়া করলে চলবে না।

দরজার গোড়া থেকে ফিরে এলো মাহমুদ। সুলতানাকে এখন ডাকার দরকার নেই। সুলতানার কাছে যথাসময়ই সে যাবে। আপাততঃ কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কুয়াশা যদি তার কথা মত আসে তাহলে আজ তার রক্ষে নেই।

একটা ভবিষ্যত মনে মনে দেখলো মাহমুদ। খুশি হয়ে উঠলো। এতদিন টাকা ছিলো না। তাই ভোগ করতে পারেনি। এখন টাকা হয়েছে। আর চিন্তা কি? যে জাল ফেলেছি সেটা সাবধানে গুটিয়ে তুলেই সে পাড়ি দেবে বাইরে। আজ দিল্লী, কাল কায়রো, পরশু বাগদাদ, লণ্ডন, প্যারিস। পোশাক, আহার, মেয়েমানুষ—সবই আয়ত্তের ভিতর এসেছে। গুলি মারো কুয়াশাকে। স্নেহ—মমতা, বিবেককে।

মাহমুদ ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। একবার সিন্দুকের কাছে গিয়ে গুছানো ব্যাগটা পরখ করবে বলে ভাবলো। ব্যাগটা বেশ ভারি। এমন জায়গায় ব্যাগটা রাখা হয়েছে যে কেউ বুঝবে না। ভাবলো আজ রাতে সটকে পড়লে কেমন হয়? না, তা হয় না। কিছু কাজ এখনো বাকি আছে। সেটুকু শেষ না করে যাওয়া চলবে না। নাটকের শেষ অংশ এখনো বাকি।

সে পিস্তলটা চোখের সামনে ধরলো, ঠিক এই সময় আবার সেই ক্ষীণ টুক্ টুক্ শব্দটা উঠলো দেয়ালের কোথাও। মাহমুদের কানে সেটা পৌছলো না। মাহমুদ যখন পিস্তলটা দেখছে চোখের সামনে নিয়ে, তখন দেয়াল আলমারী থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো একটা কালো ছায়া। মাহমুদের পিঠে লাগলো একটা শীতল ধাতব স্পর্শ। পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটা স্থির ভরাট গলায় বললো, 'নড়াচড়া করার চেষ্টা করো না মাহমুদ। খুন হয়ে যাবে। পিস্তলটা ফেলে দাও। দিয়েছো? বেশ—এবার ফিরে দাঁড়াও। হ্যাঁ, আমি কুয়াশা।'

মাহমুদ ফিরে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। কুয়াশা বললো, 'বুঝতেই পারছো আমি আমার কথা রক্ষা করেছি। না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। তোমার কোথায়

কি আছে তা আমি জানি। আমি নিজেই তা বের করে নিতে পারবো।'

কুয়াশা হাসলো, 'আমার সম্পর্কে তোমার একটা ভয় ছিলো মাহমুদ। কিন্তু আমার শক্তি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই ছিলো না। ধারণা থাকলে আমার কথা অমান্য করার সাহস তোমার হতো না।'

মাহমুদ বললো, 'কুয়াশা, আমাকে প্রাণে মেরো না। আমার যা আছে সব তোমাকে দিয়ে দেবো!'

কুয়াশা এবারেও হাসলো। বললো, 'তুমি দিয়ে দেবার কে হে বাপু? টাকা হলো আলী নকীবের। দয়া করে সে টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

কুয়াশা থামলো। বললো, 'একটা কথা তোমাকে বলি। আলী নকীবের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের ওপর আমার লোভ ছিলো না বিন্দুমাত্র। আমি যা চেয়েছিলাম সে হলো একটা গুপ্তধনের নকশা। এই নকশাটা আলী নকীব কপাল গুণে পেয়ে গিয়েছিল এক বুড়ো জমিদারের কাছে। এই বাড়িটা আসলে সেই বুড়ো জমিদারেরই বাড়ি। আলী নকীব সেই বুড়োর নায়েব ছিলো। বুড়ো জমিদার হঠাৎ হার্টফেল করে। মারা যাওয়ার সময় এই নকশাটা সে দিয়ে যায় আলী নকীবকে। বুড়ো জমিদার বলে গিয়েছিল গুপ্তধনের টাকা যেন সৎকাজে দান করা হয়! কোম্পানী আমলের এই গুপ্তধন এতকাল লোক চক্ষুর অন্তরালে মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত ছিলো…বুড়ো জমিদার যখন এই নকশা পান তখন তার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই অর্থ মানব কল্যাণের জন্য ব্যয় করে যেতে পারেননি। আলী নকীব বুড়োকে কথা দিয়েছিল। বুঝতেই পারছো সে কথা রক্ষা করা হয়নি। আলী নকীব সেই গুপ্তধনের কিছু নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই বাড়ির মাটির নিচে এতো কোটি কোটি টাকা মূল্যের মোহর পোঁতা ছিলো যে সে টাকা সম্পূর্ণ ব্যবহার করা আলী নকীবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বলতে গেলে গুপ্তধন প্রায় সবটাই অটুট ছিলো।

কুয়াশা থামলো। বললো, 'আমি আলী নকীরেব পিছু নিয়েছিলাম এই নকশাটার জন্যেই। নকশাটা, আমি জানতাম আলী নকীবের বুকের কাছে সর্বদা বাঁধা থাকে। যে রাতে আলী নকীব নাভানা ক্লাবে যায় সে রাতে আমিই আলো নিভিয়ে দিয়ে নকশাটা বের করে এনেছিলাম। কিন্তু আলী নকীবকে কে খুন করেছিল?'

'তুমি…'

মাহমুদ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। বলে, 'তুমিই চৌধুরী আলী নকীবকে খুন করেছিলে।'

কুয়াশা শান্ত কণ্ঠে বললো, 'খুনের রহস্য যথাসময়ই তুমি জানবে মাহমুদ। গুপ্তধনের কথাটা বলি। আমি এই সাতদিনে এই বাড়ির সব সম্পদ সরিয়ে নিয়েছি

আস্তে আস্তে। মোট কতো টাকা হবে জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করছে? সঠিক পরিমাণ এখনো বলতে পারবো না, তবে পঞ্চাশ কোটির কম হবে না।'

'পঞ্চাশ কোটি!'

মাহমুদ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

'হ্যাঁ। সুখের বিষয় সব আমি সরিয়ে ফেলতে পেরেছি। আলী নকীবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো। মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবো এই টাকা। আমি মানুষকে অমর করতে চাই মাহমুদ। আমার আরো বহু টাকার দরকার। ভয় নেই, তোমার সামান্য দু'কোটি টাকাও আমি ফেলে যাবো না।'

কুয়াশা পিস্তলের নিশানা ঠিক রেখে পিছু হটলো। সিন্দুকের কাছে গেল। ঠিক এ সময় জানালার কাছে দেখা গেল একটা পিস্তল ধরা হাত। চমকে উঠলো কুয়াশা। চট করে সরে দাঁড়াতেই এক ঝলক অগ্নিবৃষ্টি ছুটে গিয়ে বিঁধলো সামনের দেয়ালে। কুয়াশা পর মুহূর্তে বাঁ'পাশের দেয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেয়ালটা দু'ফাঁক হয়ে গ্রাস করলো কুয়াশাকে।

মাহমুদ বিস্ময়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পর শহীদ আর কামাল ঢুকলো ঘরে। শহীদ উত্তেজনায় তখনো রীতিমত হাঁপাচ্ছে। বললো, 'আর এক মুহূর্ত আগে এসে পৌঁছলেই কুয়াশাকে ধরতে পারতাম। আমারই দুর্ভাগ্য। কুয়াশা এবারও ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'

মাহমুদ বললো, 'আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই শহীদ সাহেব। আপনারা এসে আমাকে রক্ষা করলেন। আমার সর্বনাশের মূল কি জানেন? এই বাড়িটা! এই বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে যে এতো কারসাজি আছে তা কি জানতাম! উঃ, কি ভয়ানক কথা। পঞ্চাশ কোটি টাকা। আই গো ম্যাড মি. শহীদ! পঞ্চাশ কোটি টাকা! মাই গুড্ গড্...'

উন্মাদের মতো হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো মাহমুদ।

এগারো

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ন'টা বেজে যায় শহীদ ও কামালের। ব্রেকফাস্ট সেরে মাত্র তৃতীয় সিগারেটটা ধরিয়েছে, তখন ছুটতে ছুটতে এলো আইনুল হক।

'স্যার...'

'বলুন!'

'সুলতানা পারভিন, মানে মিসেস আলী নকীব চৌধুরী স্যার...'

'কি হয়েছে?'

'খুন, খুন হয়েছে স্যার। চৌধুরী বাড়ির পিয়ন কালু খবর নিয়ে এসেছে এখানে। জলদি চলুন স্যার।'

আইনুল হকের কাঁদতে বাকি আছে। বলে, 'সব ভূতুড়ে কাণ্ড স্যার। কথা নেই বার্তা নেই মার্ডার! ডেঞ্জারাস্ ব্যাপার স্যাপার চলছে…'

দ্রুত কাপড় পরে রিসেপশানে আসে ওরা। কালু ভগ্নদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

কালু কেঁদে ফেলে, 'মেম সাহেব খুন হয়েছেন স্যার। সাহেব পাগলের মতো হয়ে গেছেন। আপনারা চলুন।'

কালুর মুখেই ব্যাপারটা শোনা গেল। সন্ধ্যাবেলা মেম সাহেব গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। রাত ন'টায় তিনি বাড়ি ফিরে সামান্য খেয়ে শুতে যান। রাতের বেলায় কি সব কাণ্ড হলো বাড়িতে…সাহেব এক ফোটা ঘুমোননি। সকাল বেলা ঝি মেম সাহেবকে ডাকতে যায়। সাড়া না পেয়ে সাহেবকে খবর দেয়। সাহেব এসে দরজায় আঘাত করেন। কোনো ফল হয় না। শেষে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা হলো। দেখা গেল মেঝেয় পড়ে আছেন মেম সাহেব। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। হাত–পা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

থানায় একটা খবর দেয়া হলো। দারোগা শমসের শিকদার প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়।

চৌধুরী কুটিরে এসে যখন ওরা উপস্থিত হলো তখন সকাল সাড়ে দশটা। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। ইতিমধ্যেই সুলতানা পারভিনের মৃত্যু সংবাদ কিভাবে যেন রটে গেছে বাইরে। চৌধুরী বাড়ির সবাই এসে হাজির হতে শুরু করলো একে একে। শহীদ ও কামাল গিয়ে দেখলো খবর পেয়ে আগেই ডা. চৌধুরী ও রাবেয়া সৈয়দ হাজির হয়েছেন দোতলার বারান্দায়। যে ঘরে সুলতানা পারভিনের মৃতদেহ পড়েছিল সেটি তার শোবার ঘর। ঘরটা চমৎকার ভাবে সাজানো–গুছানো। মেহগনি খাটের উপর পুরু গদির বিছানা। দেয়ালে ঝালর–কাটা পর্দা। কোণের একটা পাথরের স্ট্যাণ্ডে প্রেমের দেবী ভেনাসের নগ্ন মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুলতানা পারভিন। চোখের কোণ দু'টি সজল। ঠোঁট দু'টিতে তখনো বিষণ্ন বেদনার রেখা অঙ্কিত হয়ে আছে। একটা হাত মাথার দিকে লম্বালম্বিভাবে ছড়ানো।

'She is dead.'

ডা. চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন। শহীদ ও কামালকে দারোগা শমসের শিকদার হল ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি এতক্ষণে ঘরে ঢুকেছেন। তার পাশে পাথরের

মূর্তির মতো নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাবেয়া সৈয়দ।

শহীদ ডা. চৌধুরীকে বললো, 'আপনি কতক্ষণ আগে এসেছেন?'

'আধ ঘন্টাখানেক হবে। প্রথমে ওরা মনে করেছিল সুলতানা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই ভেবে কালু আগে আমাকে খবর দেয়। আমি এসে পরীক্ষা করে বুঝতে পারি আমার আসার আরো আধ ঘন্টা আগে ওর মৃত্যু হয়েছে। আমি সবাইকে কথাটা জানাই। জানিয়ে থানায় খবর দিতে বলি।'

শহীদ ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। নজর পড়ে খাটের শিথান দিককার শেলফের দিকে। শেলফের উপরের তাকে পর পর সাজানো আছে তিন ফাইল ওষুধ ও শিশির ভিতর এক রকমের গুঁড়ো পাউডার। হাত না দিয়ে সাবধানে সে ওষুধ ও পাউডারের শিশি নিরীক্ষণ করে। পাউডারের শিশির কর্কের উপর কিছু গুঁড়ো ছিটিয়ে আছে। পাশেই রাখা আছে একটা শূন্য গ্লাস।

একে একে ঘরে ঢোকে রশিদ সাহেব ও বেগম রশিদ, মর্জিনা বানু, শাহেলি ও রবিউল্লাহ। সবাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথা না বলে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢোকে মাহমুদ। একটা হিংস্র গর্জন ফেটে বেরোয় গলা থেকে, 'দেখলেন তো, শেষ পর্যন্ত সুলতানাকে সরিয়ে দিলো! খুন করলো আমার সরল, নিষ্পাপ বোনটাকে? আমি জানতাম মি. শহীদ, মানিকপুরের চৌধুরীরা যে সুলতানাকে সরিয়ে দেবে তা আমি আগে থেকেই জানতাম...'

আবেগের উত্তেজনায় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে মাহমুদের গলার স্বর, 'সুলতানাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না! এই ভয় আমি আগেই করেছিলাম...'

'আপনি দয়া করে থামুন মাহমুদ সাহেব,'

শহীদ বাধা দেয়, 'এটা যে খুন তা আপনাকে কে বললো? এটা আত্মহত্যা হতে পারে।'

'আত্মহত্যা? অসম্ভব! সুলতানা আত্মহত্যা করতেই পারে না। আমি জানি এ কার কাজ!'

মাহমুদ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায় ডা. চৌধুরীর দিকে। বলে, 'আমি আপনাকে এমনি ছেড়ে দেবো ভাববেন না ডাক্তার। প্রতিশোধ কি করে নিতে হয় তা আমি জানি। আমার হাত থেকে আপনার নিস্তার নেই...'

ভয়ে ফ্যাকাসে দেখায় ডাক্তার চৌধুরীর চোখ-মুখ। শহীদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'I am in danger মি. শহীদ, আমি বিপদগ্রস্ত। দয়া করে আমার security-র ব্যবস্থা করুন! নতুবা that fellow...'

মাহমুদকে দেখিয়ে বললেন ডা. চৌধুরী, 'He is a murderer. দেখেও

চিনতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, খুন আমি অনেক করেছি বৈকি। আর একটা করবো। **One more kill and mind that it's you!'**

মাহমুদ উন্মত্তের মতো অট্টহাস্য করে ওঠে। শহীদের ইঙ্গিতে ডা. চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলা হয় ঘর থেকে। মাহমুদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় সশস্ত্র একজন পুলিসের জমাদার।

মাহমুদ হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে, '**Sultana is dead!** হায় আল্লা, এও আমাকে দেখতে হলো। সুলতানা আমাকে মানিকপুর ছেড়ে চলে যেতে কতবার কাকুতি-মিনতি করেছে...আমি শুনিনি...'

শহীদ মৃদু কণ্ঠে বলে, 'মি. শিকদার, আপনার প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষ করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'আপনি স্যার?'

'আমার যা দেখার দেখেছি।'

শহীদ অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, 'এটা একেবারে যাকে বলে **clear case of suicide.** আত্মহত্যা।'

একটা সূক্ষ্ম হাসি তার ঠোঁটে রেখায়িত হয়েই পরক্ষণে নিভে যায়।

হোটেলে ফিরতে সাড়ে বারোটা বেজে যায়। রিসেপশানে দেখা হয় আইনুল হকের সঙ্গে। চিন্তাকীর্ণ মুখ, তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে দিনে দিনেই। শহীদ ও কামালের খাবার তদারক করতে আসে নিজেই। হোটেলে স্পেশাল যত্ন-আত্যির ব্যবস্থা হয়েছে শহীদ ও কামালের জন্যে। কারণটা বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয় না শহীদের।

ম্যানেজার আইনুল হক বলে, 'খাবার দাবার কেমন হচ্ছে স্যার?'

'খুবই ভালো,' কামাল মন্তব্য করে।

'যত্ন-আত্যির চেষ্টা তো সব সময়ই করি স্যার।' ম্যানেজার হক সাহেব বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ে, 'ভেবেছিলাম যদ্দিন বেঁচে আছি মানিকপুরের হোটেল তাজ ছেড়ে কোথাও যাবো না। এটাকে একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে তৈরি করে যাবো। কিন্তু সবই হলো কপাল স্যার...'

ওদের তখন খাওয়া শেষ হয়েছে। বেয়ারা টেবিল থেকে বাসনপত্র ওঠাচ্ছে। শহীদ বলে, 'কেন, কি হলো হক সাহেব?'

'মানিকপুরে যা শুরু হয়েছে তারপর কেউ এখানে থাকতে সাহস করে স্যার? এই তো মিসেস চৌধুরীর খুনের কথা শুনেই আমাদের পাঁচজন কর্মচারী রেজিগ্‌নেশান সাবমিট করেছে। ওরা আর ভূতুড়ে জায়গায় থাকতে সাহস পাচ্ছে না। ওদের শুধু দোষ

দিয়ে লাভ কি স্যার? আমার নিজের অবস্থাও তো ওদেরই মতো। কোনরকমে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচি স্যার...'

ম্যানেজার হক সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কি সোনার জায়গা ছিলো মানিকপুর আর এই ক'দিনেই কি সব কাণ্ড হয়ে গেল স্যার! এখানে যা খুশি ঘটে যেতে পারে, কিছু বিশ্বাস নেই।'

হক সাহেব চলে যায়। কামাল কেন যেন হাসে। শহীদ খাওয়ার পর প্রথম সিগারেটটা ধরিয়েছে। চুপচাপ সিগারেট টান্‌ছে আর কি যেন ভাবছে।

'কামাল,' শহীদ ডাক দেয়।

'বল,'

'তোর নাটকের অভিজ্ঞতা আছে?'

'একেবারে নেই বলা যায় না। সিরাজউদ্দৌলা নাটকে একবার আমাকে দৌবারিকের পার্ট দেয়ার কথা হয়েছিল। পরে অবশ্য চান্স পাইনি।'

শহীদ হাসে, 'এইরকম আনকোরা নতুন মানুষই আমি চেয়েছিলাম। কামাল, মানিকপুরের এই নাটকের তোর রোল হলো পরিচালকের। আমি স্মারক, প্রম্পটার।'

'মানে?'

'মানে পরে বুঝিয়ে বলছি। এখন একটা নিমন্ত্রণপত্র ড্রাফ্‌ট করে ফেল তো। লিখবি, তুই অর্থাৎ কামাল আহমেদ অমুক দিন বিকেল পাঁচটায় হোটেল তাজের হল ঘরে একটা টি-পার্টিতে অমুকের সহৃদয় উপস্থিতি প্রার্থনা করছিস।'

'টি-পার্টি দেয়ার উদ্দেশ্য?'

'সামাজিকতা করা। আসল উদ্দেশ্যের কথা না বললেও চলবে আশা করি। নিমন্ত্রণ যাদের যাদের দিবি তারা সবাই আমাদের পরিচিত। তারা হলেন মাহমুদ সাহেব, ডা. চৌধুরী, রাবেয়া সৈয়দ, মর্জিনা বানু, শাহেলী, রবিউল্লাহ, বেগম রশিদ, চৌধুরী রশিদ ও শিকদার সাহেব। দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতানা পারভিন এখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে!'

সুলতানা পারভিনের প্রসঙ্গে একটু আগের মর্মন্তুদ ঘটনাটাই ভেসে ওঠে কামালের মানস-চোখে। বেচারী সুলতানা পারভিন রূপ-যৌবন, প্রভূত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে নিদারুণ ভাবে।

কামাল বললো, 'আচ্ছা, সুলতানা পারভিন কি আত্মহত্যা করেছে বলেই তোর ধারণা?'

'নিশ্চয়ই না। সুলতানা পারভিনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। She is murdered!'

'বলিস কি? তখন যে তুই বললি সুলতানা পারভিন আত্মহত্যা করেছে...'

'বলার একটা কারণ ছিলো নিশ্চয়ই। কথাটা একজনকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে বলেছিলাম।'

'সে তোর ধোঁকাবাজিতে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, পড়েছে বলেই টি-পার্টির নাম করে একটা এক অঙ্কের নাটক জমাচ্ছি হোটেল তাজে। নতুবা আজ রাতে তাকে কিছুতেই ছেড়ে দেয়া যেতো না। কই, তুই নিমন্ত্রণপত্র ড্রাফট করেছিস?'

'এই তো করছি। তারিখটা কবের দেবো?'

শহীদ নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'পরে বলবো।'

দু'বন্ধুর মধ্যে বিশেষ আর কোনো কথা হয় না। ঘুম-কাতুরে কামাল কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন চা খেয়ে দু'জনেই গেল চৌধুরী কুটিরে। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে যেন। মাহমুদ এসে অভ্যর্থনা জানায় দোরগোড়ায়। কিন্তু তার অভ্যর্থনায় কোনো প্রাণ নেই। মাহমুদের চোখ দু'টি লাল। মুখে স্থির কাঠিন্য।

শহীদ বলে, 'আজ রাতেরবেলা ঘুমোননি মাহমুদ সাহেব?'

'বুঝতেই পারছেন,' ম্লান হাসে মাহমুদ। তারপর অনেকটা সংযত ভাষায় বলে, 'কাল রাতেরবেলা উত্তেজনাবশতঃ কোনো অন্যায় ব্যবহার করে থাকলে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি মি. শহীদ।'

'অন্যায় ব্যবহার আপনি করেননি মাহমুদ সাহেব। যা করেছেন তা খানিকটা আবেগপ্রবণ হলেও আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিলো না। তা যাক গে, আপনার নেক্সট্ প্রোগ্রাম কি হচ্ছে, মাহমুদ সাহেব?'

'দেখি...'

ম্লান হাসে মাহমুদ। কামাল অবাক হয়েছিল মাহমুদের ব্যবহারে। দুই রাতেই অমন জটিল স্বভাবের খেঁপাটে আর জেদী লোকটা কেমন যেন বদলে গেছে। কিন্তু সে আরো বেশি অবাক হয় শহীদের আচরণে। শহীদ পুরো দু'দিন কাটিয়ে দিলো প্রায় বসে বসেই। দিনের বেলা হয় ঘুরে বেড়ায় নয় হোটেলের ম্যানেজার আইনুল হকের সঙ্গে গল্প করে। এর মধ্যে সে একবার বেগম রশিদের বাড়ি গিয়েছিল কামালকে সাথে নিয়ে।

বেগম রশিদ রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। বলে, 'মানিকপুরের কাণ্ড-কারখানা দেখে শুনে সবাই ভড়কে গেছে কামাল সাহেব। হাসান মণ্ডলা খুন হলো, মেজর সাহেব নিখোঁজ, সুলতানা পারভিনও গেছে, এবারে কার পালা কে জানে?'

মৃদু হেসে শহীদ বলে, 'ভড়কে যাওয়া স্বাভাবিক। মূল ঘটনার সঙ্গে তো

আপনাদেরও সম্পর্ক আছে।'

'কি বললেন? আমাদেরও সম্পর্ক আছে?'

'আপনাদের মানে রশিদ সাহেবের। কি রশিদ সাহেব, সম্পর্ক নেই?'

রশিদ সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'আপনারা যা খুশি বলতে পারেন। আমি ভয় পাই না।'

'ভয় কে-ই বা পেয়েছে? কেউ কেউ ভান করেছে বটে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছু। সবাই আসল ব্যাপার ঠিক বোঝে।'

'মি. শহীদ,' রশিদ সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'আপনারা তো এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন। আসল ব্যাপারটা কি হেঁয়ালী না করে বুঝিয়ে বলতে পারেন?'

'যথাসময়ই তা বলা হবে রশিদ সাহেব, এ ব্যাপারে আপনার ভূমিকাটুকু সুদ্ধ···চিন্তা করবেন না।'

মাহমুদের ওখান থেকে ফেরার পথে কামাল বললো, 'আইনুল হক বা বেগম রশিদের কথাগুলি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না শহীদ। হাসান মওলা ও সুলতানা পারভিনের হত্যারহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে সকলের কাছে।'

'তা বটে,' শহীদ স্বীকার করে। বলে, 'টি-পার্টির আয়োজন ঠিক আছে তোর?'

'বিলকুল ঠিক আছে। নিমন্ত্রণপত্র টাইপ করিয়ে রেখেছি। শুধু সেখানে তারিখটা বসাতে হবে।'

কথা বলতে বলতে রিক্শা হোটেলের গেটে এসে থামে। কামাল গাড়িভাড়া মিটিয়ে দেয়। গেট পার হয়ে বাগানের সুরকি ঢালা পথ দিয়ে যেতে যেতে শহীদ বলেঃ 'আমি যে কারণে নিশ্চেষ্ট হয়ে অপেক্ষা করছিলাম তা মিটে গেছে কামাল। গতকাল সন্ধ্যার দিকে আমি ব্যাঙ্ক আর পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এবং সেই সাথে দু'টো পার্সেল পেয়ে গেছি। তুই কাল বিকেল পাঁচটার দিকে টি-পার্টির আয়োজন কর। নাটকীয় আবেদনটুকু থাকতে থাকতে নাটকটা শেষ হোক।'

'আগামীকাল বিকেল পাঁচটায়?'

'হ্যাঁ।'

রিসেপশানে ঢুকলো ওরা। থমকে দাঁড়ালো দু'জনেই। শহীদ একটু হাসলো। রিসেপশানে অপেক্ষা করছেন রাবেয়া সৈয়দ।

'মি. শহীদ, আপনার সঙ্গে নির্জনে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই।'

'আপনি জানেন মিসেস চৌধুরী আমি এজন্যে বহু আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিলাম।'

পাশের গেস্ট রুমে রাবেয়া সৈয়দকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় শহীদ। কামাল বারান্দা

পার হয়ে নিজের ঘরে আসে। উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত রাজা সাহেবের মাঠ দেখা যায়। বিশাল এই মাঠ ঢালু হয়ে হারিয়ে গেছে দিগন্তজোড়া আকাশের নীলে। দু'একটা সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। বহুদূরে ত্রিভুজের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পীরগঞ্জের টিলা।

বেশ কিছুক্ষণ পর কামালের ডাক আসে। গেস্টরুমে ঢুকে কামাল খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলো। রাবেয়া সৈয়দের কথা বোধহয় এখনও শেষ হয়নি। রাবেয়া সৈয়দ বলছিলেন, 'আপনি কদ্দুর আমাকে বিশ্বাস করলেন জানি না মি. শহীদ কিন্তু দেখুন...'

'এখানে বিশ্বাসের প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন মিসেস চৌধুরী। যা সত্যি তা আপনিও যেমন জানেন আমিও তেমনি জানি। আমার কথা স্পষ্টই আপনাকে বলে দিয়েছি...

মিনতি ঝড়ে পড়লো রাবেয়া সৈয়দের কণ্ঠস্বরে, 'আমাকে বাঁচিয়ে দেবেন এই আশা নিয়েই এসেছিলাম মি. শহীদ। দোহাই আপনার, আর একবার ভেবে দেখুন।'

'তাতে কিছু লাভ নেই মিসেস চৌধুরী। কর্মফলের শাস্তি যেটুকু আপনার পাওনা তা আপনাকে ভোগ করতেই হবে। আমি বাঁচিয়ে দেবার কে? আচ্ছা, মিসেস চৌধুরী, কামাল সাহেব আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

শহীদের ইঙ্গিত কামাল বুঝলো। সে বললো, 'আমার কথা যৎসামান্য। আমরা শিগগিরই মানিকপুর থেকে চলে যাবো। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় হোটেল তাজে সামান্য চায়ের আয়োজন করেছি। আশা করি ডাক্তার চৌধুরী ও আপনি দু'জনেই দয়া করে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসবো।'

পরিহাসের সুরে শহীদ বলে, 'আমাদের ব্যবস্থাপনা প্রায় নিখুঁত বলতে পারেন। মৌখিক দাওয়াত দেয়া হয়েছে, নিমন্ত্রণপত্রও পাঠানো হবে যথাসময়।'

শুষ্ককণ্ঠে রাবেয়া সৈয়দ বলেন, 'ধন্যবাদ। তাহলে উঠি এখন।'

'আসুন। কালই আবার দেখা হচ্ছে আমাদের।' বিদায় নিয়ে চলে যান রাবেয়া সৈয়দ। শহীদ কিছুক্ষণ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্লান হাসে।

'ইনি তাহলে সব স্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থই তাহলে সকল অনর্থের মূল?'

'অর্থ এবং মিথ্যে সম্মানবোধ।'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় শহীদ। কামাল বলে, 'উঠছিস যে? কোথায় যাবি?'

'কামালের বৈঠকে দু'জন মাননীয় অতিথি আসবে বলে কথা দিয়েছিলেন। তাঁদের

টেলিফোনে কন্টাক্ট করতে যাচ্ছি।'

'মাননীয় অতিথি কে?'

'একজন এস. ডি. পি. ও মি. নুরুল আলম পি. এস. পি. আর একজন মি. সিম্পসন।'

'নাটকের অভিনয়ক্ষণ তাহলে প্রায় সমাগত?'

কামাল মৃদু হাসে।

শহীদ বলে, 'হ্যাঁ, মনে রাখিস নাটকের ভূমিকা সারার পালা তোর। বেশ আঁট-ঘাট বেঁধে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করো বন্ধু।'

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। এটা জনসভাও নয় বিচিত্রানুষ্ঠানও নয়। অথচ এই দেখুন সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে কথা বলতে গিয়েই ঘেমে উঠছি। কথা জড়িয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে আসছে বারবার।'

কামাল একটু হাসে। বলে, 'উপায় নেই। হাসান মণ্ডলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে এবং মেজর বদরুদ্দিনের নিখোঁজ ও মিসেস সুলতানা পারভিনের হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে যে রহস্য জটিলতর হয়েছে সেই রহস্য আমাকে খুলে বলতেই হবে।'

মাহমুদ তিক্ত গলায় বলে, 'অথচ এটা ছিলো চায়ের দাওয়াত। ভূতের গল্প জমাবার আসর নয়...'

সাজানো হলঘরে সজ্জিত বেশে সবাই বসে আছে নিস্তব্ধ ভাবে। বাঁ'দিকে বসেছে রবিউল্লাহ, আইনুল হক, শাহেলি ও মর্জিনা বানু। ডান পাশে আছেন ডা. চৌধুরী, রাবেয়া সৈয়দ ও মানিকপুরের বিশিষ্ট উকিল রামপ্রসাদ কুণ্ডু। মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছেন বিশিষ্ট অতিথি মি. নুরুল আলম পি. এস. পি. তারই পাশের চেয়ারে বসেছে মাহমুদ। মাহমুদের পাশে বসেছে বেগম রশিদ ও চৌধুরী রশিদ। সুমুখের জায়গাটা মঞ্চ মতো করা হয়েছে। সেখানে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছে শহীদ ও শমসের শিকদার। কামাল দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের কোণা ধরে। প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষণীয় না হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে হলঘরের দু'টো দরজার মুখেই যথেষ্ট সংখ্যক পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিম দিকের দরজার মুখে বেয়ারার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে মুন্সিজী ও মতিন। মি. সিম্পসনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মাহমুদের কথায় মৃদু হাসলো কামাল। বললো, 'চায়ের দাওয়াতে ডেকে এনে রহস্যোপন্যাস শুনতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত মি. মাহমুদ। কিন্তু আমার বন্ধু শহীদ খানের কাছ থেকে গল্পটা শুনুন। আশা করি খারাপ লাগবে না।'

কামাল বসে পড়ে। উঠে দাঁড়ায় শহীদ। বলে, 'হাসান মণ্ডলার মৃত্যু থেকেই গল্পটা

শুরু করা যাক। আগের কথা আপনারা আশা করি জানেন। নিঃসন্তান, বিপত্নীক বৃদ্ধ চৌধুরী আলী নকীব রূপ ও লালসার মোহে অন্ধ হয়ে হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন লাহোরের খ্যাতনাম্নী বাঙালী অভিনেত্রী সুলতানা পারভিনকে। তার নামে লিখে দিলেন বার্ষিক ছাপান্ন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি। ফলে চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তির আগের ওয়ারিশানরা সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। তারা অর্থাৎ আগের ওয়ারিশানরা নানাভাবে সম্পত্তির উপর তাদের অধিকার প্রমাণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু আইনতঃ তা গ্রাহ্য হবে না বুঝেই বুদ্ধিমানের মতো তারা সে চেষ্টা থেকে বিরত হলো। ইতিমধ্যে আততায়ীর হাতে চৌধুরী আলী নকীব খুন হলেন নাভানা ক্লাবে। মিসেস সুলতানা পারভিন ও তার বড় ভাই মাহমুদ যখন চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তি অধিকার করে রীতিমত তা ভোগ করতে শুরু করেছে তখনই হাসান মওলা নামে একজনের আগমন ঘটলো মানিকপুরে। হাসান মওলা এসে উঠলো এই হোটেল তাজে। যেদিন সে মানিকপুরে আসে সেদিনই বিকালবেলা মাহমুদ সাহেব একটা চিঠি পেলো হাসান মওলার কাছ থেকে। চিঠিতে হাসান মওলা দাবি করে সে মিসেস সুলতানা পারভিনের প্রথম স্বামী তৈমুর মীর্ধার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাহমুদের সঙ্গে দেখা হবার পর সে জানায় তৈমুর মীর্ধা এখনো জীবিত আছে। বলতে গেলে সে-ই তাকে পাঠিয়েছে মিসেস সুলতানা পারভিনের কাছে। তৈমুর মীর্ধার জীবিত থাকা অবস্থায় চৌধুরী আলী নকীবের সঙ্গে সুলতানার বিয়ে কখনো বৈধ হতে পারে না। তা যদি না হয় তাহলে সুলতানা পারভিন চৌধুরী আলী নকীবের বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকার সম্পত্তির ওয়ারিশান হয় কিভাবে? আইনতঃ তা অসম্ভব। ধুরন্ধর হাসান মওলা জানালো বেআইনী ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাইলে তারও উপায় আছে। সেটা হলো দেড় লাখ টাকা দিয়ে তার এবং তৈমুর মীর্ধার মুখ বন্ধ করে দেয়া। মাহমুদ প্রথমে হাসান মওলাকে অগ্রাহ্য করতে চাইলো, মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলো তার কথা, শাস্তির ভয় দেখালো তাকে। কিন্তু হাসান মওলা গভীর পানির মাছ। মাহমুদ বুঝলো তাকে ভয় দেখিয়ে কোনো ফয়দা নেই। নিখোঁজ তৈমুর মীর্ধা অ্যাদ্দিনে সত্যিসত্যি ফিরে এলে কি হবে এই আশঙ্কায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাহমুদ এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করলেন হাসান মওলাকে। কথা হলো টাকাটা নিয়ে তৈমুর মীর্ধা বা হাসান মওলা কেউ আর কোনদিন এ মুখো হবে না। বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় টাকা দেয়ার তারিখ ধার্য হলো।'

শহীদ তাকায় মাহমুদের দিকে। বলে, 'ঠিক না মাহমুদ সাহেব?'

'হ্যাঁ, বর্ণে বর্ণে ঠিক।'

'সেই দিনের সন্ধ্যাবেলা। সময় অনুমান সোয়া সাতটায় এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে হাসান মওলা খুন হয়েছে বলে সবাই জানতে পারলো।'

শমসের শিকদার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'এস্থলে বোধহয় বলা দরকার যে থান থেকে এই খুনের ব্যাপারে যা তদন্ত হয়েছে তাতে আমরা…'

'বলুন, বলুন…থামলেন কেন?'

প্রবীণ উকিল রামপ্রাসাদ কুণ্ডু আবেদন জানান।

'আমরা,' শমসের শিকদার বলতে শুরু করে, 'এই ব্যাপারে চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মিসেস সুলতানা পারভিনের ভাই মাহমুদকে অভিযুক্ত বলে মনে করি।'

উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটা গুঞ্জন শোনা গেল। মাহমুদের চোখ-মুখ রাগে উত্তেজনায় ভয়ঙ্কর দেখায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে শমসের শিকদার বলে যায়—'এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে হাসান মওলাকে মাহমুদ সাহেবই খুন করেছেন। এক হতে পারে হাসান মওলাই সুলতানা পারভিনের প্রথম স্বামী তৈমুর মীর্ধা। তা যদি হয় তাহলে আলী নকীবের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য হাসান মওলাকে খুন করাই মাহমুদ সাহেবের পক্ষে স্বাভাবিক। আর এক হতে পারে হাসান মওলা ব্ল্যাকমেলিং করছিল মাহমুদ সাহেবকে। এক লক্ষ টাকা দেবার হাত থেকে বাঁচবার জন্য অথবা একটা ব্ল্যাকমেলার শত্রুকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যে হাসান মওলাকে মাহমুদ সাহেব খুন করেছেন…'

'জঘন্য মিথ্যে কথা…'

মাহমুদ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি এদের বিরুদ্ধে মানহানির কেস করবো। বিনা প্রমাণে…'

'বিনা প্রমাণে নয় মাহমুদ সাহেব। হোটেল তাজের কেয়ারটেকার মুন্সিজী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনাকে হাসান মওলার ঘর থেকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। আপনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী ইংরেজি 'এম' খোদাই করা এই সিগারেট লাইটার। এটা মৃত হাসান মওলার ঘরেই পাওয়া গেছে। এটা যে আপনারই সিগারেট লাইটার তা আপনি নিজেই আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।'

রবিউল্লাহর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠে। মর্জিনা বানু তো আনন্দে প্রায় আটখানা। চৌধুরী পরিবারের সকলকেই আনন্দিত মনে হলো এক ডা. চৌধুরী ছাড়া। ডা. চৌধুরী গম্ভীর, বিষণ্ন মুখে বসে আছেন।

'এইভাবে এখানে আমাদের ডেকে এনে অপমান করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আপনাদের মি. কামাল?'

দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায় মাহমুদ।

কামাল বলে, 'আপনার আপত্তির কারণ অর্থহীন মাহমুদ সাহেব। দয়া করে মনে

রাখবেন টি-পার্টিতে আসা না-আসা আপনাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিলো না ভদ্রতা করে টি-পার্টির উপলক্ষ তৈরি হয়েছে বটে তবে আপনার জ্ঞাতার্থে বলে রাখি ক্ষমতার দিক দিয়ে এই পার্টিকে প্রথম শ্রেণীর আদালতের বিশেষ মর্যাদা দিতে পারেন। সুতরাং এই পার্টিকে দয়া করে ভূতের গল্পের আসর মনে না করলে সেটা আপনারই মঙ্গলের কারণ হবে।'

মি. নুরুল আলম মৃদু হাসছিলেন। মাহমুদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। অপরিচিত এক আক্রোশে তার চোখ-মুখ জ্বলতে লাগলো।

শমসের শিকদার বলে, 'হাসান মওলাকে মাহমুদই খুন করেছে, এই হলো আমার ধারণা...'

শহীদ উঠে দাঁড়ায়। সবারই দৃষ্টি পড়ে তার দিকে। শহীদের হাতে একটা চকচকে পিস্তল। সে পিস্তলটা বের করে টেবিলের উপর রাখে। মৃদু হেসে বলে, 'এটা ঠিক, যে একজন খুনী আমাদের মধ্যেই পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে। আর মনে মনে আমাদের বোকা ঠাউরিয়ে পরম অবজ্ঞার হাসি হাসছে। এই পিস্তলটা তার প্রতিরোধের জন্য তোলা রইলো।'

শহীদ দু'পা সামনে সরে আসে। বলে, 'হাসান মওলার রহস্য সত্যি খুব জটিল। শমসের শিকদার এইমাত্র বলেছেন যে সন্ধ্যায় হাসান মওলার মৃত্যু হয় সেই সন্ধ্যায় হাসান মওলার ঘর থেকে মাহমুদ সাহেবকে বেরোতে দেখা গেছে। মাহমুদ সাহেব নিজেও তা স্বীকার করেছেন এবং এখনো করবেন তা আশা করি।'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

মাহমুদ অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বলে, 'হাসান মওলার সঙ্গে কথা হয় বিষ্যুদবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে তাকে টাকা দেবো। বিষ্যুদবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সত্যিই আমি নিজে হোটেল তাজে গিয়েছিলাম। হাসান মওলার সঙ্গে আগেই কথা ছিলো পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবো। তাই হোটেল তাজের রিসেপশান না হয়ে আমি হাসান মওলার ঘরে গেলাম রাজা সাহেবের মাঠ হয়ে তার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে। গিয়ে দেখলাম হাসান মওলা রক্তাক্ত দেহে মেঝেয় পড়ে গোঙাচ্ছে। আমি অবস্থা দেখে দেরি করিনি, তাড়াতাড়ি সটকে পড়েছিলাম।'

'আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মাহমুদ সাহেব।'

সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে শহীদ বলে ওঠে, 'বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় পেছনের দরজা দিয়ে মাহমুদ সাহেব ছাড়াও আরো দুই ব্যক্তি হাসান মওলার ঘরে ঢুকেছিল। তাদেরকে আপনারা ভালো করে চেনেন। তাদের একজন হলে চৌধুরী রশিদ।'

রশিদ সাহেব গভীর লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকেন।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'আর একজন?'

উদগ্র কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন প্রবীণ আইনজীবী রামপ্রসাদ কুণ্ডু।

'আমি শিগগিরই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো মি. কুণ্ডু,' শহীদ হাসিমুখে বলে, 'উত্তর দেবার আগে আমি আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনাদের একমিনিট বিরক্ত করবো। ব্যাপারটা আর কিছু না···সামান্য একটা চুরি।'

সে ফিরে তাকায় পশ্চিমের দরজার দিকে, যেখানে মতিন, মুন্সিজী ও গাড়োয়ান খাঁসাব দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। শহীদ ডাকলো, 'মতিন'।

মতিন বোধহয় আগেই ব্যাপারটা আঁচ করেছিল। শহীদের ডাক শুনেই সে হঠাৎ কি ভেবে ছুটে পালাতে গেল। দু'জন পুলিস তাকে ধরে নিয়ে এলো ঘরের মাঝখানে, শহীদের কাছে।

মতিন ফোঁপাচ্ছিল, 'খোদার দোহাই লাগে হুজুর, আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আর এমন কাজ করবো না। যদি কন তো মানিকপুর ছেড়ে চলে যাই···'

শহীদ বললো, 'তোমার কোনো ভয় নেই মতিন। আগে বলো যে জিনিসটা নিয়েছিলে সেটা তোমার কাছে আছে না বিক্রি করে দিয়েছো···'

'আছে হুজুর, বলেন তো এখনই এনে দিই।'

'হ্যাঁ, তাই দাও···'

মতিন ফোঁপাতে ফোঁপাতে দু'জন পুলিসের পাহারাধীনে চলে যায়। শহীদ বলে, 'হাসান মণ্ডলার মৃত্যু রহস্য খুবই জটিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জটিলতা সৃষ্টি করার পেছনে যে ব্যক্তিটি আছেন তার বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিত্বের উপর সত্যি কথা বলতে কি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মেছে। তবে দুঃখ এই শেষরক্ষা তাকে দিয়ে সম্ভব হলো না।'

'সেই লোকটা কে মি. শহীদ?'

মর্জিনা বানু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করেন।

'আমাদের মধ্যেই একজন।'

শহীদ মৃদু হাসে। চাপা গুঞ্জনে ভরে যায় ঘর। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ডা. চৌধুরী মুখ নামিয়ে রাবেয়া সৈয়দকে কি যেন বলেন। রাবেয়া সৈয়দের চোখ-মুখ ভয়ে রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে দেখায়। রবিউল্লাহর চোখেমুখে উত্তেজনা পরিস্ফুট হয়। তার কপালের ডান পাশের শিরা দপ্‌দপ্ করতে থাকে। শাহেলি কেন যেন বারবার রশিদ সাহেবকে দেখছিল। রশিদ সাহেব সেই যে মাথা নিচু করেছেন আর মাথা তোলেন নি। বেগম রশিদ রীতিমত কাঁপছে ভয়ে ও আশঙ্কায়। আইনুল হক বারবার ঢোক গিলছে। শুধুমাত্র মাহমুদকে দেখা গেল স্থির ও শান্ত হয়ে বসে থাকতে।

শহীদ যেন মনে মনে উপস্থিত সকলের উপর তার কথার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া উপভোগ করছিল। এই সময় মতিন ফিরে এসে কাগজে জড়ানো কি একটা জিনিস দিলো শহীদের হাতে। কাগজের মোড়ক খুলে জিনিসটা সকলকে বের করে দেখায় সে। সবাই দেখে শহীদের হাতে চকচক করছে ছোটো একটা কালো রঙের সিগারেট লাইটার।

'এটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

শহীদ বলতে থাকে, 'এটি হাত-বাক্সে রেখে মতিনকে ইচ্ছে করেই হাত-বাক্সে হাত দিতে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা বিশেষ বিশেষ জিনিস চুরি করা কারো কারো বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। আমার চাকর গনি মিঞার এই রকম একটা বাতিক ছিলো নয়া পয়সা চুরি করার। মতিনের বাতিক হলো সিগারেট লাইটার চুরি করা। হাসান মওলা মতিনকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল মাহমুদ সাহবের কাছে। চিঠি বিলি করার এক ফাঁকে মাহমুদ সাহেবের লাইটারটা সে সরিয়ে ফেলে। তাই না মতিন?'

মতিন বলে, 'জ্বি হুজুর। এই লাইটারটা নিচের ড্রয়িংরুমের টি-পয়ে রাখা ছিলো। কালু যখন সাহেবকে খবর দিতে উপরে যায় তখন আমি সেটা লুকিয়ে ফেলি।'

'এবং সেটা যথাসময় একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো, তাই না?'

মতিন অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে। শহীদ সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মতিনের জন্যে আমি দুঃখিত। মতিন ইচ্ছে করে এ কাজ করেনি। সিগারেট লাইটার চুরি প্রথমে ছিলো সখের ব্যাপার পরে সেটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে বাতিকে।'

শহীদ কামালের দিকে তাকায়। কামাল তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উঠে দরজার কাছে চলে যায়। শহীদ বলে, 'মতিন যার কাছে এই সিগারেট লাইটার বিক্রি করে সেই লোকটাই হলো হাসান মওলার মৃত্যু রহস্যের সবচে' বড় গুটি। সে-ই হাসান মওলার ঘরে প্রথম ঢুকেছিল; হাসান মওলার মুমূর্ষু দেহের পাশে সে-ই মাহমুদের 'এম' খোদাই করা সিগারেট লাইটার ও একটা টকটকে লাল গোলাপ ফুল রেখে আসে। উদ্দেশ্য হাসান মওলার মৃত্যুর সন্দেহটা যাতে সরাসরি মাহমুদের উপর গিয়ে পড়ে। বেশ চমৎকার পরিকল্পনা, তাই না?'

এহেন পরিস্থিতির জন্যে কেউ যেন প্রস্তুত ছিলো না। ডা. চৌধুরী বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। রাবেয়া সৈয়দের চোখ-মুখ ব্যথা-বেদনা ও অপমানে নীল হয়ে আছে। রবিউল্লাহ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। শাহেলির মুখও বিবর্ণ।

শহীদ গম্ভীর গলায় বলতে থাকে, 'এই লোকটা আমাদের মধ্যেই বসে আছে। তার প্রতিটি অভিব্যক্তি এখান থেকে আমি লক্ষ্য করছি। **He is the most talented man of Manikpur**. মানিকপুর চৌধুরী পরিবারের সবচে' প্রতিভাশীল লোক।

লোকটা কে জানেন?'

সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে। শহীদ টেবিলের উপর থেকে পিস্তলটা উঠিয়ে হাতে নেয়। তারপর এগিয়ে যায় বাঁ সারির চেয়ারগুলির দিকে।

'তার নাম রবিউল্লাহ।' শহীদ রবিউল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিস্ময়ের ধকল কাটতে না কাটতে কামালের ইঙ্গিতে একজন পুলিসের হেফাজতে ঘরে ঢোকে মেজর বদরুদ্দিন। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে রবিউল্লাহ। ততক্ষণে হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। কণ্ঠে আক্রোশের ঘৃণা ছড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমিই হত্যা করেছি হাসান মওলাকে। ঐ খবর আর কারোর জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই এটা মেজরের কাজ। আমি হাসান মওলাকে খুন করেছি। আমি আর একটা খুন করবো। মেজরকে আমি নিজের হাতে খুন করবো। বিশ্বাসঘাতক, পাজী, শয়তান…'

দু'জন পুলিস গিয়ে রবিউল্লাহর দু'পাশে দাঁড়ায়। মেজর ম্লান হেসে বলে, 'আমি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না রবিউল্লাহ। দু'দিন আগে যে রাতে আমি পালিয়ে যাবো বলে স্টেশনে যাই সে রাতেই আমি পুলিসের হাতে ধরা পড়ি।'

'Shut up, you rascal!'

রবিউল্লাহ রাগে ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জে উঠে, 'তোমার সলাপরামর্শেই আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে মেজর। খুনের দায় যদি আমাকে গ্রহণ করতে হয় তাহলে তুমিও রক্ষা পাবে বলে ভেবো না!'

'হ্যাঁ, আমিও দায়ী বৈকি!'

মেজর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় আমি কিছু টাকা পয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম মানিকপুরে কে এক হাসান মওলা এসে হাজির হয়েছে, সে নিজেকে তৈমুর মীর্ধার বন্ধু বলে জাহির করে মাহমুদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে।'

'আপনি কার কাছ থেকে একথা শুনেন মেজর সাহেব?'

'রবিউল্লাহর কাছেই। ঘটনা চক্রে রবিউল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হয়। রবিউল্লাহ দূর সম্পর্কীয় হলেও আমার আত্মীয়। খবরটা শুনে আমিই রবিউল্লাহকে হাসান মওলার খোঁজ খবর নিতে পরামর্শ দেই।'

'পরেরটুকু আমি জানি মেজর সাহেব,'

শহীদ বলে, 'আপনার কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে রবিউল্লাহ গিয়ে দেখা করে হাসান মওলার সাথে। রবিউল্লাহ হাসান মওলাকে একটা প্রস্তাবে বাধ্য করার চেষ্টা করে। ব্ল্যাকমেলারের উপর ব্ল্যাকমেলিং আর কি! প্রস্তাবটা হলো হাসান মওলা তৈমুর মীর্ধা

বলে নিজেকে পরিচয় দেবে। আইনের দৃষ্টিতে তৈমুর মীর্ধা মৃত বটে তবে সেটা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা মেজর বদরুদ্দিনের পক্ষে অসুবিধে হবে না। কথা হয় হাসান মওলা এই প্রস্তাবে রাজি হলে রবিউল্লাহ কোর্টে গিয়ে চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তির উপর সুলতানা পারভিনের মালিকানা চ্যালেঞ্জ করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাসান মওলা তাতে রাজি হয়নি।

রবিউল্লাহ বুঝলো কোনো কথাই শহীদের অজানা নেই। সে ধীরে ধীরে বললো, 'আমার নিজের কথা আমাকেই বলতে দিন মি. শহীদ। ফাঁসিতে যেতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। উচ্চাকাঙ্খাই ছিলো আমার জীবনের সবকিছু। সেই উচ্চাকাঙ্খার কোনো ভবিষ্যতই যখন রইলো না তখন চৌধুরী আলী নকীবের লক্ষ লক্ষ টাকার বদলে সামান্য এক টুকরো জমির মালিক হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? আমি সব স্বীকার করছি। হাসান মওলা তৈমুর মীর্ধা সাজতে প্রথম অস্বীকার করে বটে, কিন্তু ঘটনার দিন অর্থাৎ বিষ্যুদ-বার দিন সন্ধ্যার আগে তার সঙ্গে যখন রাজা সাহেবের মাঠে আমার দেখা হয় সে তখন এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হয় এবং আমাকে পেছনের দরজা দিয়ে তার ঘরে নিয়ে যায়।'

'আপনি নিশ্চয়ই হাসান মওলাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন তার প্রস্তাবে রাজি না হলে ব্যাপারটা পুলিসকে জানাবেন?'

'পুলিসের কথা বলিনি তবে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'হাসান মওলা আমাকে পেছনের দরজা দিয়ে তার ঘরে নিয়ে গেল এবং হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার তলপেট বরাবর প্রচণ্ড লাথি লাগালো। আমি সতর্ক হয়ে যাওয়াতেই লাথিটা মিস হলো। বুঝলাম হাসান মওলা আমাকে এই কারণেই ঘরে ডেকে এনেছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। মুহূর্তেই আমার একটা ঘুসি গিয়ে পড়লো হাসান মওলার কপালে। ঘুসি খেয়ে হাসান মওলা দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটলো। হাসান মওলা থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। তার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগলো। হাসান মওলা গোঁ গোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল। তখন বুঝলাম এক ঘুসিতে অক্কা পেয়েছে হাসান মওলা। কি করবো ভাবছিলাম, হঠাৎ দু'দিন আগে মতিনের কাছ থেকে কেনা সিগারেট লাইটারের কথা মনে পড়লো। লাইটারটা মাহমুদের তা আমি জানতাম। লাইটারটা তখন আমার পকেটে। আর দ্বিরুক্তি না করে সেটা রেখে দিলাম হাসান মওলার রক্তাক্ত দেহের পাশে। হ্যাঁ, ফুলটাও আমারই। ওটা আমি রাখিনি। ধস্তাধস্তিতে নিশ্চয়ই ফুলটা কোটের বাটন হোল থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

হঠাৎ এক ফোঁটা গরম পানি গড়িয়ে পড়লো রবিউল্লাহর চোখ থেকে। বললো,

'ফুলটা সেদিন আমি একজনের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। জানি, এখন তার কথা ভাবার কোনো মানে হয় না।'

শহীদ মৃদু হাসে। বলে, 'রবিউল্লাহ সাহেব, যে আপনাকে ফুলটা উপহার দিয়েছিল তার মূল্য কি আপনার উচ্চাকাঙ্খার চেয়েও বেশি?'

রবিউল্লাহ্ চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আপনি যা খুশি ঠাট্টা করতে পারেন মি. শহীদ। আমি এখন ফাঁসির আসামী। আমার রাগ বা চোখের পানি দু-ই সমান।'

শাহেলি মাথা নিচু করে বসে আছে। ক্ষোভে দুঃখে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করছেন মর্জিনা বানু। রবিউল্লাহ হাসান মওলাকে খুন করতে পারে এ তিনি কখনো ভাবতে পারেননি।

শহীদ রবিউল্লাহর কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ায় রাবেয়া সৈয়দের সামনে। মৃদু কণ্ঠে বলে, 'মিসেস চৌধুরী…'

বেদনা গ্লানিতে কালো রাবেয়া সৈয়দ আস্তে আস্তে বলেন, 'হ্যাঁ, আমি শাস্তির জন্যে প্রস্তুত আছি শহীদ সাহেব।'

শহীদ বলে, 'আপনার শাস্তি অনেক আগেই হয়ে গেছে মিসেস চৌধুরী। এখন আমি আপনাকে মিথ্যে সম্মান আর অহমিকাবোধ থেকে মুক্তি দিতে চাই।'

শহীদের গলার স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, 'একটা কথা আমি ইচ্ছে করেই এতক্ষণ গোপন রেখেছি। শাহেলির জন্য নিশ্চয়ই এটা সুসংবাদ। কথাটা হলো রবিউল্লাহ হাসান মওলাকে খুন করেনি।'

বিস্ময়ের প্রবল ঝাপটা বয়ে গেল ঘরে। রবিউল্লাহ বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শহীদের দিকে। মাহমুদ অস্ফুট গলায় বলে, 'My God! একি ভেল্কিবাজি শুরু হলো।'

'ভেল্কিবাজিই বটে!'

শহীদ পিছনে সরে গিয়ে টেবিলের উপর রাখা দু'টো পার্সেলের একটা টেনে নেয়। পার্সেল খুলে বের করে দু'টো ছবি। ছবি দু'টো সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, 'এ দু'টো ছবি আপনারা চিনতে পারেন?'

'খুব পারি,' মাহমুদ জবাব দেয়, 'দু'টো ছবির একটা হলো রাবেয়া সৈয়দের আর একটা হলো হাসান মওলার।'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে শহীদ, 'দেখুন তো এ দু'টো ছবির চেহারায় মিল আছে কি না…'

'স্পষ্ট মিল আছে,' মি. নুরুল আলম পি. এস. পি'র চোখে মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তার সঙ্গী কোর্ট অফিসার মি. শরীফ দৃষ্টি বিনিময় করেন এস. ডি. পি.ও. নুরুল

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

আলমের সঙ্গে।

রামপ্রসাদ কুণ্ডু প্রায় চেঁচিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ স্পষ্ট মিল আছে দু'টো ছবির চেহারায়। দু'জনেরই লম্বা, বাঁকানো নাক, চোয়াল শক্ত, চোখ ভাসা ভাসা…কি আশ্চর্য…হাসান মণ্ডলা কি তাহলে…'

'হ্যাঁ, মিল থাকা স্বাভাবিক। কারণ এরা একই বংশের ছেলে-মেয়ে, সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই বোন।'

রাবেয়া সৈয়দ উঠে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না তিনি। বোধহয় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'আমার কলঙ্কের কথা আমি নিজেই স্বীকার করছি সকলের কাছে। ঘটনাচক্রে আমার দ্বারা যা হয়েছে তাতে অনেক বড় শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিলো। হ্যাঁ, হাসান মণ্ডলা আমারই ছোটো ভাই, চাচাতো ছোটো ভাই। ছোটোবেলা ও বাড়ি থেকে পালিয়ে নেপাল চলে যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর সে ফিরে আসে দেশে। তাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হতো আমাদের। কারণ ও ছিলো একজন দাগী ঠকবাজ আর জুয়াড়ী। ঘটনাচক্রে তারই সাহায্য নিয়েছিলাম আমি। সেটুকুই আমার লজ্জা আর কলঙ্কের কাহিনী। আপনারা জানেন চৌধুরী আলী নকীব বেঁচে থাকাকালীন আমরা, মানিক ভাই, মোস্তাকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম ঢাকায়। তার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ঠিক হলো সে হাসান মণ্ডলার ছদ্মবেশে মানিকপুর যাবে এবং তৈমুর মীর্ধার নামে ব্ল্যাকমেলিং করবে মাহমুদকে।'

রাবেয়া সৈয়দ থামলেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'মান-অপমানের চেয়েও আমার কাছে তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল টাকা, প্রথম দিকে ভয়ে ভয়ে ছিলাম। সুলতানা যদি তৈমুর মীর্ধা ভেবে মোস্তাক ওরফে হাসান মণ্ডলার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাহলেই তো ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাসান মণ্ডলা ধরা তো পড়লোই না, বরং উল্টো মাহমুদ তার ফাঁদে আটকা পড়লো। ঠিক হলো বিষ্যুদবার দিন সন্ধ্যার পর সে টাকা নিয়ে আসবে হোটেলে। সবই ঠিকঠাক ছিলো, কিন্তু গোল বাধালো রবিউল্লাহ্ আর মেজর বদরুদ্দিন।'

শহীদ বললো, 'আপনি একদিন গভীর রাতে বোরকা পরে হাসান মণ্ডলার ঘরে গিয়েছিলেন, তাই না মিসেস চৌধুরী?'

'জ্বি।'

'আর রাজা সাহেবের মাঠে আপনাকে নেয়ার জন্যে জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ডা. চৌধুরী? রাজা সাহেবের মাঠ থেকে গভীর রাত্রে নীল আলোর সঙ্কেতও কি আপনারাই পাঠাতেন?'

'আমরাই। সঙ্কেত পেয়ে হাসান মওলা রূপী মোস্তাক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতো।'

'হুঁ, তারপর?'

'বুধবার রাতে মোস্তাক রবিউল্লাহর কথা আমাদের জানায়। আমরা তার কোনো ঘোর-প্যাঁচে না গিয়ে বিষ্যুদবার রাতে মাহমুদের কাছ থেকে ভালোয় ভালোয় টাকাটা নিয়ে তাকে সরে আসতেই উপদেশ দিই। তারপরের কথা আপনারা সকলেই জানেন।'

শহীদ বলে, 'হ্যাঁ, তারপরের কথা আমরা সবাই জানি। রবিউল্লাহর ভাষায় বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় হাসান মওলা খুন হয় তার হাতে। এটা ভুল ব্যাপার। আমার বন্ধু কামাল হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে আমি হাসান মওলার ব্যাপারটা কখনো খুন বলে ধরিনি। একবার শুধু এক্কা গাড়ির গাড়োয়ান খাঁসাবের কাছে, বিশেষ উদ্দেশ্য বশতঃ ব্যাপারটা খুন-খারাপী বলে উল্লেখ করেছিলাম। আসলে ব্যাপারটা খুন-খারাপী নয়। গোড়া থেকে এটাকে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়েছে বলেই এই ভুল হলো। হাসান মওলা আসলে Aortic aneurism নামে একটা জটিল রোগে মারা গেছে। রোগটা peculiar সন্দেহ নেই। যারা জবরদস্ত জোয়ান অথচ over exposure আর under feeding এর ফলে ভিতরে ভিতরে দুর্বল, অনেক সময় তারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। কোনো আঘাত ছাড়াই অনেক সময় অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ রোগীর নাক বা মুখ থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এইভাবে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ক্ষরিত হয়ে যায়। রবিউল্লাহর যে ঘুসিটা এসে পড়েছিল হাসান মওলার কপালে তাতে হাসান মওলা আঘাত পায় বটে, আঘাতটা সামলে নিয়ে প্রতিঘাত করতেও উদ্যত হয়েছিল সে। কিন্তু তার আগেই এই রোগের যা লক্ষণ,…প্রবল Heart throbbing শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নাক-মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। এইভাবেই সে মারা যায়। আমার এই কথাগুলির প্রমাণ স্বরূপ আমি হাসান মওলার পোস্ট মর্টেম উদ্ধৃত করতে পারি।'

শহীদ টেবিল থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বের করে দেখায়। রিপোর্টে শহীদের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হলো।

রবিউল্লাহ এতক্ষণে যেন শহীদের একটু আগেকার ঠাট্টার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। পাহাড়-প্রমাণ কৃতজ্ঞতা বিমূঢ় করে রাখলো তাকে। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো শহীদের দিকে। মর্জিনা বানু বারবার বিড়বিড় করে কি যেন পড়ছিলেন। বোধহয় সুরা পড়ছিলেন কৃতজ্ঞতায়। শাহেলির ঠোঁট কাঁপছিল আনন্দের আতিশয্যে।
কিন্তু ডা. চৌধুরী তখনো গম্ভীর ও নিশ্চুপ।

শহীদ একটু হাসে। বলে, 'নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হলো। এব্যারে দ্বিতীয় অঙ্কের

পালা। একটা কথা আশা করি বুঝেছেন যে মতিন, মুন্সিজী এবং আইনুল হক এরা সবাই রবিউল্লাহর দলের অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক। প্রাণ গেলেও এরা কখনো রবিউল্লাহর বিরুদ্ধে যেতে পারতো না। এজন্যেই বলছিলাম রবিউল্লাহ হচ্ছে মানিকপুরের সবচে' ক্ষমাতাশালী লোক। আইনুল হক তারই নির্দেশে মেজর বদরুদ্দিনকে হোটেল থেকে রবিউল্লাহর ফার্মে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু রবিউল্লাহর কথা থাক। এইবার মানিকপুর হত্যা রহস্যের প্রধান চরিত্র কে আসুন বের করা যাক।'

শহীদের চোখ–মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সারা ঘরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করে। মি. সিম্পসনকে হঠাৎ এই সময় দেখা যায় দরজার কাছে মুহূর্তের জন্য। রামপ্রসাদ কুণ্ডু নড়েচড়ে বসেন। মি. নুরুল ইসলাম পি. এস. পি তার সঙ্গী কোর্ট অফিসার মি. শরীফের দিকে তাকালো। মি. শরীফ বসে বসে পা নাচাতে থাকেন। মাহমুদ ছটফট করে নিজের আসনে বসে।

শহীদ বলে, 'দ্বিতীয় অঙ্কের নাটকের শুরুতেই আমি প্রশ্ন করি, চৌধুরী আলী নকীবের হত্যাকারী কে? আচ্ছা থাক এ প্রশ্ন। আসুন আমরা সুলতানা পারভিনের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখি। এই যে দেখুন আমার হাতে রয়েছে সুলতানা পারভিনের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।'

শহীদ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাঠ করে শোনায়। রিপোর্ট থেকে জানা গেল অতিরিক্ত মরফিয়া সেবনে সুলতানার মৃত্যু হয়েছে।

'এটা কি তাহলে আত্মহত্যা?' মি. রামপ্রসাদ কুণ্ডু প্রশ্ন করেন।

'না এটা একেবারে cold-blooded murder, ঠাণ্ডা মাথায় সুলতানা পারভিনকে খুন করা হয়েছে।'

শহীদ ফিরে তাকায় ডা. চৌধুরীর দিকে। বলে, 'সুলতানা পারভিনকে ঘুমের জন্য মরফিয়া কে দিয়েছিল, আপনি?'

'না, আমি দেইনি। সুলতানার সর্দিকাশির উপসর্গ ছিলো। আমি এক ফাইল Corex প্রেসক্রাইব করেছিলাম।'

'মিথ্যে কথা।' মাহমুদ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'সুলতানাকে আপনি attend করতেন, মরফিয়া আপনারই দেয়া...'

শহীদের হাতের চকচকে পিস্তলটা এইবার উদ্যত হয়ে ওঠে। সে মাহমুদের দিকে তাকিয়ে কঠোর গলায় বলে, 'দয়া করে হাতটা পকেট থেকে সরিয়ে আনুন মাহমুদ সাহেব। আপনি আমার পিস্তলটার লক্ষ্যস্থল একবারও বুঝতে পারেননি। পারলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারতেন যে অনেকক্ষণ আগে থেকে পিস্তলটা আপনাকেই প্রতিরোধ করার জন্য উদ্যত করা হয়েছে, রবিউল্লাহকে নয়। মি. শিকদার, এই নিন আপনার

আসামী। সুলতানা পারভিনের হত্যাকারী আশেক মাহমুদ।'

ইঙ্গিত পেয়ে দারোগা শমসের শিকদার দু'জন পুলিসসহ এগিয়ে এসে হাতকড়া পরিয়ে দেয় মাহমুদের হাতে। মাহমুদ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করতে থাকে। অশ্লীল গালিগালাজ করতে থাকে শহীদ ও কামালকে।

শহীদ গা করে না এসব কথায়। নিজের মনেই সে বলে, 'বাট হুইজ দি মার্ডারার অভ চৌধুরী আলী নকীব? আলী নকীবকে কে হত্যা করেছে!'

ডা. চৌধুরী অনেকক্ষণ থেকে চুপ করে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'মাহমুদ তাহলে নিজের বোন সুলতানাকে খুন করেছে! আশ্চর্য!'

শহীদ বলে, 'তার চেয়েও বড় আশ্চর্যের কথা ডা. চৌধুরী। সুলতানা পারভিন আজ থেকে তিন মাস আগে মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন?'

'আশ্চর্য! দু'দিন আগে যে মহিলা মারা গেলেন তিনি তাহলে কে?'

'অসম্ভব! এ অসম্ভব। সুলতানা পারভিন তিনমাস আগে মারা যেতে পারেন না।'

'যেতে পারেন।' শহীদ মৃদু হাসে। বলে, 'আমি ঘটনাটা খুলে বলছি।'

'চৌধুরী আলী নকীবের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ঢাকার অভিনেত্রী সুলতানা পারভিনের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর প্রমাণ আমার কাছেই আছে। এটি আমি সংগ্রহ করেছি ডেথ-রেজিস্ট্রারী অফিসে গিয়ে। আমি আসলে গিয়েছিলাম তৈমুর মীর্ধার ডেথ-রিপোর্ট সংগ্রহ করার ব্যাপারে ঐ অফিসের সাহায্যের আশায়। রেজিস্ট্রারের কাছে করাচী হেড অফিসের কিছু কিছু ডেথ-রিপোর্টের নকল ছিলো। কিন্তু তৈমুর মীর্ধার ডেথ-রিপোর্ট সেখানে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল সুলতানা পারভিন, স্বামীর নাম চৌধুরী আলী নকীব, মানিকপুর, এর ডেথ-রিপোর্ট। অবাক হয়েছিলাম বলাই বাহুল্য। পরে ব্যাপারটা খোঁজ করে বের করেছি। এবং তারপর আর অবাক হইনি।'

'কি ব্যাপার ভেঙে বলুন।'

'ব্যাপার আর কিছু না, অ্যাক্সিডেন্ট।'

'অক্সিডেন্ট?' ডা. চৌধুরী কিছুই বুঝতে পারেন না।

শহীদ বলে, 'হ্যাঁ। বলতে পারেন ঘটনাচক্রে। চৌধুরী আলী নকীবের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বড় ভাই মাহমুদসহ সুলতানা পারভিন ঢাকা আসে এবং মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। মাহমুদ এই আকস্মিক মৃত্যুতে হতভম্ব হয়ে পড়ে। একে তো একমাত্র বোনের মৃত্যু, তার উপর লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিকানা নষ্ট। এই সময় আর একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' তাকে রক্ষা করে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'"মাতৃসদনের" নার্স বিধবা শাহের বানুর সঙ্গে সুলতানা পারভিনের চেহারার হুবহু মিলকে অ্যাক্সিডেন্ট নয়তো কি বলবো?' শাহের বানুর গায়ের রং শ্যামলা ছিলো, সুলতানার মতো ফর্সা ছিলো না। আর সুলতানার তুলনায় সে কিছুটা রোগা, ছিপছিপে ছিলো। কিন্তু কস্‌মেটিকের কল্যাণে শ্যামা রঙকে ফর্সা করা আজকাল এমন কি আর কঠিন কাজ? মাহমুদ লোভ দেখিয়ে শাহের বানুকে রাজি করে ফেললো। মানিকপুর ফিরে এলো সে সপ্তাহ দুই পর। সবাই জানলো ঢাকা গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সুলতানা পারভিন। কেউ আসল রহস্য ধরতে পারলো না। এই রহস্য ভেদ করা কারো পক্ষে সম্ভব হতো না যদি মাহমুদ দু'টো প্রকাণ্ড গলদ না রাখতো। প্রথম গলদ ডেথ-রিপোর্টটা সে কোনরকমে বানচাল করে আসেনি। দ্বিতীয় গলদ শাহের বানু ওরফে সুলতানা পারভিনের চিঠিগুলি সে নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। আমি তদন্ত করতে গিয়ে বুক শেলফের কাছে মাতৃসদনের জনৈকা নার্সের চিঠি পাই। তাতে সে সুলতানাকে শাহের বানু বলে উল্লেখ করেছে। কৌতূহলী হয়ে আমি মাতৃসদনের কর্ম-কর্তাদের শাহের বানুর ফটো ও অন্যান্য তথ্যাদি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করি। মাতৃ-সদন কর্তৃপক্ষ ফটো ও অন্যান্য তথ্য পাঠিয়েছেন। চিঠি এবং সেগুলো আমার সঙ্গেই আছে।'

শহীদ দ্বিতীয় পার্সেলটা বের করে দেখায়। বলে, 'এছাড়া আরো প্রমাণ আছে। মরফিয়া যে শিশিতে রাখা হয়েছিল সেই শিশি এবং গ্লাসে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। সেই ছাপ মাহমুদের হাতের। যথাসময় সেটা জানা যাবে।'

শহীদ একটু হাসে। বলে, 'ইদানীং শাহের বানু ওরফে সুলতানা পারভিন মানিকপুরের ঘটনাবলী দেখে ভীষণ ভড়কে গিয়েছিল। মাহমুদের উপর সে আর আস্থা রাখতে পারছিল না। মাহমুদ ভয় করছিল শাহের বানুই হয়তো পুলিসের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে এবং এই ভয় একটুও অমূলক ছিলো না। শাহের বানু আমাকে সব কথা বলবে বলে সময় নিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই মাহমুদ তাকে সরিয়ে দিলো পৃথিবী থেকে চিরজন্মের মতো।'

'তাহলে মাহমুদ চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তির মালিকানার আশা ত্যাগ করে ইদানীং অন্য প্ল্যান করছিল?'

'হ্যাঁ, মানিকপুর থেকে ভেগে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল সে। পাছে সুলতানার মৃত্যুর পর চৌধুরী আলী নকীবের সম্পত্তির অধিকার ছুটে যায় এজন্যে ব্যাঙ্ক থেকে সে প্রচুর টাকা সরিয়ে রেখেছিল। আমার কাছে ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট আছে। ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট থেকে জানা যায় এই পাঁচদিনে মাহমুদ ব্যাঙ্ক থেকে মোট দু'কোটি টাকা উঠিয়ে রেখেছে।'

শহীদ শান্ত গলায় বলে, 'মাহমুদ সবই প্ল্যান মাফিক করেছিল। শাহের বানু'র খুনের দায় ডা. চৌধুরীর ঘাড়ে চাপিয়ে ভেবেছিল মানিকপুর থেকে সট্‌কে পড়বে। একেই বলে তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়া।'

'বাট হু মার্ডারড চৌধুরী আলী নকীব?'

প্রশ্ন করেন রামপ্রসাদ কুণ্ডু। শহীদ কি বলতে যাচ্ছিলো হঠাৎ এ সময় উঠে দাঁড়ায় কোর্ট অফিসার মি. শরীফ। বলে যদি অনুমতি করেন তবে আপনাদের এই নাটকের সাথে আরো কিছু নাটকীয় তথ্য যোগ করি। চৌধুরী আলী নকীবের খুনের তদন্তে পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে গোপনে কয়েকটি তথ্য জানানো হয়েছে।

শহীদ বলে, 'দয়া করে বলুন মি. শরীফ!'

'নাভানা ক্লাবে সেদিন চৌধুরী আলী নকীবকে অনুসরণ করে দু'ব্যক্তি। একজনের নাম কুয়াশা। দ্বিতীয় ব্যক্তি চৌধুরী আলী নকীবের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলো—মাহমুদ।'

নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিলো ঘরের সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। মি. শরীফ বলতে থাকে, 'কুয়াশা হঠাৎ বাতি নিভিয়ে দিয়ে চৌধুরী আলী নকিবের বুকপকেট থেকে একটা নকশা ছিনিয়ে নেয়। মাহমুদ ঠিক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বসলো। তার পিস্তল থেকে এক ঝলক অগ্নি-বন্যা ছুটে গেল হতভম্ব চৌধুরী আলী নকীবের দিকে। পিস্তলটা মাহমুদ পাচার করে দিলো সুলতানা পারভিনের হাতে। অভিনেত্রী সুলতানা পারভিনের আচরণে কেউ এ ঘটনার বিন্দুমাত্র ছায়া দেখতে পায়নি। এসব কিছুর প্রমাণপত্র আমার কাছে রয়েছে।'

'আরো একটা কথা।' মি. শরীফ বলে, 'কুয়াশা যখন নাভানা ক্লাব থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে আজকের এই রহস্য ভেদের প্রধান নায়ক শহীদের সঙ্গে। তাই না শহীদ সাহেব?'

'জ্বি হ্যাঁ।'

শহীদ হাসে। তাকায় দরজার প্রান্তে দাঁড়ানো মি. সিম্পসনের প্রায় অদৃশ্যমান মূর্তির দিকে। মি. নুরুল ইসালাম বলেন, 'এসবই আমাদের কাছে আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মি. শরীফ...'

এই সময় ঘরে ঢোকে মি. সিম্পসন। মুখে সাফল্যের হাসি। বলে, 'ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ...সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনারা যাকে বিখ্যাত দস্যু কুয়াশা বলে জানেন সেই কুয়াশা ছদ্মবেশে বসে আছে আপনাদেরই মধ্যে। কুয়াশা আর কেউ নয়, ছদ্মবেশধারী মি. নুরুল আলম কুয়াশা। আপ ফ্রেণ্ড...'

মি. সিম্পসন উদ্যত পিস্তল হাতে হাসি মুখে এগোতে থাকেন নুরুল আলম রূপী কুয়াশার দিকে। মি. শরীফের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। দরজার

আশেপাশে তখন বেয়োনেটধারী পুলিস আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

'কুয়াশা, তুমি আমাকে অনেক ভুগিয়েছ।'

মি. সিম্পসন হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা চালে ভুল করেছো বলে আজ তোমাকে আমাদের হাতে ধরা পড়তে হলো। এতদিনে তোমাকে পেয়েছি।'

কুয়াশা কোনো কথা বললো না। ঘরে সবাই বিস্ময়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত দস্যু কুয়াশা, যার ভয়ে ধনীরা সন্ত্রস্ত, পাকিস্তান সরকার উত্যক্ত, সেই প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক দস্যু কুয়াশা এই ঘরেই নিরীহ ভদ্রলোকের মতো বসে আছে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইলো না।

শহীদ বলে, 'কুয়াশা…সেদিন রাতে তোমার অহঙ্কার ভেঙে দিয়েছিলাম। আশা করি আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার আর কোনো সন্দেহ নেই।'

কুয়াশা কোনো কথা বললো না। মি. সিম্পসন এবারে হুইসল্ বাজিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো থানা থেকে আগত পুলিস ফোর্সকে ঘরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। কুয়াশার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। পুলিস ফোর্সের বারোজন পুলিস ভিতরে ঢোকে একে একে। কিছু বোঝার আগেই মি. সিম্পসন আর শহীদের হাতে ধরা পিস্তল ছিটকে পড়ে দূরে। দারোগা শমসের শিকদার, শহীদ, কামাল, আর সিম্পসনকে কর্ডন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেপাইগুলো। হাতে তাদের উদ্যত রাইফেল।

কুয়াশা বললো, 'Do'nt move মি. সিম্পসন…কুয়াশা সবকিছুর জন্যেই সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আসে। তাকে আশা করি ভবিষ্যতে under-estimate করবেন না। হ্যাঁ শুনুন…থানার ক'জন হাত–পা বাঁধা সেপাই উলঙ্গ অবস্থায় হাজত ঘরের ভেতর পড়ে আছে। ওদের দয়া করে শাস্তি দেবেন না। ওদের ঐ দশার জন্যে মূলতঃ আমিই দায়ী।'

মি. সিম্পসন অসহায় অবস্থায় পড়ে ক্ষোভে দুঃখে গজরাতে লাগলেন। কুয়াশা শহীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি আমাকে সেদিন মাহমুদের ঘরে পরাজিত করেছিলে। আজ তারই কিছু জবাব দিয়ে গেলাম শহীদ। কিছু পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেছি তোমার জন্য।'

কুয়াশা একটু হাসে। তার নির্দেশে মি. শরীফ একটা ছোটো কালো রঙের চামড়ার ব্যাগ টেবিলে রাখে। কুয়াশা বলে, 'চৌধুরী আলী নকীবের খুনী মাহমুদের বিরুদ্ধে সব প্রমাণপত্র এই ব্যাগে আছে। আরেকটা কথা আজ পরিষ্কার বলে যাই। লিম্পোপোতে সেদিন কুমীরে আমার পা কেটে নিতে পারেনি। আমি এতদিন তোমাকে শাস্তি দিলাম। আমাকে একা ফেলে পালানোর জন্যে তোমাকে দিলাম নিষ্ঠুর মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

সে এগিয়ে যায় মাহমুদের দিকে। তার পাশ থেকে উঠিয়ে নেয় একটা পোর্টফোলিও। বলে, 'নিশ্চয়ই এর ভেতর দু'কোটি টাকা রয়েছে! ব্রাভো মাহমুদ··· তুমি অত্যন্ত চতুর। শেষ রক্ষা করতে পারলে না এই যা···'

কুয়াশা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বলে, 'আগামীতে আবার দেখা হবে মি. সিম্পসন। এবারে চলি।'

পুলিস ছদ্মবেশধারী লোকগুলো কর্ডনটা সতর্ক ভাবে ছড়িয়ে দিতে থাকে। ঘরের সব লোক হতভম্ব। ম্যানেজার আইনুল হক বলি পাঁঠার মতো সকলের পিছনে বসে ঘামছে আর কাঁপছে। মি. শরীফ আর নুরুল আলম রূপী কুয়াশা বেরিয়ে যায় দক্ষিণের দরজা দিয়ে। ঘোর কাটতে না কাটতেই একটা এঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় বাইরে।

মি. সিম্পসন অস্থিরভাবে হাত পা ছুঁড়ছেন। ঘরের বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে কুয়াশা চলে গেছে। হ্যাণ্ডকাফ পরা মাহমুদও গজরাচ্ছে।

শহীদ শুধু হাসলো। মনে মনে বললো, কুয়াশা তোমার তুলনা হয় না। ইউ আর গ্রেট।

—ঃ শেষ ঃ—

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ভলিউম-২

কুয়াশা

৪, ৫, ৬

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এ বই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০